ভারতী মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাবলী

শঙ্কর গ্রন্থমালা—১

অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ

প্রথম ভাগ

শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং কেশবং বাদরায়ণম্।
সূত্রভাষ্য কৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ॥

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ

লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত

মোদেশ্বর সেন প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান

২৯বি, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা—৪

১৩৫৭

প্রথম ও ২য় ভাগ

মূল্য—৪৷৹

ভারতী শঙ্কর পরিষৎ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্ এ, বি-এল্
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ম ভাগ শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কালিকা প্রেস লিঃ
২৫নং ডি এল্ রায় ষ্ট্রীট্ কলিকাতা, এবং
২য় ভাগ শ্রীগৌরচন্দ্র সেন, বি, কম্ কর্ত্তৃক শ্রীভারতী প্রেস
১৭০নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য

বেদানামাগমানাং পরমজলনিধিং
সর্ববিজ্ঞানপূর্ণং বেদান্তার্থপ্রকাশ-
ক্ষমমমলরুচিং ভানুবদ্ধ্বান্তনাশম ॥
শিষ্টৈ শিষ্যৈঃ সমেতং নিরবধিশুভদং
জ্ঞানদাতারমীশং বন্দে শ্রীমদ্গুরূণাং
পরমগুরুবরং শঙ্করং পূজ্যপাদম্ ॥
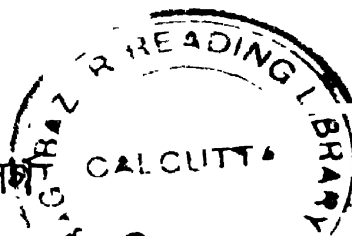
উৎসর্গ

মোক্ষপ্রদ নরজন্ম পোষণ ও পরিপালন
যাঁহাদের কৃপায় হইয়া
সেই
প্রত্যক্ষ দেবদেবী স্বরূপ
সর্ব্ব যজ্ঞের ঈশ্বর ও ঈশ্বরী
আমাদের জনক জননী

৺যজ্ঞেশ্বর সেন

এবং

৺নগেন্দ্র নন্দিনী দেবীর

প্রীতির উদ্দেশ্যে
এবং
সর্ব্ব মুমুক্ষুর হিতার্থে
এই
অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ গ্রন্থখানি
উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীপ্রমোদেশ্বর সেন

বাচনিক শিক্ষাগুরুগণ মধ্যে কতিপয় যাঁহাদের
অশেষ আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি :—

স্বামী শ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ

মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী ১০৮ স্বরূপানন্দ সরস্বতী

„ „ „ জগদগুরু স্বামী শ্রীবিদ্যানন্দজী মহারাজ

„ „ „ শ্রীহরিহরানন্দজী মহারাজ তর্কবেদান্তভূষণ

অধ্যাপকগণ মধ্যে কতিপয় যাঁহাদের অশেষ
কৃপায় আমার মত অন্ধেরও চক্ষু উন্মীলন হইয়াছে :—

শ্রীশ্রী ১০৮ জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য দ্বারকা সারদাপীঠধীশ্বর
শ্রীশান্তানন্দ সরস্বতী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়

„ **শ্রীপার্ব্বতী চরণ তর্কতীর্থ**

„ **শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ**

মোক্ষার্হং নরজননং পোষণং পরিপালনম্।
প্রাপয়িতোঽএবৈ সর্ব্বং পিতৃদেব নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বমঙ্গল-দাতৃকে সর্ব্বশোক হরাত্মিকে,
করুণা স্নেহ-সম্পন্নে মাতৃদেবী নমোঽস্তু তে॥
অপরাঞ্চ পরাং বিদ্যাং প্রদাতঃ পাবনালয়।
স্থিরশান্তিস্সুখদ্ভাব গুরুদেব নমোঽস্তু তে॥

মোক্ষদ্বার নরদেহ পোষণে পালনে
সর্ব্ববস্তু প্রদাতা নতি পিতৃচরণে।
সর্ব্বমঙ্গল দাত্রী সর্ব্ব শোকহারিণী
করুণা স্নেহ সম্পন্নে প্রণাম জননী।
পরাপর বিদ্যা-প্রদাতা পাবনালয়
চিরশান্তি সুখদাতা গুরু নমস্কার।

মুখবন্ধ

শ্রীমান প্রমোদেশ্বর সেন বিরচিত অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ আমি মনোযোগের সহিত বহুস্থান দেখিয়াছি। গ্রন্থকার নিজে সুদীর্ঘদিন যাবত ভারতীয় দর্শন সমূহ বিশেষতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের আলোচনায় প্রাণময় হইয়াছেন। ইনি সমৃদ্ধব্যক্তি হইলেও লৌকিক সমৃদ্ধি হইতে দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করিয়া ভারতের যথার্থ সমৃদ্ধি দর্শনশাস্ত্র সমূহের প্রতি একান্ত অনুরাগের সহিত একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন। জন্মান্তরের সুকৃতি না থাকিলে মানুষ ঐহিক সমৃদ্ধি হইতে বিরত হইয়া অলৌকিক আত্মতত্ত্বে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারে না। অল্প সৌভাগ্য লাভে ইহা হয় না। লৌকিক প্রতিষ্ঠা কল্পে মানুষ এজাতীয় কার্য্য করিতে পারে না। অগণিত সুকৃতিরাশির পরিপাক বশতঃ মানুষ আত্মতৃপ্ত হইতে অভিলাষ করে। এই অভিলাষের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইলেই সন্ন্যাস যোগ ঘটে। আত্মতৃপ্ত পুরুষ সন্ন্যাস গ্রহণ করুক আর না করুক বস্তুতঃ সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সর্ব্বত্যাগী আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষ ভারত বসুন্ধরার পরম আভরণ স্বরূপ। ভারতী দর্শনশাস্ত্র সমূহ বিভিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া আত্মতত্ত্বরূপ মহাসমুদ্রে একীভূত হইয়াছে। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই কেবল দর্শনশাস্ত্র নহে পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যা জীবজগতের সমস্ত চিন্তাধারা, প্রাণিপুঞ্জের অসংখ্যরাশি ইহাতে বিলীন হইয়াছে। এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সার হইতে সারতম। গ্রন্থকার এই আত্মতত্ত্বের অনুভূতি লাভের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া এই অদ্বৈত তত্ত্বানুভবের প্রয়াসী হইয়াছেন। সুদীর্ঘ জীবনখণ্ড ইহারই জন্য ব্যয়িত করিয়াছেন। এই তত্ত্বানুসন্ধানে সমুৎসুক হইয়া বহু সদ্‌গুরুর সেবা করিয়াছেন, শাস্ত্রের বহু অনুশীলন করিয়াছেন ও নিজে একান্তভাবে বহু মনন করিয়াছেন। তাহারই ফলে গ্রন্থকার অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ধনলাভ বা খ্যাতি লাভের চিন্তা গ্রন্থকারের চিত্তে স্বপ্নেও কখনও উদিত হয় নাই। নিজের অনুভূতির বিশোধনের জন্য এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই।

স্বীয় অনুভূতি বিশোধনের জন্য লিখিত গ্রন্থ অন্যের অবশ্যই উপকারক হইবে এইরূপ চিন্তা গ্রন্থকারের মনে উদিত হয় নাই।

এই গ্রন্থের স্থানবিশেষ শ্রবণ করিয়া আমি নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। শাস্ত্রসিদ্ধান্তে বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত না হইলে এইরূপ গ্রন্থ লেখা যায় না। গ্রন্থকারের সমগ্র জীবন দ্বারা উপলালিত সিদ্ধান্তগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশ জনতা সাধারণতঃ সদ্‌গ্রন্থ পাঠে একান্ত বিরূপ। যাঁহাদের শুভকর্ম্ম পরিপাক বশতঃ সদ্‌গ্রন্থ পাঠে রুচি আছে তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। পাঠের সময় বৃথা ব্যয়িত হইবে না। যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহারা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিবেন। ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। অদ্বৈত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমূহ অদ্বৈতসিদ্ধি অতিদুরবগাহ সংস্কৃত শাস্ত্র সমূহে বিন্যস্ত রহিয়াছে, সেই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আর শাস্ত্রের রহস্য বেদন অতি দুর্ঘট। এজন্য অদ্বৈত বিদ্যা প্রস্থানের গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত রহস্য অবগত হওয়া অতি সুকঠিন। এই অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ গ্রন্থে এমন কতকগুলি বিষয় নির্ণ্যস্ত হইয়াছে যাহা সাধারণ ভাবে শাস্ত্র আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায় না। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির হৃদয়ে যে সমস্ত জিজ্ঞাসা হওয়া স্বাভাবিক সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সুমীমাংসাও অতি দুর্লভ। এই গ্রন্থে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সুমীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য প্রখ্যাপনের প্রয়াস হইতে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে বিরত হইয়া মাত্র স্বীয় হৃদয়ের জিজ্ঞাসানুসারে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সুমীমাংসা নানাশাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন ও তাহা এইগ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় এজাতীয় গ্রন্থ দুর্লভ হইতেও দুর্লভতর।

শাস্ত্রের অধিকারীর স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বহু তথ্যপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা

করিয়াছেন। এবং অদ্বৈতবিদ্যার স্বরূপ ও তাহার সিদ্ধির বিষয়ের অতি-দুর্ঘট বস্তুরও সুমীমাংসা প্রদর্শন করিয়াছেন। শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভব এই তিনটির একত্র সম্মিলন পূর্ব্বক তত্ত্বপ্রতিপাদনই যথার্থ প্রতিপাদন। মাত্র শাস্ত্রদ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা প্রতিপাদিত তত্ত্ব স্বীয় অনুভবে প্রতিভাসিত হইতে পারে না, এজন্য শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা গৃহীত তত্ত্বের অনুভবারোহণ অতি আবশ্যক। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভূতি এই তিনটির একীকরণে বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। যাঁহারা সৌভাগ্য বশে আত্মবিশ্রান্তিতেও অভিলাষী এই গ্রন্থ তাঁহাদিগের বিশ্রান্তির সহায়ক হইবে।

যোগবাশিষ্ঠ, বিদ্যারণ্য প্রণীত বার্ত্তিকসার প্রভৃতি অধ্যাত্ম বিদ্যার অসাধারণ গ্রন্থ হইতে অদ্বৈতানুভূতির সহায়ক রূপে সিদ্ধান্ত সমূহ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন, এবং যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গের বৈলক্ষণ্য কোথায় তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নানাদিক হইতে এই গ্রন্থখানির বিচার করিলে গ্রন্থখানি যে পরম উপাদেয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার যে পিপাসা লইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে অন্ত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অশেষ উপকার সাধিত হইবে। গ্রন্থকার যে পূর্ণপরিতৃপ্তির অনুসন্ধানে সুদীর্ঘ আয়ুখণ্ড ব্যয়িত করিয়াছেন ও তাহার জন্য যে জীবনব্যাপী অসাধারণ প্রয়াস করিয়াছেন, যাহার ফল স্বরূপ এই অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রন্থকারের সেই প্রয়াস পরিপূর্ণতা লাভ করুক। অদ্বৈতানুভূতিতে তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণতা লাভ করুক, যে পিপাসায় গ্রন্থকার অসাধারণ প্রয়াস করিয়াছেন সেই পিপাসা পরিতৃপ্তি হউক। গ্রন্থকার আত্মস্থিতিতে বিশ্রান্ত হউন ইহাই পরমেশ্বরের চরণে আমি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি।

ম: ম:—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ।

শিবরাত্রি—১৩৫৭ সন

প্রস্তাবনা

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ভারতী শঙ্কর পরিষৎ গ্রন্থমালার ১ম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার গ্রন্থকার শ্রীপ্রমোদেশ্বর সেন মহাশয় আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্তের আজীবন সাধক। তিনি কঠিন গ্রন্থাদি হইতে বেদান্তের চিন্তা-ধারা সাধারণ পাঠকবর্গের উপযোগী করিবার জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অনেক ক্ষেত্রে গল্পচ্ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অনুবন্ধ চতুষ্টয় সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ভারতী শঙ্কর পরিষৎ কি এবং কেন এই গ্রন্থখানিকে ইহার গ্রন্থরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হইল সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌদ্ধযুগের পর ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক আচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্য। বৈদিক যুগ হইতে যে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ উপনিষদাদিতে নিবদ্ধ ছিল এবং যাহা মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার 'বেদান্ত সূত্রে' গ্রথিত করেন তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক আচার্য্য শঙ্কর। আচার্য্য শঙ্করের মনীষা বর্ত্তমান যুগের মন দিয়াও বোধ হয় মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার পূত এবং তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের গ্রন্থমালার মূল ও অনুবাদ ব্যাখ্যাদি সহ প্রকাশ করা, প্রচার করা এবং রক্ষা করাই এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত বুদ্ধ-জৈন-শিখ প্রমুখ পরিষদগুলির অন্যতম। অন্যান্য পরিষদ হইতে বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এইকয় বর্ষের মধ্যে শঙ্কর পরিষদ হইতে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া শঙ্করের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রমোদ বাবু এই প্রকার গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহী হ'ন এবং ইহাই তাঁহার আজীবন শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের গ্রন্থরূপে প্রকাশিত প্রথম অবদান। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকারের শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এবং প্রকাশকেরও সময়াভাব বশতঃ মুদ্রণ কার্য্যে বিশেষতঃ ১ম খণ্ডে অনেক ভ্রম ও ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। এইগুলি পরবর্ত্তী

সংস্করণে সংশোধিত হইবে। আশা করা যায় পাঠকবর্গ এ বিষয়ে আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ খানি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, পঞ্চদশী, আত্ম পুরাণ, বেদান্ত দর্শন, অদ্বৈতসিদ্ধি প্রমুখ বহু দুরূহ গ্রন্থাদি হইতে সার সংকলন করিয়া সাধকের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের সহায়করূপে গ্রথিত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ললিতোপাখ্যানে এবং লক্ষ্মীতন্ত্রের অন্তর্গত বিখ্যাত ত্রিপুরা মাহাত্ম্য হইতে হারিতায়ন ঋষি 'হারিতায়ন সংহিতা' বা 'ত্রিপুরারহস্য' প্রণয়ন করেন। ভগবানের অবতার শ্রীদত্তাত্রেয় পরশুরামকে যে সকল উপদেশ দান করেন, দেবর্ষি নারদেরও গুরু ঋষি হারিতায়ন নারদকে গল্পচ্ছলে সেই সকল তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। দ্বিতীয় ভাগ অনুভূতির সহায়করূপে ঐ সকল বিষয়ের ছায়াবলম্বনে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ।

সুতরাং এই গ্রন্থখানি পাঠে যে জ্ঞানমার্গের নবীন ও প্রবীণ সাধকগণ ও জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরা রহস্যের সার সংকলিত হইয়া মারাঠী ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু বাংলা ভাষায় বিস্তৃত আলোচনা সমেত ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রকাশ।

বাংলার প্রত্যেক পাঠাগার ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই গ্রন্থ ক্রয় দ্বারা এবম্প্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন ইহাই আশা করা যায়।

"শ্রীশ্রীবাসন্তী পঞ্চমী"
ভারতী শঙ্কর পরিষদ
কলিকাতা।

ইতি
শ্রীসতীশ চন্দ্র শীল

গুরু নমস্কার

সর্ব্বশাস্ত্র হতে গুরু বুঝিয়াছি সার,
তব কৃপা বিনা মোর গতি নাই আর।
অযাচিত কৃপা সিন্ধু পাইয়াছি যবে,
কি ভয় বলনা তবে ভব অনুভবে।
স্বপনের বস্তু যথা থাকেনা জাগিলে,
নামরূপ সব যায় জ্ঞান প্রকাশিলে।
শ্রীমুখ হইতে গুরো শুনিয়াছি তব,
"তুমিই সেই"—এতদিনে হ'ল অনুভব,
"সর্ব্ববৃত্তি সাক্ষী"—"তুমি অর্থ এই"
"সৃষ্টি স্থিতি লয়" কর্ত্তা—"পরমাত্মা" সেই।
ছাড়িলে উপাধি দৃষ্টি—উদিবে বিবেক,
ঘুচে যাবে বন্ধোমোক্ষ দুশ্চিন্তা যতেক।
বুঝি নাই এতদিন নিষ্কলঙ্ক আমি,
হইয়ে উপাধিলুব্ধ মোহপথে ভ্রমি ;
আমি চির নির্ব্বিকার, মায়ার অতীত
এতদিন ছিনু স্বধু মোহে বিজড়িত ;
দেহে 'আমি' বুদ্ধি করি লভি নানা ক্লেশ,
তোমার প্রসাদে হল সব দুঃখ শেষ॥
যাহা দৃশ্য, তাহা মিথ্যা, দিয়ে এই জ্ঞান
মহামন্ত্রে, হল মোর মোহ অবসান।
আমি বিনা বিশ্বে অন্য কেহ আর নাই
তোমার প্রসাদে গুরু এই জ্ঞান পাই।

আমিকে চিনি না বলে যত দুঃখ হল
আমিকে চিনিয়ে তিন দুঃখ চলে গেল।
কোথা গেল ধনজন, আত্মীয় স্বজন
কোথায় বিষয়-দস্যু, শাস্ত্র আলোচন।
কোথা গেল শ্রবণ-মনন আর নিদিধ্যাসন
এসবেতে মম মন না হয় মগন।
অগতির গতি গুরু অন্ধের নয়ন
পতিত পাবন গুরু জীবের জীবন।
নমস্কার—নমস্কার গুরো ব্রহ্মরূপ
দেখায়ে দিলেন মোরে অভেদ স্বরূপ॥

স্বামিন্মে মতিবাক্যানি তুভ্যমা[illegible]।
স্ববোধস্যৈব দার্ঢ্যার্থ ন মে পাণ্ডিত্যখ্যাতয়ে॥

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমহাত্মা নারদবাবা দীক্ষাগুরু
মহারাজজীউ জয়তি

শ্রীমৎ স্বামী বালানন্দ সরস্বতী—নারদবাবা

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং-যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পিতা—৺যজ্ঞেশ্বর সেন

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমস্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ

মাতা—৺নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী

জনুন দশতু মাতৈকা সর্ব্বাং বা পৃথিবীমপি
গুরুত্বেনাভিভবতি নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥

প্রথম ভাগের সূচী

দ্বিতীয় ভাগের সূচী

কৈফিয়ৎ

বাস্তবিক জাগতিক সকল বস্তুর সত্তা ও প্রকাশ যেমন বিশ্বতশ্চক্ষু ব্রহ্মেরই সত্তা প্রকাশে হয় সেইরূপ জাগতিক যাবৎ গ্রন্থরাশির ভাবরূপ সত্তা ও ভাষারূপ প্রকাশের একমাত্র উৎস হইতেছে—"শ্রুতি" যেহেতু জীবমাত্রেই "সংস্কারকিঙ্কর" সেইহেতু গ্রন্থরচনার অর্থ ই—"শাস্ত্রোদ্গার" ব্যতীত নূতন ভাব বা ভাষার সৃষ্টি নহে। ভাব ও ভাষা পুষ্পোদ্যানের পুষ্পের মত এবং গ্রন্থ মালার মত এবং গ্রন্থকার মালাকরের মত। মালি যেমন উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গাঁথে গ্রন্থকারও সেইরূপ শাস্ত্রোদ্যান হইতে ভাব ও ভাষা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থরূপ মালা সাজান সুতরাং গ্রন্থকার "প্রাকৃসিদ্ধ" ভাব ও ভাষাকে বিভিন্ন বিন্যাসে "সাজান মাত্র"। মালির দৌড়—সুন্দর সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া গাঁথা সেইরূপ গ্রন্থকারের কেরামতী—সূক্ষ্ম দুরূহ ভাব ও ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় প্রকাশ করা। সূক্ষ্ম দুরূহ ভাবকে প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করাই গ্রন্থকারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইলেও জগতে এত বিভিন্নভাবে ও ভাষায় নানাশাস্ত্রগ্রন্থ থাকিতেও এই পুস্তক সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইবার কৈফিয়ৎ জগতে মন ব্যতীত অন্য কেহ নাই দেখিয়া মনকেই তলব করায় মন উত্তর দিল—"বোঝার উপর শাকের আঁটি।"

এখন উপরিউক্ত "শাকের আঁটির বোঝা" বহিবার ও বুঝিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে অস্থির মনের ন্যায় অস্থির না হইয়া স্থির ধীর হইয়া শুনিতে হইবে এবং কিছু সময়েরও অপচয় করিতে হইবে।

মনের উক্তি :—আমাকে ত সকলেই ভালরকমে না চিনিয়াও নেহাৎ মন্দরকমে যে চেনেন না তাহাও নহে, এই কারণে জগতে আমার খেয়ালে

চলে না এইরূপ একটিও লোক কখন কেহ কোথাও কি দেখিয়াছেন? আমার শক্তির মাহাত্ম্য কখন কি ভাবিয়াছেন? ভয়, বিস্ময়, ত্রাস, বিপদ, উদ্বেগ, উত্তেজনা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদির বিবিধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-রাশি "আমিরূপ মনতুবড়ী" হইতেই উৎপন্ন হয়—সেদিকে দৃষ্টি কাহার কি আছে? আমিই ব্যক্তিগতভাবে, জীবদেহস্থ "ব্যষ্টিমায়া" মনরূপে পরিণত হই, আর সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপী "সমষ্টি মায়া" নামে আমি অভিহিত হই। বেদান্তশাস্ত্রে আমারই বিশেষণ দিয়াছেন "অঘটন-ঘটনা পটীয়সী"। এই পরিদৃশ্যমান নাম রূপাত্মক জগৎকে মায়িক রচনা বা মায়ায় ইন্দ্রিয়জালরূপে আমিই দেখাইতেছি। আমার প্রভাবে বিমোহিত চক্ষু ও ভ্রান্তজ্ঞানের দ্বারা এই জগদিন্দ্রজাল বিশ্বরূপে সত্যবৎ জগজ্জীবগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছে মাত্র এজন্যই এ জগতের "সৃষ্টিকর্ত্তা-ব্রহ্মা আমি"। এখন এই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বা আমার মনের স্বরূপ মন ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত বলিয়া আমাকেই তাহা বলিতে হইতেছে— মন ও বুদ্ধি একই জিনিষ। একটু পার্থক্য মাত্র আছে। মন "বাসনা-সমষ্টি" বুদ্ধি-"সংস্কার-সমষ্টি"। সংস্কার "গুপ্তবাসনা" আর বাসনা "ব্যক্ত সংস্কার।" "বুদ্ধি বা সংস্কার সমষ্টি" কল্পনাশক্তিযুক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কল্পনা-শক্তি হইতে ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। এই "ভ্রান্তি মায়া" নামে অভিহিতা হয়। বুদ্ধিও কল্পনা-শক্তি প্রসূত, সুতরাং মায়া ও বুদ্ধি একই বস্তু। বুদ্ধি বা মন, চিত্ত, অহংকার ইহারা অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি মাত্র মূলে উহারা একই জিনিষ। এই অন্তঃকরণ ও সগুণব্রহ্মের কল্পনা-শক্তি একই বস্তু। জগজ্জীবের বাসনা রাশি ব্রহ্মের কল্পনা শক্তি হইতে উৎপন্ন। জগন্মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মসত্তার "কল্পনাশক্তি" হইতেই উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মের বা আত্মার আভাস মনোরূপ অনাদিকাল-প্রসিদ্ধ জৈব সংস্কার রাশিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া মনকে জীবভাবে অনুভব শক্তি ও জীবনীশক্তি প্রদান করে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই জীবভ্রান্তিটি কাহার? মানব বলিতে কাহাকে

বুঝায় ? মানবাস্তিত্ব তত্ত্ববিশ্লেষণিক জ্ঞান-বিচার দ্বারা নির্ণীত ও নির্দ্দেশিত হয়। এই দেহমধ্যে স্থূল ইন্দ্রিয়গণ, পরে সূক্ষ্ম প্রাণ, সূক্ষ্মতর মন ও বুদ্ধি, সূক্ষ্মতম আত্মা রহিয়াছেন। বুদ্ধি মনেরই অন্তর্গত। "মনের বিচার দিকটাই" বুদ্ধি আর "কল্পনার দিকটাই" মন। "বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা" বহির্বিষয় প্রকাশ করে আর "বিবেক ইন্দ্রিয় ব্যতীত স্বয়ং অন্তর বিষয় প্রকাশ করে" সুতরাং "বিবেক দ্বারাই অন্তরতম আত্মাকে জানা যায়"। বুদ্ধি ও বিবেকে এইমাত্র ভেদ। এই যে দেহমধ্যে আত্মা রহিয়াছেন বলা হইল, এই আত্মা কোন আত্মা ? জীবাত্মা কি পরমাত্মা ? আত্মা এক ব্যতীত দুই নাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে বলা হইল, উহা শুধু অবোধ মনস্তুতকে বুঝাইবার জন্য। বাস্তবিক পক্ষে জীবাত্মা বলিয়া পৃথক্ কোন আত্মা নাই, এক পরমাত্মাই দেহের ভিতরে ও বাহিরে সমভাবে বিদ্যমান আছেন। একই পরমাত্মা দেহের ভিতর বাহিরে বিদ্যমান থাকিয়া প্রতিলোমকূপে সমভাবে অনুস্যুত রহিয়া এই জড়দেহকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। এক কথায় এই দেহমধ্যে আত্মেতর দ্বিতীয় সত্তা নাই। একই আত্মায় যে "পরম" ও "জীব" উপাধিদান করতঃ শাস্ত্রকারগণ পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপে পৃথক্ নাম প্রদান বা কল্পনা করিয়াছেন, উহা অবোধকে বুঝাইবার জন্য। সলিলে প্রতিবিম্বিত মিথ্যা চন্দ্রের অস্তিত্ব যেরূপ দেহমধ্যে জীবাত্মার অস্তিত্বও তদ্রূপ। মিথ্যা চন্দ্র যেমন মিথ্যা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ উহার অস্তিত্বও মিথ্যা উহার দর্শনও মিথ্যা এরূপ "জ্ঞান দৃষ্টিতে, আত্মদৃষ্টিতে জীবভ্রম অপগত হইলে জীবত্বও তদ্রূপ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।"

এখন গ্রন্থকাররূপ মিথ্যা জীবত্বের জীবন স্রোতের অন্ত হইতে ৩০-৩৫ বৎসর পূর্ব্বে খেয়ালী মনের খেয়ালে "চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তির সহজ উপায় বা শান্তিপথ" রচনা করিয়াছিলেন। তাহার এতদূর দুঃসাহসিকতা যে, যদিও তখন টোলের পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট রীতিমত দর্শনশাস্ত্রাদির পাঠ আরম্ভ করেন নাই কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ নিজে পাঠ করিয়া যৎসামান্য শাস্ত্ররূপা

অর্জ্জন করিয়াছেন মনে করিয়া এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত পুস্তক রচনা করেন এবং সেই পুস্তক শিক্ষাগুরু মঃ মঃ শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ও মঃ মঃ শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়দ্বয় এবং তাহার পরম সুহৃদ এবং সতীর্থ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ যিনি পরে আশ্রম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীচিৎঘনানন্দ স্বামি মহারাজ বলিয়া পরিচিত, উঁহারা উক্ত গ্রন্থ দেখিয়া, ছাপাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় তখন গ্রন্থকারের ছাপাখানা সত্ত্বেও ছাপান নাই, কারণ গ্রন্থকারের খেয়ালী মনের তখন এই সংশয় ছিল যে গ্রন্থ ছাপাইলে অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং গ্রন্থ না ছাপাইবার অন্য আর একটি কারণ ছিল যে তাহার সতীর্থ রাজেনবাবু এত পুস্তক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন যে আর কোন পুস্তক রচনা করিবার প্রয়োজন বিশেষ কিছু রাখেন নাই। ইহা ভিন্ন গ্রন্থকারের অদ্বৈত সিদ্ধির শিক্ষাগুরু মঃ মঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য বেদান্ত তীর্থ মহাশয়কে কোন রচনা করিতে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন যে পুস্তক রচনা কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি নহে, সকলেই শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করে; নূতন করিয়া কিছুই রচনা হইতে পারে না, কারণ জগতে নূতন বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রেয়, শাস্ত্র রচনার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই।

একেই ত মনুষ্য কোনও না কোন "সংস্কারের দাস" তাহার উপর গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত বহু সংস্কার প্রপীড়িত হইয়া বহু রচনা করিয়াও ছাপাইতে অনিচ্ছুক। অহঙ্কারের ভয়ে "শান্তি পথ" পুস্তকটি কীটের খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, আর অহঙ্কারের ভয়ের তোয়াক্কা না করিয়া অভয় হইয়া এই অদ্বৈতানুভূতিপ্রকাশ ছাপা হইলেও সেটিও কীটের খাদ্যরূপে অপরিহার্য্যরূপে পরিণত হইবে এই জ্ঞান সত্ত্বেও আমার মায়ানাম্নী মাতৃদেবীর উত্তরাধিকারিসূত্রে প্রাপ্ত অঘটন-ঘটনাকারিণী শক্তির প্রয়োগে গ্রন্থকারকে নিম্নলিখিত স্তোকবাক্যে বুঝাইলাম অথবা ভুলাইলাম যথা—

এ সংসারে অহঙ্কার কাহার নাই, "জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি" দ্বিবিধ শক্তিই অহঙ্কারের স্বরূপ। যাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে তাহারই অহঙ্কার

থাকিবে। কুম্ভকে তৈয়ার করে যে সে 'কুম্ভকার' সেইরূপ 'অহংকে' সৃষ্টি করে যে "জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি"—সেই অহঙ্কার। সুতরাং যতক্ষণ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিকৃত অহং থাকে ততক্ষণ 'অহঙ্কারের ডঙ্কা বাজিবেই বাজিবে'। সুতরাং পুস্তক রচনা করিলে এবং পুস্তক ছাপিলে অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবে, ইহা তাঁহারই বলা শোভা পায় যাঁহার সকল অহঙ্কার শেষ হইয়াছে অর্থাৎ "জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ"—ব্যবহার বন্ধ হইয়াছে যাহা জ্ঞানের সপ্তম অবস্থায় হয়। যতক্ষণ আমার ছেলে, আমার পিলে, আমার বাড়ি, আমার ঘড়ি, আমার দেহ, আমার মন, বুদ্ধি লইয়া অহঙ্কারে মত্ত থাকি এবং যখন ইহা আমার ক্রয় করা পুস্তক বলিতে অহঙ্কার বোধ করি না, তখন ইহা আমার 'রচিত পুস্তক' বলিলেই অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, ইহা ভাবাও কম অহঙ্কার নয়। সুতরাং অবশেষে গ্রন্থকারকে বুঝাই যে এখনত তোমার সতীর্থের নশ্বর দেহ ব্যক্তভাবে নাই, তাঁহার মধুর বৈখরী বাণী নিস্তব্ধ হইয়াছে, এবং যখন পুস্তক রচিত হইয়া গিয়াছে—এবং ইতিপূর্ব্বে যখন 'শ্রীভারতী'তে রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তবে এখন রচনারূপ অহঙ্কারের বোঝাটি পাঠক-পাঠিকাদের মস্তকে, পাঠ্যরূপ অহঙ্কাররূপে ন্যস্ত করিয়া দাও।

শত অহঙ্কারের বোঝার ভার—সহাস্যবদনে দীর্ঘ ৬৫ বৎসর ধরিয়া বহিতে পারিয়াছ, আর এই অদ্বৈতানুভূতিপ্রকাশটী ছাপাইয়া পাঠক-পাঠিকাদের উপর উক্ত বোঝা ন্যস্ত করিয়া, নিজের ও পাঠকাদির "বোঝার উপর শাকের আঁটি"টি নিজ মস্তক হইতে নামাইয়া দাও এবং উহাদের মস্তকে চাপাইয়া দাও।

আরও অহঙ্কারের প্রতি ভ্রুকুটি করিলে (স্বরূপ দৃষ্টিতে) অহঙ্কারের বোঝাটি "অন্য প্রকারেও" নাবান যায়—এখন এই অহঙ্কারটি কার "গ্রন্থকার স্বরূপের" অথবা "আমার"—গ্রন্থকারের "মনের" আমিরূপ "মনের অহঙ্কারকে" ভার মনে করা—গ্রন্থকারের ত কম অহঙ্কার নয়।

যখন সকলে দেখে—সমাধি, সুষুপ্তি, মরণ, মূর্চ্ছাতে গ্রন্থকার থাকে কিন্তু

"জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ অহঙ্কার থাকে না।" আর যেথায় "আমি মন" সেথায় দ্বিবিধ শক্তিরূপ অহঙ্কার—এবং যেথায় "আমি মন" নাই—সেথায় উক্ত দ্বিবিধ শক্তিরূপ অহঙ্কার নাই—পরের অহঙ্কারকে তার অহঙ্কার ভাবা—"মনের অহঙ্কারকে তার বলা ত গ্রন্থকারের কম অহঙ্কার নয়।"

যে অহঙ্কার "গ্রন্থকারের স্বরূপের" ত্রিসীমায় যায় না এবং ঘৃণায় কখনও ভুলেও তাহাকে স্পর্শ করেনা এহেন অহঙ্কারকে তার ঘটিবাটির মত নিজের ভাবা, অহঙ্কারীরাই গ্রন্থকারের অহঙ্কারের দৌড় বুঝুন। কৈফিয়ৎ দেওয়ারূপ অহঙ্কারটীও ঠিক যেন "বোঝার উপর শাকের আঁটির" মত কিনা সে ভার পাঠক-পাঠিকাদের উপর দিয়া—সরিয়া পড়ি, অর্থাৎ অহঙ্কারের বোঝা নামাইয়া, সদৈবমুক্তস্বরূপ হইয়া পড়ি।

—ইতি

লেখকের "মন" বা "লেখক" বা "উভয়ই"

অহঙ্কার গ্রন্থকারের চালায় লেখনী।
সংস্কার যেমনি হয় গ্রন্থও তেমনি॥

অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ

ভূমিকা

বিনা সংস্কারে যেমন কোনও জ্ঞান হয় না সেইহেতু দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থের জ্ঞানের সংস্কার জন্য ভূমিকারও বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। ভূমিকা শব্দের অর্থ—ক্ষুদ্রভূমি বা ক্ষেত্র। যেমন কোন বিস্তৃত ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে কোন ক্ষুদ্র ভূমিতে বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরিত হইবার পর সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বপন করিলে অভীষ্ট পরিমাণ শস্য লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ নানা দুরূহ ও তত্ত্বপূর্ণ কোন বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া সেই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও সেই গ্রন্থোক্ত বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করিতে হয়। এইরূপে ভূমিকা বলিতে ক্ষুদ্র ভূমিমাত্র বুঝায় সুতরাং এই গ্রন্থের ভূমিকা বলিতে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি এবং এই গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহ বুঝিবার সামর্থ্য যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাকেই বুঝায়।

অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ গ্রন্থের তথ্য বুঝিবার সামর্থ্য অর্জ্জনের জন্য দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্রহ্মজ্ঞানী সৎপুরুষের প্রজ্ঞাবাণীর মর্ম্মোদ্‌ঘাটনেই হয়। শাস্ত্র অনন্ত, বহুবিষয় জানিবার আছে, জীবনকাল সান্ত ও স্বল্প, তাহে নানান্ বিঘ্ন, সেইজন্য যাহা সার তাহাই জানিবার প্রয়োজন, হংস যেমন নীর হইতে ক্ষীরকে গ্রহণ করে তদবৎ।

ব্রাহ্মীস্থিতির জন্য শাস্ত্র ও সন্তের প্রজ্ঞাবাণীর সার :—

সাধনহীন হইয়া জিজ্ঞাসু হইলেও মনোরথ পূর্ণ হয় না। নিত্য সৎসঙ্গ করিয়া সারা জীবনে যাহা লাভ হয় উহা একঘণ্টা কুসঙ্গে সব নষ্ট হইতে পারে—কারণ কুসঙ্গ প্রাপ্ত হইতেই মন্দ সংস্কার জাগ্রত হইয়া যায়। যতক্ষণ

অজ্ঞান ততক্ষণ কাম ক্রোধ—অজ্ঞানরূপ কারণের নাশ হইলে কার্য্যরূপ কামক্রোধাদি থাকিতে পারেনা—কামক্রোধ অজ্ঞানের ধ্বজা। যাঁহার উপর যাহার পূর্ণ শ্রদ্ধা সে তাঁহারই পরায়ণ হইয়া যায় অর্থাৎ তাঁহাকে পরমাশ্রয় করে—যাহার যত পরায়ণতা কম তাহার সেইরূপই শ্রদ্ধা। ভগবানকে যিনি সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিয়াছেন তিনি ভগবানের ধ্যান ছাড়িয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারেন না। বিষয়াসক্তি যতক্ষণ ততক্ষণ ভগবত কথা দোকানদারী তাহার দ্বারা শোকমোহ নিবৃত্ত হয় না। কথার দোকানদারীকেই 'বোধশিল্পী' বলে। ভগবান ধ্যানের জন্য বৈরাগ্য আর উপরতিই মুখ্য সাধন। আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে দোষ থাকিতে পারে না। বহুকাল নিরন্তর শ্রদ্ধা ও তপের সহিত অভ্যাস করিলে যখন দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া যায় তখন পুনরায় কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থায়ও পতনের ভয় থাকে না।

অভ্যাস ছাড়িয়া কেবল বিচার ও তদ্‌নিশ্চয়ে কৃতকৃত্যতা হয় না। বিষয়ের সঙ্গ করিলেই "দৃষ্টি দুঃখ" ভোগ করিতে হইবে। গরুর শরীরে ঘী ব্যাপক থাকে—উহা দ্বারা উহার শরীর পুষ্ট হয় না, দুগ্ধ দোহন করিয়া ঘী তৈয়ারী করিয়া, উহা খাইলে উহার শরীর তাজা মোটা হইবে, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপক কিন্তু উপাসনা বিনা কাহারও আনন্দ হয় না—উপাসনা করিয়া ত্রিবিধ শরীর হইতে উহাকে আলাদা করিয়া "নিত্য নিরন্তর" উহাকে উপভোগ করিলে দুঃখের সমূলে নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রকাশ হয়। শাস্ত্র ও মহাপুরুষ নির্দ্দিষ্ট উপায় ছাড়িয়া মনের বশে চলিলে স্বাধীন হওয়া যায় না উহা মনের অধীন হওয়া একপ্রকার পরতন্ত্রতা, স্বতন্ত্রতা আর নিজ ইচ্ছানুসারে চলা দুই এক নহে। জিহ্বা আর উপস্থ এই উভয়ের সংযম না করিয়া যতই বেদান্ত বিচার কর না কেন সেই প্রকৃতির বন্ধন কখন ছুটিবে না, উহার দ্বারা চিত্তে শান্তি কখনও হইবে না—মন বশে না আসিলে সিদ্ধপনার ভাণ করিলে সাধু হওয়া যায় না।

তেজ হইতে উৎপন্ন চক্ষু রূপমাত্রকেই গ্রহণ করিতে পারে—সুন্দর আর অসুন্দর লাল নীল ফের কোথা হইতে আসে। জল হইতে উৎপন্ন রসনা স্বাদমাত্রকে গ্রহণ করিতে পারে—ভালমন্দ কটু মিষ্ট ফের কোথা হইতে আসে। বায়ু হইতে উৎপন্ন ত্বক স্পর্শমাত্রকে গ্রহণ করিতে পারে—কোমল, কঠিন ফের কোথা হইতে আসে। আকাশ হইতে উৎপন্ন শ্রোত্র শব্দমাত্রকেই গ্রহণ করিতে পারে—মধুর কঠোর আদি ফের কোথা হইতে আসে। পৃথ্বী হইতে উৎপন্ন নাসিকাগন্ধমাত্রকে গ্রহণ করিতে পারে—সুগন্ধ দুর্গন্ধ ফের কোথা হইতে আসিল। সামান্যেই বিশেষভাব কল্পিত হয়, সামান্য ও বিশেষ ভাব মায়াতেই হয়—বিনা কারণে যাহা প্রতীত হয়—বিচার করিলে যাহার কোন কারণের সন্ধান মেলে না উহাকেই মায়া বলা হয়—উহা সুন্দর অসুন্দর মিষ্ট কটু কোমল কঠিন সুগন্ধ দুর্গন্ধ, মধুর কঠোর এই সব প্রত্যক্ষ মায়ারই রূপ—মায়া বা অবিদ্যা চার প্রকারের যথা :—"লৌকিক"—"ঐন্দ্রিয়িক" "মানসিক" "তাত্ত্বিক"। "লৌকিক বিদ্যার দ্বারা" "লৌকিক অবিদ্যার"—"ঐন্দ্রিয়িক বিদ্যার" দ্বারা "ঐন্দ্রিয়িক অবিদ্যার" "মানসিক বিদ্যার" দ্বারা "মানসিক অবিদ্যার" আর "তাত্ত্বিক বিদ্যার" দ্বারা "তাত্ত্বিক অবিদ্যার" নিবৃত্তি হয়—রজ্জু সর্প শুক্তি রজত আদিকে লৌকিক অবিদ্যা বলা হয়, কারণ উহা লোক প্রসিদ্ধ ভ্রান্তি—লৌকিকবিদ্যা রজ্জু, শুক্তি আদির জ্ঞানে উহার নিবৃত্তি হয়—গরু ঘটাদি যত পিণ্ড ইহা সব লৌকিক বিদ্যাই হয়, উক্ত পিণ্ডকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়—কারণ উহা 'পঞ্চভৌতিক মায়া' ব্রহ্মাণ্ড হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সবপদার্থ পঞ্চভূতের কার্য্য আর পঞ্চভূতাত্মক হয়। উক্ত পঞ্চভূত "পঞ্চতন্মাত্রারই বিশেষ মাত্রা" হয়—অর্থাৎ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ ভিন্ন পঞ্চভূত কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না সামান্য আর বিশেষ ভাব পরস্পর পক্ষ হয়, বিশেষ ভাবকে ছাড়িয়া সামান্য ভাব থাকিতে পারে না—কারণ সামান্যেই বিশেষভাব কল্পিত হয় আর বিশেষভাবেই সামান্য সূক্ষ্মরূপে অনুগত থাকে—সেই সামান্যরূপের অজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ তন্মাত্রার গ্রহণ না করিয়া যে পিণ্ডের

গ্রহণ, পঞ্চীকৃত ভূতের গ্রহণ, তাহা রজ্জুসর্প আদির ন্যায় 'অন্যথা গ্রহণ' হয়—যাহা লৌকিক বিদ্যা তাহাই 'ঐন্দ্রিয়িক অবিদ্যা' অর্থাৎ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদিস্বরূপ হয়—উহা ঘটাদিরূপ হইয়া প্রতীত হইতেছে—বাস্তবিক ঘটনামে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিবার যোগ্য কোন পদার্থ নাই—ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়কে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ সজাতীয়ই সজাতীয়কে গ্রহণ করিতে পারে—বিজাতীয়কে পারে না রূপ আর চক্ষু তৈজস বলিয়া চক্ষু রূপমাত্রকেই গ্রহণ করিতে পারে—শব্দস্পর্শাদি গ্রহণ করিবার শক্তি চক্ষুর নাই—প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যদি অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ অসিদ্ধ হইয়া যাইবে আর প্রমাণ জ্ঞান অসম্ভব হইয়া যাইবে। কিন্তু এক ইন্দ্রিয় একই বিষয় গ্রহণ করিতে পারে যেমন চক্ষু রূপমাত্রেরই গ্রহণ করিতে পারে—রূপমাত্রতে কল্পিত যে লাল নীলাদি বিশেষরূপ উহা চক্ষু গ্রাহ্য নয়—অন্য ইন্দ্রিয়েও উহার গ্রহণ হয় না, মন ও পঞ্চভূতাত্মক হয় বলিয়া উহার আকাশাংশ শব্দমাত্রকেই গ্রহণ করিবে, অন্যান্য অংশ আপন আপন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে, ষষ্ঠ কোন ইন্দ্রিয় নাই যাহা লাল নীলাদিকে গ্রহণ করে। কিন্তু "অবিদ্যা সহিত চক্ষুই" লাল নীলাদিকে গ্রহণ করে—ইহা মানিতে হইবে, সেইজন্য যাহা লৌকিক বিদ্যা উহাই ঐন্দ্রিয়িক অবিদ্যা—ঘটাদি পিণ্ডের গ্রাহক কোন ইন্দ্রিয় নাই—'ঘটের আকার' লাল নীলাদির ন্যায় কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে "ইন্দ্রিয়ের অন্যথা গ্রহণেই গ্রসিত"—কিন্তু উহা রজ্জুসর্পের ন্যায় ভ্রান্তিরূপ হয় আর দৃশ্যপ্রপঞ্চ যাহাকে লৌকিক বিদ্যা কহা হয় উহাই ঐন্দ্রিয়িক অবিদ্যা হয়। এই ঐন্দ্রিয়িক অবিদ্যার নিবৃত্তি ঐন্দ্রিয়িক বিদ্যাতেই হয় অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদিস্বরূপই হয়—উহা শব্দাদি হইতে পৃথক নহে—এইরূপ জ্ঞানে ঘটাদি যত পদার্থ আছে উহা রূপাদি সামান্যে কল্পিত এইরূপ জানা যায়—ইন্দ্রিয়ের বিষয় মাত্র জানিলে "ঐন্দ্রিয়িক অবিদ্যা রজ্জু শুক্তি আদির নিবৃত্তি হয়" যাহাকে ঐন্দ্রিয়িক বিদ্যা বলা হইল

উহা পুনরায় মানসিক অবিদ্যা হয়। অর্থাৎ "সর্ব্বপ্রপঞ্চ মনোমাত্রই হয়, বাহিরে ইন্দ্রিয়ের বিষয় কিঞ্চিৎমাত্রও নাই—এই মনোমাত্রকে অজ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়মাত্র প্রতীত হয় কিন্তু "উহা মানসিক অবিদ্যা," "মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হইলে অতি নিকটস্থ পদার্থও ইন্দ্রিয়গোচর হয় না"—"মন কোন শব্দ শুনিতে লাগিলে চক্ষু সেই সময় অতি নিকটস্থ সুন্দর প্রকাশমান পদার্থও দেখে না," এইরূপ যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ হয় সেই ইন্দ্রিয় আপন বিষয়কে জানিতে পারে—অন্য ইন্দ্রিয় ও উহার বিষয় বর্ত্তমান থাকিলেও গ্রহণ হয় না কিন্তু রূপমাত্র দর্শনও মনোমাত্রই হয় "এই মনোমাত্রতাকে না জানিয়া ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় গ্রহণতা কল্পিত হয়" উহা মানসিক অবিদ্যা, মানসিক বিদ্যায় মানসিক অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়—সব প্রপঞ্চ মনোমাত্রই হয় মনোযোগের সহিত উহার অন্বয় ব্যতিরেক হয় অর্থাৎ "মন দেখিলেই চক্ষু দেখে—মন না দেখিলে চক্ষু দেখে না এখন সারা-প্রপঞ্চ মনোমাত্রই শেষ রহিল।" ঘোর অন্ধকারযুক্ত রাত্রিতে যেমন কোন পথিক অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখে না এই সময় জোনাকির আলোকে অন্ধকার কিছু কম হইয়া যায় ফের জোনাকির প্রকাশ দূর হইলে সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর অন্ধকার ঘিরিয়া ফেলে এইরূপই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সব পদার্থ অজ্ঞাত হয়, কিন্তু সেই সময়েও উহা সেই স্বয়ংপ্রকাশের দ্বারা অজ্ঞাতরূপে প্রকাশিত থাকে—বুদ্ধির সহিত যখন যে পদার্থের সংযোগ হয় তখন সেই পদার্থ বুদ্ধি গোচর হয়—অন্যান্য পদার্থ সেই সময়ে অজ্ঞাতই থাকে—এইজন্য পদার্থের "জ্ঞাত সত্তা আর অজ্ঞাত সত্তা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধের উপরই নির্ভর করে"—বুদ্ধি ও মন একই পদার্থ—বৃত্তির ভেদেই উহাদের নামের ভেদ হয়—দৃষ্টান্তিক স্থানেও আত্মা স্বয়ং জ্যোতি দ্রষ্টা ও সাক্ষী আপনাকেও জানে আর অজ্ঞান ও বুদ্ধিকেও জানে। বুদ্ধির ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ হয় এইজন্য জোনাকির প্রকাশের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নাশবান—বাহিরের পদার্থও বুদ্ধির সহিত উৎপন্ন ও লীন হয়—বুদ্ধির

গ্রহণ ভিন্ন উহার গ্রহণ হওয়া অসম্ভব—কিন্তু উহা বুদ্ধি হইতে ভিন্ন নহে—যাহার সত্তাতে যে হয়—উহা উহারই রূপ হয়—বাহ্য পদার্থের সত্তা মনের উপর নির্ভর করে সুতরাং বাহ্য পদার্থ মনোমাত্রেই হয়—বাহিরে যখন কোন পদার্থ থাকে না সেই সময় মন স্বপ্নে নানা পদার্থ বাহিরে দেখে সেই সময় উহা আপনার কল্পনা দ্বারাই সব পদার্থ তৈয়ার করিয়া জাগ্রত অবস্থার ন্যায় বাহিরে প্রত্যক্ষ করে—মনের এইরূপ তৈয়ার করা ও নাশ করা স্বপ্নে নিত্য সকলে প্রত্যেকেই অনুভব করে—কিন্তু ইহাতেও কাহারও সৎবুদ্ধি হয় না, ভ্রান্তি স্থানেও যেমন মরুভূমিতে জল ভ্রান্তি শুক্তিতে রজত ভ্রান্তি আর রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি স্থানে সবের মিথ্যা বুদ্ধি হয়—স্মৃতি স্থানেও পদার্থ না থাকিলেও পূর্ব্ব অনুভূত পদার্থের মানসিক প্রত্যক্ষ হয় মনোরথ কালেও সবের মনের অসৎ কল্পনা অনুভব হয়—উহা যে বাসনাময় তাহাতেও কাহারও সংশয় হয় না—কিন্তু দৃশ্য প্রপঞ্চকে কল্পনা বলিয়া মানিতে লোকের ভয় হয়—এক মণ চাল কোন পাত্রে পাক করিবার জন্য দেয়া গেলে উহা হইতে একটী চাল পরীক্ষা করিলেই জানা যায় যে সব চাল সিদ্ধ হইয়াছে কিনা বত্রিশ সের দেখিলে শেষ আট সেরে কোন শঙ্কা থাকে না যে সিদ্ধ হইয়াছে কিনা এইরূপ মনের ভ্রান্তি স্মৃতি মনরাজ্য আর স্বপ্ন আদিক মিথ্যা জানিয়া বাহিরের পদার্থ মনের কল্পনা তাহাতে সংশয় করিবার কি প্রয়োজন—সেই মানসিক কল্পনা পদার্থের যথার্থ স্বরূপের অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়—এই জন্য যাহা মানসিক বিদ্যা উহাই তাত্ত্বিক অবিদ্যা—অর্থাৎ বস্তু তত্ত্বের অজ্ঞানেই মন মাত্রতা প্রতীত হয়—এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পারমার্থিক যথার্থ বস্তু উহাকে না জানিয়া এই মনমাত্রতা প্রতীত হইয়া রহিয়াছে—ইহা তাত্ত্বিক অবিদ্যা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ তাত্ত্বিক বিদ্যার দ্বারা তাত্ত্বিক অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়—অর্থাৎ এক অখণ্ড চিন্ময় নির্ব্বিকার নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ অদ্বৈত বস্তুতে মনোরূপ দ্বৈতের স্ফুরণ মায়া বিনা হইতে পারে না—মায়ায় যখন মনের উৎপত্তি হয় সেই সময়ও অখণ্ড বস্তু স্বরূপে যেমন তেমনই

থাকে, যেমন কোন পুরুষের চারিদিকে অগণিত লোক বসিয়াছে সেই সব লোক মধ্যে স্থিত লোকের কেহ উত্তরে কেহ দক্ষিণে কেহ পূর্ব্বে আর কেহ পশ্চিমে কল্পনা করিতে থাকে—কিন্তু মধ্যে স্থিত লোকের দৃষ্টিতে উহা যেমন তেমনই থাকে অন্য পুরুষের পূর্ব্ব আদি কল্পনা উহার কোন ভিন্নরূপ করিতে পারে না সে জানে আমি যেমন ছিলাম সেইরূপই আছি—পরে ও ঐরূপই থাকিব "অহংরূপ করিয়া যে যে কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা প্রথমেও ছিল না আর পরেও থাকিবে না"—এই দৃঢ়রূপতা অর্থাৎ পূর্ব্ব আদি তৎকালেই কল্পনার সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছিল—উহার কোন আপন সত্তা নাই—আর "অহং রূপ বস্তু কল্পনা মাত্রই হয়"—ফের শেষ সর্ব্বত্র অহংই অহং রহিল—এক অখণ্ড বিজ্ঞানঘন বস্তুতে যে অহং রূপতার আরোপ—উহা অবিদ্যাতেই হয় "মনোমাত্রতাও অহং রূপই হয়"—কিন্তু বাস্তবিক মনও কিছু বস্তু নয় এজন্য শাস্ত্রে আছে যে :—

"অবিদ্যা যো নয়ো ভাবা সর্বেঽমীবুদ্বুদাইব।

ক্ষণমুদ্ভূয়গচ্ছন্তি জ্ঞানৈক জলধৌলয়ম্॥ (বে. সি. মুক্তাবলি)

অর্থাৎ :—অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন যত পদার্থ আছে উহা সব জলের বুদ্‌বুদের মত কিছুক্ষণের জন্য উৎপন্ন হইয়া ফের জলেই লীন হইয়া যায়। প্রথমে মন কিছু বস্তুর কল্পনা করে, তাহার উপর মনের যে ভাল মন্দ ভাব হয় উহাই অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা—অনুকূল পদার্থে রাগ ও প্রতিকূল পদার্থে দ্বেষ বুদ্ধি হয়, এইরূপ দ্বেষ ইন্দ্রিয়ে নাই, যদি রাগ দ্বেষ ইন্দ্রিয়ে হইত ত ইন্দ্রিয় উহাকে গ্রহণ করিতেই পারিত না—স্বয়ং প্রকাশ আত্মাতেও রাগ দ্বেষ নাই—আত্মা দীপকের ন্যায় সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক মাত্র হয় —সেইজন্য উহা "অবিদ্যা যুক্ত মনেরই ধর্ম্ম" হয়—যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ রাগ দ্বেষ থাকে—সুষুপ্তিতে মন থাকে না তখন রাগ দ্বেষও থাকে না—সেই জন্য জানা যায় যে রাগ দ্বেষ মনের ধর্ম্ম—মনের সত্তাতেই যাহার সত্তা আর মনের অভাবেই যাহার অভাব তাহা মন মাত্রই হয়—মনের অমনী

ভাব হইলে বাহিরে পদার্থও থাকে না আর রাগ দ্বেষ ও থাকে না, রাগ দ্বেষ না থাকিলে বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়া যায়—আর ইহাতে, বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া শুদ্ধরূপ প্রকাশিত হয়—রাগ দ্বেষ আদি আসুরী বৃত্তি দ্বারা যতক্ষণ চিত্ত মলীন থাকে ততক্ষণ আত্মার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে স্পষ্ট না পড়িলে বুদ্ধির মলীনতা আত্মায় আরোপ হয়।

আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ইহাতে গুণ দোষের লেশমাত্রও নাই—বুদ্ধি আদির সঙ্গ করিয়াই উহাদের দোষগুণ আত্মায় আরোপিত হয় যখন আত্মাকে বুদ্ধি আদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক দেখা যায় আর আত্মাকে আত্মস্বরূপই অনুভব করা যায় তাহা হইলে আত্মার কোন গুণ দোষ প্রতীত হয় না—যেমন সূর্য্য অন্ধকারের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রাখে না, কেবল প্রকাশ স্বরূপ হয়। আত্মার প্রাপ্তির জন্য কোন কর্ম্মের সাধন মানিবার আবশ্যকতা ও নাই—কারণ আত্মা কোন কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু আত্মা নিত্য প্রাপ্ত, যেমন নিত্য প্রাপ্ত আকাশ কুম্ভকার আদির দ্বারা উৎপন্ন হয় না কিন্তু ঘট উৎপন্ন হইলেই আকাশে পূর্ণ হইয়া যায় এরূপ আত্মাও সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হয় বলিয়া বুদ্ধি আদি উৎপন্ন হইলেই পরিপূর্ণ হইয়া যায়—যেমন ঘড়ায় জল ভরান, আনা আদি ক্রিয়া আপন প্রযত্নের দ্বারা হয় এইজন্য জল বাহির করা আদিও আপনার প্রযত্নের দ্বারাই হয়—এইরূপ বহু জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গের কারণ ঐ বুদ্ধি আদিতে গুণদোষ আসিয়াছে, ইহা কেহই জানিতে পারিবে না যে এই গুণ দোষ কবে কিরূপে আর কোথা হইতে আসিয়াছে এই সব জানিবার জন্য প্রযত্ন করা ব্যর্থ হয় ইহাদের নিবৃত্তি করাই চাই—শাস্ত্র আর মহাপুরুষেরা ইহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিয়াছেন, উহাদের আজ্ঞা মানিয়া বহু লোকের গুণ দোষের নিবৃত্তিও হইয়া গিয়াছে—এইরূপ উহাদের আজ্ঞানুসারে আচরণ করিয়া দোষকে দূর করা চাই। অজ্ঞানীর তিন প্রকার দোষ, মল, বিক্ষেপ ও আবরণ এই তিন প্রকার দোষ দেখা যায়—মল দোষ কাম ক্রোধাদিকে বলা হয় আর ইহার নিবৃত্তি গুরু মহাত্মাদির

সেবা করিলে ও অহিংসা পালন করিলে হয় ইহাকে শারীরিক তপ বলা হয়।

বিক্ষেপ চিত্তের চঞ্চলতাকে বলা হয় ইহা প্রায় বাক্য ব্যবহার ঠিক না হইতে উৎপন্ন হয় এইজন্য বাক্যের সংযম করিলে ইহার নিবৃত্তি দেখা যায় —মৌনীর চিত্তে বিক্ষেপ খুব কম কেন না রাগদ্বেষ বাক্য ব্যবহারে উৎপন্ন হয়। বাক্য নিরোধ করিলে অসৎ ভাষণ পরনিন্দা আর রাগদ্বেষাদি উৎপন্ন হইতে পারে না—যাহার নিজবাক্যের উপর অধিকার নাই তাহারই পরনিন্দায় প্রবৃত্তি হয় কারণ এইরূপ বাক্যের বিলাসই পরনিন্দারূপ হয়।

কিঞ্চিৎ বাক্য সংযম করিলে এই দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আর মৌন ধারণ করিলে এই দোষের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। ভয় আর লোভ মনুষ্যকে অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত করাইতে পারে কিন্তু পরনিন্দা করাইতে অক্ষম আর পরনিন্দা ত্যাগ করিলে আধ্যাত্মিক জীবনে অশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারে। সাধারণ মনুষ্য প্রতিদিন বিশেষ করিয়া পরনিন্দাদিতেই সময় ব্যতীত করে, যদি ঐ সময়ে ধারণা, ধ্যান আর শাস্ত্রবিচার আদি করে ত চিত্তদোষ হইতে রহিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করিতে পারে—যাহার বাক্যসংযম নাই উহার মৌনধারণ করার প্রয়োজন—ইহাতে লোক ব্যবহার কম হইবে আর চিত্ত ও ধীরে ধীরে শান্ত হইবে—কম কথা কওয়া মৌন অপেক্ষাও কঠিন তপ —কম কথা যাহারা কয় তাহাদের মৌন হইবার আবশ্যক নাই—মনের শীঘ্র শান্তি করিবার জন্য মৌন অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ সাধন নাই। মৌন একপ্রকার মানসিক তপ ইহাতে শারীরিক বাচিক আর মানসিক তপ সিদ্ধ হয়। যতক্ষণ না তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়—ততক্ষণ আবরণ দোষের নাশ হয় না—আত্মাকে দেহাদি সংঘাত হইতে সর্ব্বদা পৃথক করিয়া আপন স্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্য নিরন্তর ধ্যান করিলে আবরণ দোষ নষ্ট হয়—মৌন ধ্যানের সহায়ক ধ্যান ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে আবরণ দূর হয় না, নিত্য নিরন্তর ধ্যানে কেবল অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়া যায় তখন ধ্যাতা ধ্যান আর ধ্যেয় এক হইয়া

যায় আর সেই সময় সকল প্রকার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়া যায়—আর জীবন মুক্তির আনন্দ অনুভব হইতে থাকে—"বিচারেও ধ্যাতা ধ্যেয়ের একতা অনুভব করা যাইতে পারে"—শাস্ত্রের সহায়তায় আর গুরুমুখে উপদেশ শুনিয়া সেই সময়ে ব্রহ্ম আর আত্মার একতার সংশয় রহিত জ্ঞান হয়—যদ্যপি উহাও বিচারের সম্বন্ধ রাখে তাহা হইলেও উহাকে বিচার বলা যায় না কারণ উহা দ্বারা চিত্ত স্থির হয় না—শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা যে সত্ত্ব নিশ্চয় হয় উহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চিত্তে স্থির করিয়া আর সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ভালভাবে চিত্তে স্থির করার নাম 'নিদিধ্যাসন' হয়—এই সূক্ষ্ম বিচার দ্বারাই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় যতক্ষণ মন সত্যে রঞ্জিত না হয়—কিন্তু সংশয় ও বিপর্যয়ে পড়িয়া থাকে ততক্ষণ শাস্ত্র ও গুরুমুখে শ্রবণ—তথা যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় করিলেও তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না আর মন হইতেও এইজন্য মন্দ বাসনা আর ভোগ সংস্কার মুক্ত হয় না—সত্ত্বকে জানিলেও মিথ্যা পদার্থে চিত্তে বৈরাগ্য হয় না অর্থাৎ বহুকালাবধি নিত্য নিরন্তর নিদিধ্যাসন করিয়া সবপ্রকার পাপ নাশ হইয়া নিদিধ্যাসনের সংস্কার তীব্রতর হইয়া বাড়িয়া যায় আর মিথ্যা পদার্থে দৃঢ় বিতৃষ্ণা হইয়া যায়—যাহার জন্য সত্ত্ব সাধনে চিত্তে আপন জ্যোতির প্রকাশ হইতে থাকে। শাস্ত্র গুরু উপদেশ যুক্তি আর নিদিধ্যাসনে যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়—উহার দ্বারা আবরণের নিবৃত্তি হইলে পুনরায় আবরণের উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না—সংস্কার হইতে বাসনার উদয় হইলেও অভ্যাসের বলে ধীরে ধীরে উহার নিবৃত্তি হইয়া যায়।

যতক্ষণ প্রারব্ধের ক্ষয় না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাসনার বীজ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না—ব্রাহ্মীস্থিতির প্রবল প্রভাবের কারণ দুর্ব্বল বাসনায় তত্ত্বজ্ঞানে আবরণ পড়িতে পারেনা ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় অবিদ্যার বীজ নষ্ট হইয়া যাইবার পরও উহার কার্য্য বাসনারূপে থাকিতে পারে।

মহাপুরুষের একমাত্র ইহাই কর্ত্তব্য কার্য্য হয় যে আপনার দুঃখকে চিরকালের জন্য সমূলে নাশ করিবার চেষ্টা করা। সংসারে কদাচিৎ এমন

কোন প্রাণী নাই, যাহাকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আর আধিভৌতিকাদি ত্রিবিধ দুঃখসন্তপ্ত না করে। চায় যে কেউ কোন ধন্ধায় থাকুক না কেন, পরন্তু সে দুঃখ হইতে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইতে পারে না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে থাকে। ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষ বুঝায় যে শিশুর এইরূপ দুঃখ আছে যাহা সহ্য করিবার শক্তি উহার নাই। ইহার অর্থ এই হয় যে মাতৃগর্ভে পতিত হইয়াই জীব দুঃখের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া যায়। পুনরায় যতই উহার চেতনা-শক্তি বৃদ্ধি পায় ততই দুঃখ জটিল ও গম্ভীর হইতে থাকে। যতই সে দুঃখকে সরাইবার চেষ্টা করে ততই সে আরও অধিক দুঃখে ফাঁসিয়া যায়। সংসারী মনুষ্যের এই দশা। প্রত্যেক প্রাণীর প্রতিপলে ইহার অনুভব হইতেছে। নিজ নিজ দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা, দুঃখ নিবারণ করিবার উপায়ের অভিলাষ আর উপায়কে কার্য্যরূপে পরিণত করিয়া, উহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা উৎপন্ন হয়।

এই একমাত্র দুঃখ দূর করিবার জন্য সংসারে নানাপ্রকারে ক্রোরপথ রচিত হইয়াছে এবং সেই দুঃখকে দূর করিবার জন্য সায়েন্সের দিন দিন আবিষ্কার হইতেছে। এইরূপে মনুষ্য আকাশ পাতালকে এক করিয়াছে। আপনার সুখ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী মনুষ্য তৈয়ার করিয়া আসিতেছে, আপনার দুঃখকে একেবারে দূর করিয়া "অকণ্টক সুখ" (দুঃখবিহীন সুখ) ভোগের জন্য অপরকে দুঃখ দেওয়াই সুধু নহে, উহাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিবার জন্যও, উহারা নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করিতেছে।

যখন সংসারে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা দুঃখকে দূর না করিবার জন্য করা যায় অর্থাৎ দুঃখকে দূর করিবার জন্য যাবৎ কর্ম্ম করা হয়, তখন কেমন করিয়া দর্শনশাস্ত্র কেবল এই নিয়মের বাহিরে থাকিতে পারে? কিন্তু উহার সংসারে অবতরণই দুঃখকে দূর করিবার অভিপ্রায় হয়। অন্য শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রে অনেক তফাৎ। অন্য শাস্ত্রে যথা, আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে কোন রোগরূপ দুঃখকে প্রথমতঃ দূর করিবারই সামর্থ্য হইবে কিনা তাহার সন্দেহ;

যদি সমর্থও হয় ত সাময়িক দূর করিতে পারে, তাহাদের এমন শক্তি নাই যে চিরজীবনের জন্য রোগমুক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের দর্শন চিরকালের জন্য, নিশ্চিন্তরূপে, দুঃখ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিবার যথার্থ উপায় দেখাইয়া দেয়। দর্শন দুঃখের মূলের সন্ধান করে। উহার কাজই দুঃখের সমূল এবং সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা। দুঃখের মূল কি হয় আর কি করিয়া চিরকালের মত সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা যায়, ইহার উত্তর দর্শনশাস্ত্র বিবিধরূপে দেয়।

সকল মনুষ্য ত্রিবিধ দুঃখে আপনি ভোগে, কিন্তু কেবল আপনারই দুঃখে মনুষ্য দুঃখী হয় না—যতক্ষণ সংসারে কোথাও দুঃখ থাকে, ততক্ষণ আপনারও অবশ্য দুঃখ হইবে, কোটি উপায়েও তাহার নিবৃত্তি হইবে না। যদি আপনি স্বয়ং দুঃখী নাও হন, তথাপি দুঃখে নিপীড়িত প্রাণীকে জানিলে আপনাকে বলপূর্ব্বক দুঃখিত করিবে।

কিন্তু ইহা কেন না হয়? যখন একই পরমাত্মা সারা প্রপঞ্চকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার একই সাগরবারির বিকাররূপ আমরা সব ফেন-বুদ্বুদ্—তরঙ্গ হই, যখন একেরই প্রতিবিম্ব প্রত্যেক দর্পণে পড়িয়াছে, তখন কি করিয়া হইতে পারে যে কোথাও দুঃখ থাকে আর কোথাও একেবারে চলিয়া যায়? পরিণাম ইহা হয় যে যেমন আগুনের ধর্ম্ম জ্বলন আর জ্বালান হয়। নদীর ধর্ম্ম বহা আর বহান, সেইরূপ মনুষ্যের ধর্ম্ম আপনার ও অপরের দুঃখ বিনষ্ট করা। ব্যাসের ১৮ পুরাণের সার এই—"পরোপকারঃ পুণ্যায়, পাপায় পরপীড়নম্"। এই জন্যই অষ্টাঙ্গ যোগের মূলে মহর্ষি পতঞ্জলি যমকে আর যমের মূলে সার্বভৌম অহিংসাকে রাখিয়াছেন।

দর্শন নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দেয়:—

দুঃখের মূল কি? মনুষ্য কি হয়? সে কোথা হইতে আসিয়াছে? কোথায় যাইবে? সুখ কি? দুঃখ কি হয়? ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে? কেন আসিয়াছে? ইত্যাদি আর আত্মা, পরমাত্মা, জীব,

সংসার, মায়া, সৃষ্টি, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, পদ, পদার্থ, প্রমাণ, অপ্রমাণ, স্বর্গ, নরক, আদি সবের ইতিহাস রচিয়াছেন।

দর্শন বলে—"কণ্টকং কণ্টকেনৈব শোধয়েৎ" কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করা আর "বিষস্য বিষমৌষধম্" বিষের ঔষধ বিষই হয়। এইরূপ যখন দুঃখের উৎপত্তি আর বিকাশ "চেতনা শক্তি" আর "বুদ্ধির সঙ্গেই" হয় তখন "সেই দুঃখের নাশও জ্ঞানেই" হইবে। বিপত্তি মূল চৈতন্য শিখার নেবানকে নির্ব্বাণ বলা হয়। অবিদ্যার জন্য দুঃখ, বিদ্যার দ্বারা নাশ হয়। এই জন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ঋতে জ্ঞানান্নমুক্তি।" বিনা জ্ঞানে মুক্তি হয় না। ধ্যান দিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, "দুঃখ মন হইতেই উৎপন্ন হয়" কি কারণে যে বস্তু আমায় সুখ দেয়, তাহাই আপনাকে দুঃখ দেয়? দুঃখ আপনার মন স্বয়ং উৎপন্ন করিয়াছে, মানিয়া লইয়াছে। আপনি ইচ্ছা করিলে দুঃখ দূর করিতে পারেন। যে অবস্থাকে আপনি বিপত্তি মনে করেন সেই অবস্থা অন্যে সম্পদ বলিয়া বুঝেন। যদি আপনিও উহাকে সম্পদ বলিয়া বুঝেন, তাহা হইলে উহা আপনার নিকট সম্পদ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ" অর্থাৎ মনই মনুষ্যগণকে দুঃখে বন্ধন করে এবং মনই দুঃখ মোচন করে।

আসল তথ্যের জ্ঞান হইলে সুখ দুঃখের ঝঞ্ঝাট দূর হয়। নিজ স্বরূপের বা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলে, কোন সন্দেহ থাকে না যে, কর্ম্মফলরূপ সুখ দুঃখ চিরকালের জন্য শীঘ্র বিশীর্ণ হইয়া যাইবে।

"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিদৃষ্টে পরাবরে॥"

এইজন্য বেদ বার বার উচ্চস্বরে বলিতেছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" "তমেব বিদিত্বাৎ অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

মনুও বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মনং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যান্নাত্মনা জীবো স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥"

এই সব কথার বিচার যে প্রকারে তর্ক ও যুক্তির দ্বারা মহর্ষিগণ ষড়্‌দর্শন রচনা করিয়াছেন, উহার সার তথ্য এই পুস্তকে বলা হইয়াছে।

যতক্ষণ মনুষ্য অজ্ঞানাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার বিষয়ানন্দকেই আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ বলিয়া বুঝে; আপন অনুচিত বিহার বিলাসকেই স্বর্গসুখ হইতে অধিক বলিয়া মানে, আপনার উদর পূর্ত্তিকেই যজ্ঞ বলিয়া জানে, আপনার বাড়িঘরকেই চতুর্দ্দশ ভুবন বলিয়া বুঝে, আপনার স্বার্থকেই পরমার্থ বলিয়াই জানে আর আপনার দুঃখময় আর ব্যাধিমন্দির দেহকেই আনন্দময় আত্মা বলিয়া বুঝে; এইরূপ মনুষ্যের অজ্ঞানপঙ্কে মনুষ্যত্বের অনন্তশক্তি গলিয়া যায়। এই মনুষ্য আপন আত্মাকে দুঃখী, দীন, হীন ও দরিদ্র বলিয়া মানে, আর অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া বহুসাধনার অমূল্য জীবন, অগাধ দুঃখ সাগরে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত হয়। এইরূপ মনুষ্যের উদ্ধারের জন্য দর্শনশাস্ত্রের অবতরণ হইয়াছে। এইরূপ মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, দীনতা আর জড়তাকে বিনষ্ট করিয়া দর্শনশাস্ত্র উহার মনে ব্যাপকতা মহত্ত্বতা ও জাগরণতা ভরিয়া দেন, যাহার জন্য উহার অন্তঃকরণ আনন্দ ও শান্তির বিমল জ্যোৎস্নায় সদা প্রফুল্লিত থাকে।

সাধারণ লোক দেহকেই আত্মা বলিয়া মানে। দর্শন বলে দেহ আত্মা নহে—উহা দেহ হইতে ভিন্ন দুঃখ দারিদহন পদার্থ। মনুষ্য স্বভাবতঃই সকল সময় উপদেশেই সন্তুষ্ট থাকে না। যখন প্রত্যক্ষ দেখে যে দেহই সব কার্য্য করে, তাহারই সুখ দুঃখে নিজের বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে এক অদৃশ্য পদার্থকে উহার হর্ত্তাকর্ত্তা কি করিয়া মানে? এইরূপ স্থলে দর্শনশাস্ত্র অনেকানেক তর্ক যুক্তি দ্বারা আপনার প্রতিপাদ্যকে প্রমাণিত করিয়া দেয়। দর্শন বলে যে, দেহ জড় পদার্থ হয়। সংসারে দেখাযায় যে, "কোন জড়পদার্থে

চিন্তা ও বিচার করিবার শক্তি নাই" ; এই জন্য "যে চিন্তাকরে সে দেহ হইতে ভিন্ন অন্য পদার্থ হয়, যাহার নাম আত্মা হয়।" যদি বলাযায় যে দেহ এক "বিলক্ষণ জড়" হয়, যাহার ভিতরে চিন্তা করিবারও স্বাভাবিক শক্তি আছে, ইহার উত্তর দর্শন দেয় যে, "দেহে স্মরণশক্তি" থাকে ত উহা "মৃতদেহেও থাকা উচিত। কিন্তু মৃতদেহে সেই শক্তি দেখা যায় না।"

এই যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া অন্য জড়বাদী বলে যে, আমরা জানি যে, দেহ আত্মা নহে কিন্তু উহার "পরমাণু আত্মা হয়।" আর বিভিন্ন পরমাণু বিবিধ চেতন স্বরূপ হইয়া সব কাজ করিতেছে। দর্শন শাস্ত্র বলেন যে, যদি পরমাণুই আত্মা বা চেতন হয় তো শৈশবের কার্য্যের যৌবনে স্মরণ না থাকাই উচিৎ ; কারণ সাত বৎসরের পরেই শরীরের সমস্ত পরমাণু বদলাইয়া যায় আর এদিকে দেখা যায় যে বাল্যকালের অনুভূত বস্তুরও যৌবনেও পূর্ণজ্ঞান থাকে। সেইজন্য পরমাণু আত্মা হইতে পারে না। যদি ইহা বলাযায় যে "কারণরূপ" শৈশবের সংস্কার হইতে "কার্য্যরূপ" যুবাবস্থার সংস্কারের জ্ঞান হয়, তাহাতে দর্শনশাস্ত্র উত্তর দেন যে, তাহা হইলে মাতৃরূপ কারণের জ্ঞান কার্য্যরূপ বালকের কেন জ্ঞান হয় না ?

দ্বিতীয় কথা এই যে, অনেক পরমাণুরূপ চেতন একই দেহে থাকিতে পারে না; কারণ সকল চেতনে সদাসর্ব্বদা ঐক্যমত থাকিতে পারেনা। যদি কখন পায়ের চেতন চলিতে চায় আর মস্তিষ্ক চেতন দাঁড়াইতে চায় ত দেহের অনর্থ হইবে। অনেক চেতন থাকিলে যদি হাত কাটিয়া যায় ত উহার জ্ঞান পায়ে থাকিতে পারে না ; কারণ কাটা হাতের চেতন চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ অনেকানেক তর্কের খণ্ডন করিয়া দর্শনশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করে যে আত্মা দেহ, পরমাণু, ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থ নহে, "উহা শুদ্ধ, বুদ্ধ আর স্মরণ অনুভব শীল চেতন হন।"

মানুষমাত্রের একমাত্র লক্ষ্য "মনুষ্যত্ব" লাভ করা। মনুষ্যত্ব কি ? "আমি কে" তাহার সম্যকজ্ঞানই যথার্থ মনুষ্যত্ব। "আত্মপরিচয়" হইলে,

"আপনাকে জানিতে পারিলে" লক্ষ্যস্বরূপে উপস্থিত হওয়া যায়, যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ হয়, সকল অভাবের রোদন থামিয়া যায়।

জাগ্রত স্বপ্নসুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় যে "সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে" "উহাই জীবের আপন", "উহাই জীবের জীবন"। জাগ্রত অবস্থায় চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় যখন রূপরসাদি বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে, তখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সহিত "আমি ইহা জানিতেছি" এইরূপ একটি জ্ঞান অন্তরে ফুটিয়া উঠে। চক্ষু দ্বারা রূপদর্শন করা হয়, তখন অন্তর রাজ্যে "আমি রূপ জানিতেছি" এইরূপ একটি বোধের স্ফুরণ হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিলে "আমি জানিতেছি" এইরূপ জ্ঞান অন্তরে ফুটিয়া উঠে। জাগ্রত অবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূলে যে একটি "আমি" রহিয়াছে, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নাবস্থার "আমির সত্তা অক্ষুণ্ণ" ভাবেই থাকে। স্বপ্ন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই একটি "আমি জ্ঞান" ফুটিয়া উঠে. ঐ "আমি" স্বপ্নের "দ্রষ্টা"। এইরূপ গাঢ় নিদ্রিতাবস্থায় ও ঐ "আমির সত্তা" অক্ষুণ্ণ থাকে। কারণ সুষুপ্তাবস্থায় "সুখবিষয়ক ও অজ্ঞানবিষয়ক" জ্ঞান উদ্বুদ্ধ থাকে। এই জ্ঞান কোনও অবস্থায় নিদ্রিত হয় না। নিত্যই জাগ্রত থাকে। এই "জাগরণময় সত্তাটীই আমি"। যিনি সুষুপ্তিতে জাগিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্ম তিনি অমৃত বলিয়া কথিত হন, যাঁহার প্রকাশে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি কালে প্রপঞ্চ সমূহ প্রকাশিত হয়, "সেই প্রকাশ স্বরূপ বস্তুই ব্রহ্ম—আমি।"

"বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি।
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা॥"

"বাল্যাদি অবস্থায় এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে" যে "এক অবিকারী আমির" সন্ধান পাওয়া গেল, উনিই সকল অবস্থার একমাত্র "দ্রষ্টা"। অন্তর বাহ্যে যাবতীয় দৃশ্য "যে জ্ঞানে" প্রকাশিত হয়, "সেই জ্ঞানের নাম দ্রষ্টা।" "এই দ্রষ্টাস্বরূপ আমাতে কোন অবস্থাই নাই।" ইহা অন্বয় ব্যতিরেকে দ্বারা জানা যায়। তাহার পর—"এই আমি পঞ্চকোষেরও দ্রষ্টা" সুতরাং

"পঞ্চকোষও আমি নহি"। যাহা "আমার" শব্দদ্বারা প্রতিপন্ন হয় তাহা হইতে "আমি" সম্পূর্ণ পৃথক। পরিহিত বস্ত্রকে যেরূপ আমি বস্ত্র বলি না, আমার বস্ত্রই বলিয়া থাকি; এ স্থলে বস্ত্র হইতে আমি যেরূপ পৃথক, আমার শরীর বলিলেও ঠিক তদ্রূপ এই পঞ্চকোষরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর হইতে "আমার" পৃথকত্বই বুঝায়। আর এই শরীর, জন্মের পূর্ব্বেও ছিল না, এবং মৃত্যুর পরেও থাকিবে না, এই "অভাবকে আমি জানি", এবং বর্ত্তমানে যে শরীর আছে এই "অস্তিত্বের জ্ঞাতাও আমি।" অতএব আমি অন্নময়াদিকোষের "দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা।" এই ব্যষ্টি অন্নময় কোষাদি আমি নই, ও আমার ইহা নহে, কারণ ইহারা "পঞ্চভূতের বিকার।"

চিৎপ্রতিবিম্বিত এই মনকেই অজ্ঞানী মানব আত্মা বলিয়া মনে করে, ইহাই জীবাভিমানের উৎপত্তি; ইহা তাহার অখিল দুর্গতির কারণ।

এই আত্মার প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন শক্তিতে কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞানী মানব শক্তিমান "মনকে আত্মা" বলিয়া গ্রহণ করে ও ভ্রান্তিসাগরে নিমজ্জিত হয়। বালক যেমন সলিলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে যথার্থ সূর্য্য মনে করে তেমন "চিৎপ্রতিবিম্বিত মনকেও অজ্ঞমানব, বিচারশীলতার অভাবে আত্মা বলিয়া মনে করে।" আত্মার মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত যে ছায়া উহা, কিন্তু আত্মা নহে। এই অযথার্থ অসত্য আত্ম-প্রতিবিম্বকে যথার্থ ও সত্য আত্মরূপে গ্রহণ করাতেই মানুষের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় ও তদ্ধেতু বৃথা অহঙ্কারের আবির্ভাব হয় ও মিথ্যা জীবাভিমান উৎপন্ন হয়। মিথ্যা পদার্থকে সত্য মনে করিয়া তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করিলেই মিথ্যা ফল লাভ হইবে। প্রতিবিম্বিত আত্মাকে যথার্থ আত্মা মনে করিলে মানব বালকবৎ বিচার হীন হইবেক ও মিথ্যা জীবাভিমানী বা মনোভিমানী হইয়া প্রবঞ্চিত হইবেক তাহা নিঃসন্দেহ। এই ভ্রান্তিচ্ছায়া মন হইতে মিথ্যা জীবাভিমানের উৎপত্তি হয় ইহা মানবের অখিল দুর্গতির কারণ। "জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধির একমাত্র কারণই এই "মনোভিমান।" "আত্মাভিমানী জরা-মৃত্যু-দুঃখ রহিত

হইয়া যান।" তিনি অজর ও অমর হন, যেহেতু আত্মধর্মী আত্মার লক্ষণাক্রান্ত হন। আত্মার ধর্ম্মই (স্বরূপই) হইল অজরত্ব, অমরত্ব। জন্ম-জরা-মরণাদি মনের ব্যাপার, মনোধর্ম্মীর সঙ্গী উহারা আত্মাকে অনুসরণ করিতে পারে না। এখানে অভিমান শব্দের অর্থ গর্ব্ব নহে। "আমি ইহা" এতাদৃশ বোধকেই অভিমান কহে। "আমি মন" এরূপ বোধ সম্পন্নকে "মনোভিমানী" এবং "আমি আত্মা" এরূপ জ্ঞানসম্পন্নকে "আত্মাভিমানী" কহে। জন্ম-মৃত্যু কাহার হয়? তাহার উত্তর শাস্ত্র দেন—এই মিথ্যা জীবাত্মার হয়। মিথ্যা জীবাত্মার মিথ্যা মনোরাজ্যে বা মায়ারাজ্যে মিথ্যা জন্ম-মৃত্যুর সংঘটন হয়। যেমন মিথ্যা বায়স্কোপের ভিতর বায়স্কোপে মিথ্যা বিদুর, মিথ্যা মোক্ষধর্ম্ম, মিথ্যা দর্শকগণের মিথ্যা মনকে, মিথ্যা মুগ্ধ করে, সেইরূপ "মিথ্যা জীবাত্মা', মিথ্যা জন্মগ্রহণপূর্ব্বক, মিথ্যা দেহ ধারণ করতঃ মিথ্যা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া, মিথ্যা জন্মান্তর গ্রহণ করে।" যখন মানবের এতাদৃশ মিথ্যা দর্শন, মিথ্যা জীবজ্ঞান ধরা পড়ে, তখন তাহার আর কিছুই দর্শনীয়, বা জ্ঞাতব্য থাকে না। এই দেহমধ্যে "এক আত্মেতর দ্বিতীয় সত্তা-নাস্তি" এই দৃঢ় প্রতীতি তাহাকে অচল, অটল করিয়া, অচল ও সনাতন আত্মস্বরূপে স্থিত করে, তাহার জন্মমৃত্যু পুনর্জন্মাদি প্রহসন সব অদৃশ্য হইয়া যায়। তিনি তখন আত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার জগত প্রহসন দেখিয়া আর আনন্দ হয় না। "ব্রহ্মেতর দ্বিতীয় সত্তা নাস্তি" এতাদৃশ জ্ঞান-লাভে, "জীবজগৎ মিথ্যা প্রহসন রূপে তৎসকাশে প্রতিভাত হয় মাত্র, মিথ্যা-জীব ভ্রমের অপগমে, তাঁহার মিথ্যা জন্ম-মৃত্যুর প্রহসন স্থগিত হইয়া যায়।"

স্বপ্নভঙ্গে স্বাপ্নিক ব্যাপার, স্বাপ্নিক দৃশ্য, স্বাপ্নিক মূর্ত্তাদি যেমন অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন বা উপলব্ধ হয়, এবং এই জীবন-স্বপ্ন ভঙ্গের পর যখন মানবের প্রকৃত জাগরণ হয় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে, তখন সে তাহার বর্ত্তমান জন্ম, কর্ম্ম, দেহ, সব অলীক বলিয়া বুঝিতে পারে। এক্ষণ বর্ত্তমান সময়ে সে যে সর্ব্বদা জীবনস্বপ্ন, জন্মস্বপ্ন, কর্ম্মস্বপ্ন, দেহস্বপ্ন ও জাগতিক দৃশ্য

স্বপ্নাদি দেখিতেছে তাহার মৃত্যুতে অর্থাৎ জাগরণে সম্যক্ অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। "জীবন একটা স্বপ্নাবস্থা ও মৃত্যু জাগরণাবস্থা" ইহা বুদ্ধির দ্বারা অনেকে বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু অনুভব দ্বারা উপলব্ধি করিতে অনেকেই অক্ষম। আত্মজ্ঞানী নিজেকে সর্ব্বদা আত্মস্বরূপ সিদ্ধান্ত বা সাব্যস্ত করিয়া এবং আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অচল, সনাতন ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত উপলব্ধি করতঃ নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন কারণ আত্মজ্ঞ নিঃসন্দেহরূপে জানিয়াছে যে নশ্বর দেহ হইতে অবিনশ্বর আত্মা সম্যক্ পৃথক্ ও নির্লিপ্ত। সাধকের সারা জীবনের সাধনার ফল, সারা জীবন আত্মতত্ত্ব আলোচনা ও আত্মজ্ঞানের ফল—হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অর্থাৎ "দৈহিক যন্ত্রণাকে নিজের যন্ত্রণা বলিয়া গ্রহণ না করা।"

এখন হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিতে হইলে "মনোতীত অবস্থায়" উপনীত হইতে হয়। মনোতীত সত্তায় নিমগ্ন হওয়ার জন্য আর্য্য মহর্ষিগণ প্রযত্ন করিয়াছিলেন যে, মনোতীত রাজ্যে না পৌঁছিতে পারিলে সত্যরাজ্য দর্শন এবং চিরবিশ্রান্তি লাভের উপায় নাই। ইহারা বিচার চক্ষে দেখিলেন যে, মানবের মনোরাজ্য হইতে বহিক্রমণের একটি স্বাভাবিক পথ আছে, এবং উহা মানব প্রত্যহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে—উহা "সুষুপ্তি" নামে অভিহিত হয়। এই সুষুপ্তি জীবের স্বাভাবিক এবং জাগরণে ও স্বপ্নে জীবকুল যে সর্ব্বদা মনের পীড়নে মহাবিধ্বস্ত হইতেছে তাহা হইতে কিয়ৎক্ষণ মুক্তিলাভ করতঃ পরমবিশ্রান্তি লাভ করে; ইহা জীবের বিনা প্রযত্নেই লাভ হয়। কিন্তু ইহা অধিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কতক্ষণ ইহার স্থায়িত্ব, তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না এবং পুনঃজাগরণেই বিশ্রান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া মন সয়তান রাজ্যে পুনঃআগমন করতঃ তৎকর্ত্তৃক অশেষ যন্ত্রণায় নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়।

এই সুষুপ্তিকে আদর্শ বা নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়াই মহর্ষিগণ সমাধি যোগের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণ প্রশ্ন হয় এই যে, মানবের

স্বাভাবিক সুষুপ্তি থাকিতে সমাধি যোগের জন্য মহাকষ্টসাধ্য অভ্যাস ও প্রযত্নের কি প্রয়োজন ছিল? সুষুপ্তি অল্পক্ষণ স্থায়ী, আর উহা মানবের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না। বিশেষ কিয়ৎক্ষণ পরে পুনঃ জাগরণে মনের দ্বারা বিধ্বস্ততা ও উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। তাই ঐ স্বাভাবিক সুষুপ্তিকে চিরস্থায়ী ও চিরভোগ্য করার জন্যই সমাধি যোগের আশ্রয় এবং তজ্জন্য প্রযত্ন ও প্রয়াসের প্রয়োজন হইয়াছে। সমাধিকে "সুদীর্ঘ-সুষুপ্তি" মুক্তিকে "চিরসুষুপ্তি" বলা যাইতে পারে।

এখন সুষুপ্তিতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সব লীন ও অবশ হয় কিন্তু প্রাণবায়ু বহিতে থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে পুনঃ কর্মে নিয়োজিত করিতেই ও জাগরিত অবস্থায় আনিতেই বিদ্যমান থাকে। ঐ সময় স্বয়ং অখণ্ড পরমাত্মা, যিনি চিরজাগরণশীল এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় হইতে সদা-বিযুক্ত, একমাত্র বিরাজমান থাকেন এবং প্রাণবায়ুরূপ দেহযন্ত্রের চালকসহ দৈহিকগঠন প্রণালী অক্ষুণ্ণ ও রক্ষা করিয়া থাকে।

সুষুপ্তিতে পরমাত্মা পরাশান্তির সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া জাগরণে স্মৃতিপ্রদান করেন। যেহেতু "সংস্কার সমষ্টি বা স্মৃতি-সমষ্টি যে মন" বা "অভিজ্ঞতা সমষ্টি" যে "বুদ্ধি" ইহারা জড়, ইহাদের অনুভব শক্তি নাই। ইহারা পরমাত্মার সান্নিধ্য ও আভাস বা প্রতিবিম্ব লাভ করতঃই চৈতন্যভাব ধারণ করিয়া অনুভব কর্তারূপে অজ্ঞজনের বিচারহীন চক্ষে বিরাজমান আছে। ঐ সুষুপ্ত্যাবস্থায় মন ও বুদ্ধি আত্মায় লয় হইয়া থাকে বলিয়া উহার অনুভব কর্তা এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ থাকে না। ঐ সময় পরমাত্মা সুষুপ্ত্যা-বস্থায় অনুভূত পরাশান্তির সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া পুনঃ জাগরণে মানব যে বেশ শান্তি ও সুনিদ্রা ভোগ করিয়াছে বলিয়া স্মৃতি লাভ করে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। পরমাত্মার এই সাক্ষ্য বলেই মানব জাগরণে সুষুপ্তিরূপ শান্তিভোগের স্মৃতি লাভ করে। মানবজীবনে এই অব্যক্তাবস্থায় চিরবিশ্রান্তি

লক্ষ্য হয় বলিয়াই জীবের দুঃখ লঘু হইতেছে। সুষুপ্তির আদর্শে এই "অব্যক্ত সত্তায় লীন হইতে সমাধিযোগ বা জ্ঞানযোগ সাধন করিতে হইবে।"

"জ্ঞানবলে মনের ভ্রান্ত্যস্তিত্ব ও ঐন্দ্রজালিকত্ব বুঝিতে পারিলেই" "মনোৎপন্ন সুখ দুঃখাদি তিরোহিত হয় এবং মনোনাশেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না।"

সাধকের সদাই স্মরণ রাখিতে হইবে—এই যে ইন্দ্রিয়জালবৎ জগৎ দেখা যাইতেছে "ইহা ভ্রান্তিময় মন কল্পিত", মনই উহার স্বীয় মিথ্যা কল্পনাবলে "স্রষ্টা" মনই উহার "দ্রষ্টা"। স্বপ্নাবস্থায় যেই মন স্বীয় মিথ্যা কল্পনাবলে অসংখ্য স্বাপ্নিক দৃশ্য ও মূর্ত্তি সৃষ্টি করে, সেই মনই উহার দ্রষ্টা, মনই উহাদের লইয়া আনন্দ উপভোগ করে, আবার কখন কখন ভীত, চকিত, ত্রাসিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। স্বাপ্নিক মনকল্পিত দৃশ্যরাশি যেমন ক্ষণিক স্থিতিশীল, এই ভ্রান্তি দৃষ্টিতে সত্যবৎ প্রতিভাত পরিদৃশ্যমান মিথ্যা নামরূপাত্মক জগৎ ও তদ্বাসিগণও তদ্রূপ ক্ষণিক স্থিতিশীল ও দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এখন সাধক সাধ্যতম বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য কর যে একটি মৃতদেহের সম্মুখে বিষয়রাশি থাকা সত্ত্বেও "কোন্ বস্তুর" অভাবে মৃতব্যক্তি বিষয় গুলিকে জানিতে পারে না; অন্তরে এমন প্রিয় কে আছেন, যিনি প্রতিনিয়ত নিশ্চিতরূপে জানাইয়া দিতেছেন—"এটি মূল, এটি ফল, এটি পুত্র, এটি স্ত্রী?" সাধকের অন্তরে যখন এইরূপ "সত্যজ্ঞানের" আভাস আসিতে থাকে, তখন এই "মনকে ও বিষয়গুলিকে যিনি জানিতেছেন" তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে, তখন তাহার লক্ষ্য অন্তরের আরও তলদেশের দিকে আপতিত হয়। ঐ "জানা" ভাবটির গর্ভে তলদেশে যাইতে ব্যগ্র হয়। সাধক তখন হৃদয়ের দিকে—হৃদয় পুণ্ডরীকের দিকে স্থির লক্ষ্য করিয়া "কে দেখিতেছে দেখি" এইরূপভাবে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে থাকে। ধ্যান যত স্থির হয় যত প্রগাঢ় হইয়া আসে, ততই

"কে জানিতেছে" এই ভাবটি ক্ষীণ হইয়া যায়, ও "জানা" বা "জ্ঞানস্বরূপে" নিজের অস্তিত্ব বোধ ফুটিয়া উঠিতে থাকে ; অর্থাৎ "জানা" মাত্রে সাধক তন্ময় হইয়া পড়ে। কিন্তু এই "জানা" বা "জ্ঞান" বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে, "ইহা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।"

এইখানে আসিলে সাধক বুঝিতে পারে যে "মনরূপে" যাহাকে এতদিন অনুভব করিয়া আসিতেছি, "সে মন ত সত্যবস্তু নহে।" কারণ এই "জানাটি" না থাকিলে ত মনের সঙ্কল্প শক্তিই থাকে না। বাস্তবিক "মন" বলিয়া ত কোন "বস্তুসত্তা নাই।" এই "জানার কল্পনাময় অবস্থাকেই" ত এতদিন "মন" বলিয়া পৃথক্ বস্তুরূপে অজ্ঞান বশতঃ মানিয়া আসিতেছিলাম।

এই অবস্থায় আসিলে সাধক তখন "ঠিক আত্মজ্ঞান ও আত্মবোধটী" কি তাহা উপলব্ধি করিতে ব্যগ্র হয়, তখন সেই জীব জগৎও স্বীয় দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সব তুচ্ছ হইয়া যায় এবং উহাদের প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না, উহাদের বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকে না শুধু "আমি" বা 'অহং' বোধটী থাকে, যাহাকে আত্মার সঙ্গে মাত্র একত্ব লাভ হেতু বিদ্যমান থাকে, তাহাই "আত্মজ্ঞান" জানিবে। "জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সহিত "অহং" প্রত্যয়যোগে যে একত্ব-লাভ", তাহাই "আত্মজ্ঞান"। ঠিক আত্মজ্ঞানের বোধক বা জ্ঞাতা আত্মেতর কেহ নাই ; যেহেতু আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা নাই—যে আত্মাকে জানিতে বা বোধ করিতে পারিবে। মানব যতক্ষণ আত্মাকে জানিতে চায় এবং যতক্ষণ তাহার আত্মেতর পৃথক্ সত্তার অধ্যাস বা মিথ্যা জ্ঞান থাকে ততক্ষণ তাহার আত্মজ্ঞান হয় না। "আমিই আত্মা, আমিই আবার তাঁহাকে জানিব কেমনে", "আমিত জানিয়াই রাখিয়াছি যে সে "আমি"। আর তাহাকে জানিবার চেষ্টা কেন করিব, জানা হইয়া গিয়াছে।" এই সব হইল আত্ম-জ্ঞানের কথা। অজ্ঞানী ব্যক্তির যেরূপ দেহে আত্মবুদ্ধি দৃঢ়রূপে লাগিয়া রহিয়াছে উহাতে যেমন তার সংশয় মাত্র নাই, সেইরূপ আত্মাতে যে জ্ঞানীর "আমিত্ব-বোধ সংশয় বিপর্যয় হীন হইয়া দৃঢ় হয়", উহাই তাহার আত্মজ্ঞান জানিবে।

জীবাস্তিত্বের যে "চৈতন্যাংশ", উহাই আত্মা এবং "জড়াংশ"—যেমন দেহেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—উহা অনাত্ম বা মিথ্যা। এই চৈতন্যাংশের বিচার ও দৃষ্টিই "জ্ঞানবিচার ও জ্ঞানদৃষ্টি" আর উহার জড়াংশের প্রতি যে বিচার ও দৃষ্টি—তাহাই "অজ্ঞানবিচার ও অজ্ঞানদৃষ্টি" জানিবে। স্বীয় দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সহিত 'তাদাত্ম্য' ভাবই বন্ধন এবং তাহাদের সহিত "তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিত করাই মোক্ষ" জানিবে। এক কথায়, জীব হইতে তাহার দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির "অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যা প্রত্যয়" বাদ দিলে, তাহার যাহা অবশিষ্ট থাকে. তাহাই আত্মা জানিবে। "অমনীভূত বা মনশূন্য" হইলে বা মনের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইলে তাহার যে অবস্থা ঘটে তাহাই তার "আত্মস্থিতি" জানিবে। বেদান্তে "নেতিনেতি" বিচারই হইল এই প্রকার তুমি দেহ নও, ইন্দ্রিয় নও, মন নও, বুদ্ধি নও, তারপর তুমি যাহা তাহাই আত্মা জানিবে। "আত্মবোধ" "যোগে হয় না বিয়োগে হয়", অর্থাৎ স্বীয় "জীবত্ব হইতে জড়াংশ বিয়োগ করিলে যাহা থাকে, তাহাই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।"

"উপ" সমীপে "আসীন" ইতি উপাসনা—নিকটে উপবিষ্ট হওয়াই উপাসনা শাব্দিক অর্থ। যে যত উপাস্যের সন্নিকটস্থিত সে তত উত্তম উপাসক। যে উপাস্যের সহিত "একত্ব" লাভ করিয়া, তাহার সহিত "এক হইয়া গিয়াছে", সেই উপাসকেরই উপাস্যের সহিত "চরম সান্নিকট্য" লাভ হইয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং অদ্বৈতজ্ঞানীর যে "অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে" আত্মপ্রত্যয়ে স্থিতি "আমিই ব্রহ্ম ঐরূপ প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি" ইহাই উত্তম উপাসনা, ইহাই উপাসনার চরম অবস্থা, ইহাই শাস্ত্রোক্ত "উত্তম ব্রহ্মসদ্ভাবং"—ব্রহ্মের সহিত যে সদ্ভাব অর্থাৎ "একীভূতাবস্থা" ইহাই উত্তম উপাসনা। "মনকে বিষয় চিন্তাশূন্য" করাই "ধ্যান", "ধ্যাতা মন ও বুদ্ধি" নিরাকার বিধায় ধ্যেয়ের আকার কল্পনা বৃথা। যে বুদ্ধির গৌরবে কত আস্ফালন করিতেছ, যে বুদ্ধির অস্তিত্বেই তোমার ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব ও গৌরব সেই মনও বুদ্ধির কি কোনরূপ "মূর্ত্তি" আছে? তোমার দেহ ত ধ্যান করে না,

ধ্যান করে "মন আর বুদ্ধি।" তুমি "ধ্যাতারূপে", "মন ও বুদ্ধিরূপে" নিজে নিরাকার হইয়া, ধ্যেয়ের আকার অনুসন্ধান কেন করিতেছ? ইহাতে লাভ কি? কল্পিত দৃশ্য বা মূর্ত্তি, আর স্বাপ্নিক দৃশ্য বা মূর্ত্তি দর্শন ত একই কথা।

অদ্বৈতজ্ঞানী কি পরাশান্তিতে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার উপাসনা প্রণালীটি কেমন সুন্দর ও শান্তিকর। তাঁহার উপাস্যও কেহ নাই উপাসকও কেহ নাই, "তিনি ব্রহ্ম সত্তায় স্থিত", "আমিই ব্রহ্ম" এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া সতত শান্তিতে স্থিত আছেন। "তাঁহার ব্রহ্মেতর দ্বিতীয় সত্তাজ্ঞান না থাকায় তিনি ব্রহ্মরূপে স্থিত আছেন তাঁহার ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভে ব্রহ্মের সহিত চরম সান্নিধ্য লাভ হেতু তাঁহার উপাসনার আর প্রয়োজন নাই।"

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি না আসা পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথাগুলি অসম্ভব মনে হয়। চিকিৎসকগণ শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলেই যেমন স্বীয় স্বীয় দেহস্থ রোগের উপশম করিতে সমর্থ হন না, পরন্তু তাঁহাদিগকে স্বয়ং ঔষধ সেবন করিতে হয়, তদ্রূপ বেদ, উপনিষদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং তাহাদের শব্দার্থ লইয়া সভাজয়ী হইতে পারিলেই ভবরোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অহং ব্রহ্মাস্মি রূপে আত্মপ্রত্যয়ে স্থিত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মস্বরূপতত্ত্বের অনুভূতি হইলেই ভবরোগ নিবারিত হইয়া পরম শান্তিলাভ হইয়া থাকে। "দ্রষ্টা হইতে দৃশ্য" 'বিলক্ষণ' অর্থাৎ "বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত" এই বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত বিচার করিলেই বুঝাযায়, দ্রষ্টা সত্য, দৃশ্য মিথ্যা, অথবা দৃশ্য সত্য দ্রষ্টা মিথ্যা ইহা তুমি তর্কের হিসাবে ধরিতে পার, কিন্তু তাহা হইতে পারে না যেহেতু দৃশ্যও দ্রষ্টা দুইই বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া দুইই সত্য কিম্বা দুইই মিথ্যা হইতে পারে না "উহাদের একটি সত্য, একটি মিথ্যা হইবেক।" দ্রষ্টারূপ তুমি নিজে মিথ্যা হইয়া দৃশ্যকে সত্য সাব্যস্ত করা বাতুলতা মাত্র, যেহেতু যে নিজে মিথ্যা, তাহার প্রমাণিত সত্য কখন সত্য হইতে পারে না। তুমি নিজে মিথ্যা

হইলে তোমার দৃশ্যাস্তিত্বের প্রমাণও মিথ্যা এবং সেই হেতু তুমিও তোমার দৃশ্য দুইই মিথ্যা হইয়া যায়। তাহা হইতে পারে না। কারণ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত দুই বস্তু মিথ্যা হইতে পারে না, একটি সত্য, একটি মিথ্যা হইবেক। "দৃশ্যমাত্রেই জড়, সুতরাং মিথ্যা।" "দ্রষ্টামাত্রেই চৈতন্যময়, কাজেই সত্য।" যেমন দ্রষ্টা সত্য, দৃশ্য মিথ্যা তেমন জ্ঞাতা সত্য জ্ঞেয় মিথ্যা, ধ্যাতা সত্য ধ্যেয় মিথ্যা। জ্ঞাতা তুমি "চিন্ময়রূপে সত্য" জ্ঞেয় তোমার বিগ্রহমূর্ত্তি জড়রূপে মিথ্যা। নিশ্চয় জানিও 'যাহা দ্রষ্টব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য জ্ঞাতব্য ও বোধব্য সকলেই মিথ্যা; আর যে দ্রষ্টা, মন্তা, ধ্যাতা, জ্ঞাতা ও বোদ্ধা সেই সত্য জানিবে।" অদ্বৈতবাদীর ধ্যাতা কেহ নাই, জ্ঞাতা কেহ নাই, দ্রষ্টা কেহ নাই, বোদ্ধা কেহ নাই, পক্ষান্তরে তাঁহার ধ্যেয় কেহ নাই, জ্ঞেয় কেহ নাই, দৃশ্য কিছু নাই, বোধ্য কিছু নাই, আবার আমার ধ্যাতব্য কিছু নাই, জ্ঞাতব্য কিছু নাই, দ্রষ্টব্য কিছু নাই; "আমিই ধ্যাতারূপে দ্রষ্টারূপে, বোদ্ধারূপে'—এককথায় "অহংরূপে" বিদ্যমান আছি; আমি আর মধ্যমপুরুষরূপে 'তোমাকে' বা প্রথমপুরুষ রূপে 'তাহাকে বা "অন্যান্যকে" দেখিতেছি না। যেহেতু "অহংপ্রত্যয়ে আত্মস্থিত" হইয়া অহমিতর তোমাকে, তাহাকে ও জগতকে "মিথ্যা জানিয়া" তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত আমি করিতেছি না। আমার জড় চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু উহারা শবের উন্মীলিত চক্ষুর মত; তোমার প্রতি, তাহার প্রতি ও জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছ, কিন্তু তাহা ঠিক নহে, উহারা সর্ব্বদা "আত্মা বা অহংকে লক্ষ্য করতঃ তোমা হইতে তাহা হইতে, ও জগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে।" "চক্ষু আর চক্ষুর দৃষ্টি এক নয়।" জগতের দিকে চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও উহার দৃষ্টি অন্তর্লক্ষ্যের দিকে রহিয়াছে।

মানবের জগৎজ্ঞানই ত মানবকে ভ্রান্তিব্যূহচক্রে ভ্রমণ করাইতেছে। যাঁহার জগৎজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাহাকে আর ঘুরাইবে কে? 'আমি ত আত্মস্থিত, ব্রহ্মস্থিত অর্থাৎ অহং স্থিত হইয়া স্বরূপ স্থিতিতে পরাশান্তি লাভ

করিতেছি।' দেহজ্ঞান বা জগৎ জ্ঞান আমার নাই। দেহব্যষ্টিরূপে ও জগৎ সমষ্টিরূপে 'তাঁহার অহংরূপের' আশ্রয় করিয়া থাকে। তিনি চিৎরূপ, তাঁহার 'ব্যষ্টি আভাসরূপ জীব' ও 'সমষ্টি আভাসরূপ জগৎ' তাঁহাকে পীড়িত করিতে পারে না। জীব চিদাভাস মাত্র, চিৎপ্রতিবিম্বস্বরূপ, 'জীবময়জগৎ' অর্থাৎ 'জীবসমষ্টিই জগৎ।' 'আমি চিৎস্বরূপ', 'আমার আভাস মাত্র জীব, 'আমার প্রতিবিম্ব বা ছায়াই হইল জীব' আমি অনন্তরূপে, অখণ্ডরূপে, মহা-চৈতন্যরূপে, সমষ্টিরূপে 'চিরবিদ্যমান রহিয়াছি।' আমার সমষ্টি আভাসরূপে সমষ্টি প্রতিবিম্বরূপে অর্থাৎ ছায়ারূপে অনন্তজগৎ 'চিরবিদ্যমান আছে এবং ব্যষ্টি আভাস, ব্যষ্টি প্রতিবিম্ব, অর্থাৎ ছায়ারূপে জীবগণ বিদ্যমান আছে। ইহা হইল "ব্রহ্মরূপ আমার" সহিত জগৎ ও তদ্ব্যষ্টি জীবের সম্বন্ধ। এখন দেখ 'কায়া কি ছায়া দ্বারা ভারাক্রান্ত বা প্রপীড়িত হয়? কথনও নয়। ব্রহ্ম অনন্ত, অনাদি বলিয়া তাহার প্রতিবিম্ব বা ছায়াস্বরূপ জগৎ ও অনাদি। আবার ব্যষ্টি জগৎরূপে 'জীবও অনাদি', যেহেতু 'জীবময় বা জীবসমষ্টিই জগৎ।' জীবাস্তিত্ব বিয়োগে জগদস্তিত্ব লুপ্ত হইবে। ব্রহ্মরূপে, সদ্রূপে আমি যেমন অনাদিকাল হইতে চিরবিদ্যমান আছি, আমারই ব্যষ্টি ছায়ারূপে, জীবরূপে, আনন্দরূপে অনাদিকাল জীব বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষ 'জীবগণ আমার ব্যষ্টিও নয়, আমার ছায়ারূপ জগতের ব্যষ্টি মাত্র।' সৎবস্তু কথনও অসৎবস্তু হইতে প্রপীড়িত হইতে পারে না। পাঠক বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া 'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা' উপলব্ধি কর—"দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ছিন্ন কর", তথন দেখিবে, জগৎ আর তোমার প্রতি ভার চাপাইবে না, "স্বয়ং ব্রহ্মরূপে, চিদ্রূপে, চৈতন্যরূপে, সদ্রূপ ও অহংরূপে উপবিষ্ট হও, পরাশান্তি লাভ হইবে।"

২৮শে মাঘ ১৩৫৭ সাল
২৯বি, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৪

গ্রন্থকার

ম: মঃ শ্রীলক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড় শিক্ষাগুরু জয়তি
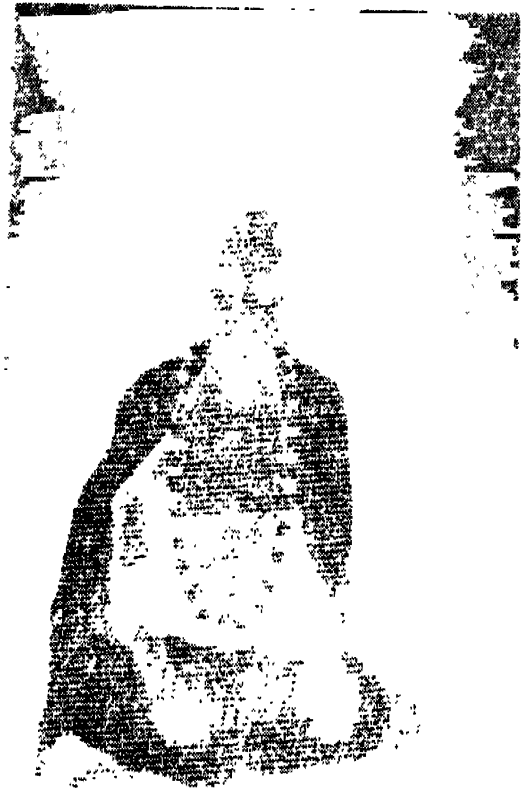
সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-বিরাজিত-পদাম্বুজঃ।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যো য তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

মঃ মঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ
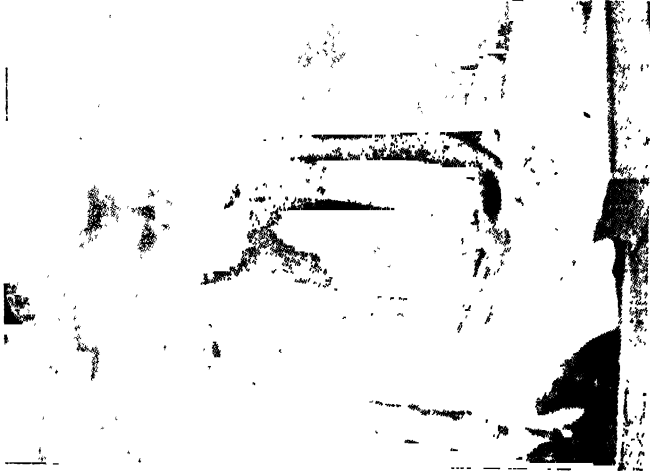
মোহ মদিরা মোহিত মত্ত জনে।
গুরুদেব পরাৎপর রক্ষ দীনে॥

মঃ মঃ শ্রীপার্ব্বতী চরণ তর্কতীর্থ

কর চক্ষুন্মীলিত জ্ঞান দানে।
গুরুদেব এই মিনতি শ্রীচরণে॥

অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ

প্রথম ভাগ

এ বিশ্ব ভাব সমষ্টি মাত্র

মনের ভাব প্রকাশ শব্দের দ্বারা হয়। সুতরাং গ্রন্থ বলিতে শব্দরাশির সমষ্টি লিপিকাকারে বা বর্ণাকারে আবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকারের মনের ভাব প্রকাশকেই বুঝায়। ভাবনার সূক্ষ্ম অবস্থাই ভাব। অব্যক্তের কুক্ষি হইতে অন্তরে প্রথম ভাবরূপে একটী বীজবৎ স্পন্দন অনুভূত হয়, সেই ভাবই ভাষায় ও রূপে পরিণত হয়। অন্তরে ভাব নাই অথচ বাক্য বলা ও রূপ দেখা ইহা হইতে পারে না। যখন ভাবরূপ কোন শক্তির আবির্ভাব হয় তখনই তাহাকে দেখিতে পাই—অনুভব করি। সেই ভাব হইতে বাক্য ও রূপ জন্মগ্রহণ করে। রূপ ভাবেরই মূর্ত্ত ছবি, ভাবই উহার সম্পদ, ভাবই উহার উপাদান। এই ভাবই—জীবন—প্রাণ—শক্তি—স্পন্দন। যেখানে ভাব নাই সেখানে কোন গতি ও স্পদন নাই। যখন ভাবের অভাব হয় তখনই কোন কার্য্য থাকে না। উহাকেই মৃত্যু বলা হয়। এই ভাবই শক্তি ও প্রাণ। এই ভাবই শ্রবণ, মনন, জিঘ্রণ প্রভৃতি শক্তি তরঙ্গে ও বাহিরে প্রতিরূপে ও উপাদানে, রূপ ভাবেরই জমাট চিত্র। এ বিশ্ব কতকগুলি ভাব সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ভাবসমূহ আবার বর্ণ

সমষ্টি মাত্র। বর্ণ বা শব্দ ব্যতীত কোন প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি হয় না। সুতরাং মনের ভাবই বাক্য দ্বারা ভাষারূপে এবং নেত্রের দ্বারা রূপ রূপে অভিব্যক্ত হয়। মৌনী হইয়া থাকিলেই ভাষার দ্বার নিরুদ্ধ হয় না। ভাবাতীত স্বরূপের সন্ধান না পাইলে যথার্থ মৌনী হওয়া যায় না। যদিও ভাষাই ভাবের শরীর, তথাপি ভাষা শূন্য ভাবও আছে; উহা আয়ত্ত হইলে জীব মুক্তির আস্বাদ পায়। যে চিন্তায়, যে স্মরণে, যে ধ্যানে কোনরূপ শব্দের সাহায্য নিতে হয় না, সেই স্বরূপে উপস্থিত হওয়াই জীবের চরম লক্ষ্য। যাঁহারা ভাবাতীত স্বরূপের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা শব্দশূন্য চিন্তা বা ধ্যানের কল্পনাও করিতে পারেন না।

তাহাদেরই এই ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি এবং এই ভাবকে উৎপাদন করিবার জন্য শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। এখন কোন কিছুর সংস্কার উৎপন্ন করিতে হইলে সেই সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। এবং সেই জ্ঞানের জন্য সেই বিষয়ের শ্রবণের প্রয়োজন। এই জন্য শাস্ত্রে সংস্কার উৎপাদনের জন্য প্রথম শ্রবণের প্রয়োজন বলিয়াছেন এবং সেই সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যাঁহার নিকট শ্রবণ করা যায় অর্থাৎ গুরু বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধার প্রয়োজন বলিয়াছেন কারণ সম্বন্ধীর জ্ঞান সংস্কার উদ্ভবের হেতু। তাহার পর সেই সংস্কারকে দৃঢ় করিবার জন্য মননরূপ বিচারের প্রয়োজন বলিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ সংস্কার যাহাতে উৎপন্ন না হয় তাহার জন্য শাস্ত্রে নিদিধ্যাসনের বিধান করিয়াছেন। শ্রবণের দ্বারা প্রমাণগত সংশয় নষ্ট হয় অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য অদ্বৈতবাদে কি দ্বৈতবাদে এই সংশয় নষ্ট হয়, মননের দ্বারা প্রমেয়গত সংশয় নষ্ট হয় অর্থাৎ জীবব্রহ্ম অভেদ কি

ভেদ এই সংশয় নষ্ট হয়, আর নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনা নষ্ট হয় অর্থাৎ আমি বলিতে দেহই আমি এইরূপ নিশ্চিৎ ভ্রম নষ্ট হয়।

এখন এই গ্রন্থের নাম অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ কারণ ইহার পাঠে অদ্বৈতানুভূতিরূপ ভাব প্রকটিত হইবে। গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্ত দর্শন, আত্মপুরাণ, অদ্বৈতসিদ্ধি, ত্রিপুরারহস্য ইত্যাদি অধ্যাত্ম গ্রন্থের সংস্কারোৎপন্ন ভাবকে সরল বঙ্গভাষায় তাহার সার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। গ্রন্থ প্রতিপাদিত বিষয় যথা সম্ভব স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া সেই উপলব্ধ বিষয়কে সরল ও মনোরঞ্জন রীতিতে ব্যক্ত করিবার প্রযত্ন করা হইয়াছে। এখন এই গ্রন্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য এই হয় যে—অদ্বৈতবাদে জীব মাত্রের প্রথম ও প্রধান সংশয় এই হয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল, এক ও অস্তিত্ব মাত্র রূপী। তাদৃশ অদ্বয় নির্ম্মল তাঁহাতে কিরূপে ও কোথা হইতে ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যার সমাগম হইতে পারে। তাহার উত্তর এই হয় যে—অবিদ্যা আছে একথা শাস্ত্র ও পণ্ডিতগণ অজ্ঞদিগের বোধ উৎপাদনার্থে কল্পনা করেন। নচেৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার দ্বৈত বর্জ্জিত। ব্রহ্ম বলিলেই তৎসঙ্গে বাচ্য বাচক ভাব প্রতীত হয় বটে, পরন্তু তাহাও উপদেশের জন্য বলিতে হয়, বস্তুতঃ ব্রহ্মে বাচ্য বাচক ক্রম নাই; সমস্তই ব্রহ্মের অনতিরিক্ত অবিদ্যাও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত। ঐ সকল নাম মাত্র, অবিদ্যাও নাম মাত্র, নাম ভ্রমকল্পিত ও অসৎ। যাহা নাই কোনও কালে যাহার সত্তা নাই, কিরূপে তাহা সত্য হইবে। বিচার দৃষ্টিতে অবিদ্যা আছে কৈ? ভ্রান্তির আবার থাকা কি? যাবৎ জীব অবুদ্ধ থাকে তাবৎ তাহার বোধ উৎপাদনার্থ তাদৃশ কল্পনা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন। বাক্য বিশারদ পণ্ডিতগণ অবুদ্ধ দিগকে

বুঝাইবার জন্য ইহার নাম অবিদ্যা, ইহার নাম জীব এইরূপ এইরূপ কাল্পনিক ক্রম (উপদেশ প্রণালী) অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাবৎ কাল মন অবোধ থাকে তাবৎকাল শাস্ত্র কল্পিত ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাবৎ কাল মন অবোধ থাকে তাবৎ কাল শাস্ত্র-কল্পিত ব্যবহার অবলম্বন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মনকে বুঝান যায় না। যুক্তির দ্বারা অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বিনিবৃত্ত হয়, তৎপরে জীব বোধ প্রাপ্তে পরমাত্মায় যোজিত হয়। অবুদ্ধ ব্যক্তিকে "সর্ব্বং ব্রহ্ম" বলিলে সে ব্যক্তি কিছুই বুঝিবে না। যুক্তির দ্বারা মূঢ়দিগকে বুঝান যায় আবার তত্ত্ব কথার দ্বারা প্রাজ্ঞদিগকে বুঝান যায়। যুক্তি কথা না বলিলে মূঢ়েরা বুঝে না, সেই জন্য তাহারা প্রাজ্ঞ হয় না। যখন তাহারা যুক্তির দ্বারা বোধিত হয় তখন তাহারা প্রাজ্ঞ হয়। তখন তাহারা তত্ত্ব কথা বলিলে বুঝিতে পারে। সেই জন্য এই অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশের প্রথম ভাগে অবুদ্ধ গণকে যুক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ করাইবার প্রয়াস করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ভাগে প্রবুদ্ধগণকে তত্ত্ব কথা বলা হইয়াছে। প্রথম ভাগে দার্শনিক পরিভাষা যথাসম্ভব বর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রবণ মননের জন্য শ্রুতি, স্মৃতি যুক্তি ও অনুভব প্রমাণ প্রপঞ্চিত করিয়া নিদিধ্যাসনের সংস্কার উৎপন্ন করিবার প্রয়াস করা যাইতেছে :—

প্রাচীন প্রথানুসারে প্রত্যেক প্রবন্ধে বিষয়াদি অনুবন্ধন থাকার আবশ্যক। অনুবন্ধন শব্দের অর্থ—হেতু বা কারণ; শাস্ত্রারম্ভের কারণ। বিষয় প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারী এই চারিটীর নাম "অনুবন্ধ।" "গ্রন্থে যে সকল পদার্থের বর্ণনা থাকে তাহা "বিষয়।" পাঠে যে ফল লাভ হয় তাহা "প্রয়োজন।" গ্রন্থের সহিত

বিষয়ের প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক "সম্বন্ধ", বিষয় প্রতিপাদ্য ও গ্রন্থ প্রতিপাদক। গ্রন্থপাঠে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় উক্ত প্রয়োজনকারীকে "অধিকারী" বলে।

এই গ্রন্থের অনুবন্ধন চতুষ্টয় ঃ—

অধিকারী—সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি।

বিষয়—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য রূপ প্রমেয়।

প্রয়োজন—জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপ, প্রমেয় গত অজ্ঞান নিবৃত্তি বা মোক্ষ অথবা স্বরূপানন্দাভিব্যক্তি।

সম্বন্ধ—বিষয় জ্ঞান ও গ্রন্থের মধ্যে সাধ্য সাধন ভাব।

যিনি সাধ্যকে সাধনের দ্বারা লাভ করেন—তিনি সাধক হন।

যাহা সাধক সাধনের দ্বারা লাভ করেন—তাহা সাধ্য হয়।

যাহার দ্বারা সাধক সাধ্যকে লাভ করেন—তাহা সাধন হয়।

মোক্ষরূপ সাধ্যের যিনি ইচ্ছা করেন তাঁহাকে অর্থাৎ মোক্ষেচ্ছুককে "সাধক" বলা হয়। এই মোক্ষেচ্ছুক সাধক একাগ্রতা-রূপ সাধনের দ্বারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হন। অতএব সাধক বলিতে আমরা সহজ ও সরল ভাষায় বুঝি যে, যিনি মুক্তির ইচ্ছা করেন অর্থাৎ মুমুক্ষুই সাধক হন। মুমুক্ষু অর্থাৎ যিনি মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাহার ইচ্ছার বিষয়—"সাধ্য"-মোক্ষ। মুমুক্ষু সাধক যাহার দ্বারা সাধ্য মোক্ষ সিদ্ধ করেন তাহা—"সাধন"—ইচ্ছা। অতএব মুমুক্ষু বা সাধক ইচ্ছারূপ সাধনের দ্বারা মোক্ষরূপ সাধ্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং মুমুক্ষুর মোক্ষ প্রাপ্তি ইচ্ছারূপ সাধনের দ্বারা হয়—ইহা প্রতিপন্ন হইল।

কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায় যে একাগ্রতাই মোক্ষ প্রাপ্তির মুখ্য সাধন। যথা ঃ—

চিত্তস্য সাধ্যৈকপরত্বমেব।
পুমর্থসিদ্ধের্নিয়মেন কারণম্।
নৈবান্যথা সিদ্ধতি সাধ্য মীষৎ।
মনঃ প্রসাদে বিফল প্রযত্নঃ ॥ ২২১ (সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার)

অর্থাৎ অন্তঃকরণ যদি জ্ঞেয় বস্তুতে একান্তভাবে একাগ্রতাপর হয়, তাহা হইলে সেই একাগ্রতাই মোক্ষরূপে পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে মোক্ষ সিদ্ধ হইতে পারেনা। চিত্তের প্রসাদ যদি অল্প হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে একাগ্রতা নিবন্ধন চিত্তের পরিপূর্ণ প্রসাদ না হয়, তাহা হইলে মোক্ষলাভ বিষয়ে প্রযত্ন নিষ্ফল হইয়া যায়। এখন একাগ্রতাই ইচ্ছা ইহা যদি প্রতিপন্ন করা যায় তো যুক্তি ও শাস্ত্র একার্থতা হইয়া যায়। এখন এই ইচ্ছা বলিতে আমরা এই বুঝি যে—আমরা যখন যে বিষয় কল্পনা করিয়া বুঝি যে ইহার দ্বারা সুখ মিলিবে, তখন সেই বস্তুকে পাইবার জন্য মনে যে ভাবনা উৎপন্ন হয়—উহাকেই ইচ্ছা বলে অর্থাৎ কাল্পনিক বস্তুতে সুখ আছে এবং সেই সুখের অভাব আমাতে আছে এইরূপ জ্ঞান হইলে সেই সুখকর বস্তুকে অর্জ্জন বা পাইবার জন্য এবং সেই সুখের অভাবকে অর্থাৎ দুঃখকে বর্জ্জন বা দূর করিবার জন্য মনের যে অবস্থা হয় তাহাই ইচ্ছা।

এই ইচ্ছা উৎপন্ন হইবার পর সেই ইপ্সিত বস্তুকে লাভ করিবার প্রযত্ন হয় এবং সেই প্রযত্নের পর সেই ইপ্সিত বস্তুকে পাইবার চেষ্টা হয়, তারপর সেই ইপ্সিত বস্তু পাওয়া রূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এখন

একাগ্রতার অর্থ—একই শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া একে যে মনোযোগ দেওয়া, অর্থাৎ অন্য সব পদার্থ হইতে মন সরাইয়া এক পদার্থে মনকে ধারণ করিবার যে প্রযত্ন তাহাকে একাগ্রতা বলে। প্রযত্ন ইচ্ছা ব্যতীত হয় না, প্রযত্ন ইচ্ছারই কার্য্য—ইচ্ছা প্রযত্নের কারণ। কারণের সত্তাই কার্য্যের সত্তা সুতরাং কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, অতএব একাগ্রতাই ইচ্ছা ইহা প্রতিপন্ন অল্প আয়াসেই হইয়া গেল। একই শ্রেষ্ঠ এই ইষ্ট সাধন জ্ঞান হইলে সেই একেকে পাইবার ইচ্ছা স্বতঃই হইবে। ইচ্ছা হইবার পর সেই শ্রেষ্ঠ একেকে পাইবার প্রযত্ন হয়—প্রযত্নের পর সেই একেকে পাইবার চেষ্টা হয় এবং চেষ্টা হইবার পর একেকে পাইবার ক্রিয়া অর্থাৎ সেই শ্রেষ্ঠ একাকারে মনের আকারিত হওয়াই ক্রিয়া হয়।

সুতরাং মুমুক্ষু সাধকের প্রথমে ইষ্ট সাধন জ্ঞানের জন্য সাধন চতুষ্টয়—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ঐহিক, পারলৌকিক ফলে বৈরাগ্য, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষতার—প্রয়োজন। নিত্য বস্তু ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য জ্ঞানই—নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক। বস্তু পদের অর্থ—ধর্ম্ম। আর তাহার ফলে এই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক পদের অর্থ হইল—যে সকল ধর্ম্ম নিত্য এবং অনিত্য ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে, সেই সকল ধর্ম্মের যে বিবেক অর্থাৎ পরস্পরের পার্থক্যের যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তাহা। নিত্য—যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই—যাহার কখনও অভাব হয় না—তাহা অর্থাৎ ভাব বা সত্ত্বের নিরপেক্ষ—স্বতঃই—সদাই প্রকাশ হওয়াই নিত্যত্ব। সুতরাং যে প্রকাশের অন্ত হয় না—তাহা অনন্ত—তাহাই ব্রহ্ম—অনন্ত বলিয়াই তাহা অখণ্ড—অবিনাশী সুখ স্বরূপ। ভূমাই সুখস্বরূপ অল্পে

সুখ নাই, আর অনিত্য বলিতে—যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে—যাহার কখনও অভাব হয় তাহা অর্থাৎ ভাব বা সত্ত্বের স্বতঃই সদাই প্রকাশ না হওয়াই—আপেক্ষিক প্রকাশই—অনিত্য তাহা সান্ত—তাহাই ব্রহ্ম ভিন্ন তাহা খণ্ড—বিনাশী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জন্য সুখ স্বরূপ। নিত্য ব্রহ্ম ও অনিত্য ব্রহ্ম ভিন্ন—"দেহেন্দ্রিয় বিষয়াদির" —যে ধর্ম্ম নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব; তাহার জ্ঞান দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মীর যথাক্রমে ব্রহ্ম—অখণ্ড সুখস্বরূপ এবং ব্রহ্ম ভিন্ন—খণ্ড সুখস্বরূপ বস্তুর সামন্যতঃ জ্ঞান লব্ধ হইল। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মভিন্ন রূপ ধর্ম্মীদ্বয়ের সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতস্বরূপের জ্ঞান হইল না। নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব রূপ ধর্ম্মপুরস্কারে তাহাদের ধর্ম্মীদ্বয়ের যে জ্ঞান তাহা তাহাদের স্বরূপের জ্ঞানের একদেশ মাত্র হয়। স্বরূপের জ্ঞান বলিলে তদগত যাবৎ বিশেষ জ্ঞানই বুঝায়। নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মপুরস্কারে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম ভিন্নের যে জ্ঞান, তাহা তাহাদের স্বরূপের জ্ঞান বলিলে তদগত যাবৎ বিশেষ জ্ঞানই বুঝায়। নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্বরূপ ধর্ম্মপুরস্কারে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মভিন্নের যে জ্ঞান, তাহা তাহাদের স্বরূপের জ্ঞান নহে, পরন্তু তাহা তাহাদের সামান্য রূপের জ্ঞান মাত্র, বিশেষ রূপের স্বরূপ জ্ঞান নহে। এই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক—অখণ্ড সুখীই প্রয়োজন, খণ্ড বা জন্য সুখ, যাহা দুঃখেরই নামান্তর তাহার অপ্রয়োজন এই ভাব উদিত হইলেই নিত্য বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা অনিত্য বলিয়াই সাংসারিক ও স্বর্গলোকের মিথ্যা খণ্ড সুখের প্রতি স্বতঃই বৈরাগ্য – অনভিপ্রেতত্ব—অনাস্থা—চাহিনা বা না চাওয়াই প্রকটিত হয়। বৈরাগ্য শব্দের অর্থ—ভোগেচ্ছা বর্জ্জনরূপ উপেক্ষা বুদ্ধি অর্থাৎ যাবৎ বিষয়ের অনাদর রূপ উপেক্ষা বুদ্ধি। বৈরাগ্য আসিলে শমাদি

সাধন সম্পদ জন্মিয়া থাকে। শম শব্দের অর্থ—মন বিজয় বা বশীকার। প্রথমে নিত্যানিত্য বস্তু জ্ঞান, তাহারই অভ্যাস হইতে লব্ধ যে উক্ত বৈরাগ্য সেই বৈরাগ্য দৃঢ় হইয়া যখন মনের আসক্তিরূপ কষায় মদিরার মত্ততাকে বিনষ্ট করিয়া দেয় তখন বিশৃঙ্খল ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে ইন্দ্রিয়-গণকে প্রবর্ত্তিত করিয়া পাপ পুণ্যের জন্য নানারূপ প্রবৃত্তির সৃষ্টি বন্ধ হয় অর্থাৎ যে লোক জগতের সুখকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছে, জগতের সুখের জন্য যত চেষ্টা সবই দুঃখদায়ক বলিয়া বুঝিয়াছে সে ব্যক্তি যে চেষ্টাশূন্য ও ভোগ পরাঙ্মুখ হইবে, ইহাতো—স্বাভাবিক। চেষ্টা শূন্যতা ও ভোগত্যাগই শমদমাদির অর্থ। শম সাধনের দ্বারা মন বিজিত হইলে মনটি তত্ত্ব বিষয়ে বিনিযুক্ত হইবার যোগ্য হয় এই যোগ্যতাই দমপদবাচ্য অর্থাৎ মনের ইন্দ্রিয়াভিমুখতা বন্ধ হইলে মনের বিষয় আকারিত না হওয়ারূপ দম স্বয়ং উপস্থিত হয়। দম অর্থাৎ মনের বিষয়ানাকারিত হওয়ায় বিষয়োপরম—বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্তি এবং তৎফলে—বিষয় তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা—দুঃখ মাত্রেই দেহধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম নহে। এইরূপ বুঝিয়া চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়া অপ্রতিকার পূর্ব্বক তাহা সহ্য করার অভ্যাস—তৎফলে তত্ত্ব শ্রদ্ধা তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তৎপরে সমাধান—আত্মসংস্থত্ব বা অমনীভাব অর্থাৎ অনাত্মা দেহাদি হইতে মন সরাইয়া আত্মায় মন দেওয়া—একাগ্রতা প্রকটিত হয়।

এখন এই শমদমাদি সাধন সম্পন্ন পুরুষের সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা জন্মে এই ইচ্ছার নামই মুমুক্ষত্ব। এই মুমুক্ষত্ব জন্মিলে মানব তখন কি করিয়া মুক্ত হওয়া যায় এই আকাঙ্ক্ষায় গুরুরূপ মুক্ত পুরুষের অন্বেষণ করিয়া সদ্‌গুরু নির্বাচন করিয়া তাঁহার নিকট

শ্রবণ করে যে, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব যে জীবরূপ ব্রহ্ম সেই জীবরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে, মোক্ষের কারণ এইরূপ জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই হয়, তখন তাহার ব্রহ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মিয়া থাকে সুতরাং এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পূর্বে অথবা পরেও হইতে পারে। অতএব এই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্রার্থ ভোগ বিরাগ শমদমাদি সাধন সম্পদ এবং মুমুক্ষত্ব ইহাদের অনন্তরই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয় অর্থাৎ ইহারা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মকে জানিবার সামর্থ্য হয় অর্থাৎ সে তখন ব্রহ্মকে প্রমাণ সাহায্যে জানিয়াও থাকে। যাহার মোক্ষের প্রতি প্রবল ইচ্ছা হয়, সেই ব্যক্তিই মোক্ষের অধিকারী। যাহার মোক্ষের ইচ্ছা নাই তাহার মোক্ষ হওয়া সঙ্গত নহে ; কারণ সে ব্যক্তি মোক্ষের জন্য তাহা হইলে চেষ্টা করিবে কেন ? অতএব মোক্ষাভিলাষীই মোক্ষের প্রধান অধিকারী হইবে ; এই মোক্ষাভিলাষীকেই মুমুক্ষু বলা হয়। অতএব মুমুক্ষাই মোক্ষের প্রধান ও অব্যবহিত পূর্ব সাধন হওয়া উচিত। আর মোক্ষই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা ও মুমুক্ষা অভিন্ন হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার চরম সাধন মুমুক্ষত্বই হইতেছে। বৈরাগ্যের পর যেমন দুঃখত্যাগের ইচ্ছা হয় তদ্রূপ নিত্য বস্তুর প্রাপ্তিরও ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া ইহামুত্র ফল ভোগ বিরাগের পর শমাদি সাধন এবং তৎপরে মুমুক্ষত্বই হওয়া উচিত। এখন যদি বল যে—মুমুক্ষা শব্দের অর্থ মোক্ষের ইচ্ছা কি করিয়া মুক্তির সাধন হইতে পারে কারণ শ্রুতিতেই আছে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥" (বৃঃ উঃ ৪।৪ ৭)

—অর্থাৎ কামনা না যাইলে অমৃত তত্ত্ব লাভ ঘটেনা, অতএব মুমুক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন নহে ইত্যাদি। ইহা কিন্তু ঠিক নহে, কারণ, অন্যত্র (বৃঃ উঃ ৪।৪।৬) শ্রুতি আছে—

"অথ অকায়মানঃ যঃ অকামঃ নিষ্কামঃ
আপ্তকামঃ আত্মকামঃ ইত্যাদি"।

অর্থাৎ যে আপ্তকাম আত্মকাম সেই ব্যক্তি অকাম অর্থাৎ নিষ্কাম হয়। সুতরাং মোক্ষরূপ আত্মার জন্য যে কামনা, তাহা কামনাই নহে, অনাত্ম বস্তুর জন্য যে কামনা তাহাই প্রকৃত কামনা পদবাচ্য। অতএব মুমুক্ষাকে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বলিলে শ্রুতি বিরুদ্ধ কোন দোষ হয়না ইত্যাদি।

মুক্তির ইচ্ছা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন ইহা যুক্তির দ্বারাও প্রমাণ করা যায়, সেই যুক্তি এই :—অভাব বোধ না হইলে ইচ্ছা হয় না এখন এই অভাব বোধ বলিতে সাধারণতঃ, অর্থের, স্বাস্থ্যের এবং মানের ইত্যাদি নানা বস্তুর অভাবই বুঝায়, কিন্তু ইহার প্রতি গভীর অভিনিবেশ করিলে "সর্ব্ব অভাবই" সুখেরই অভাব ইহা প্রতিপন্ন না হইয়া থাকিতে পারেনা কারণ সুখী হইতে সকলেই চায়—সুখই পুরুষার্থ এবং সেই সুখ—ক্ষণিক—অনিত্য হইলে পুনরায় সুখের অভাব বোধ হওয়ায় পুনরায় ইচ্ছা উদিত হইবে। এই ইচ্ছার উদয় রাহিত্য করিতে হইলে এমন সুখ পাওয়ার প্রয়োজন যে, যে সুখের কখনও নাশ হয়না অর্থাৎ নিত্য অবিনাশী স্থায়ী সুখই প্রয়োজন। সেই নিত্য, অখণ্ড, অবিনাশী স্থায়ী সুখ—যাহা মোক্ষেরই নামান্তর—তাহা ব্রহ্মরূপ আত্মজ্ঞান লভ্য এবং সেই মোক্ষ আত্মারই স্বরূপ। সুতরাং

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য—মোক্ষের জন্য—ইচ্ছা করিলে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ—মুক্তিই হয় তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। আর অনাত্ম ক্ষণিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখ পাইবার ইচ্ছা করিলে অনাত্ম পদার্থ নিত্য নহে বলিয়া—অনিত্য বলিয়া—সেই ক্ষণিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখের অপ্রাপ্তিতে পুনঃপুনঃ ইচ্ছার উদয় হইবে এবং তাহা হইলে ইচ্ছার উদয় রাহিত্য না হওয়ার জন্য অসীম দুঃখসাগরে নিমজ্জন হইতে হইবে। অতএব অনাত্মার প্রতি ইচ্ছা দুঃখের মূল এবং আত্মার প্রতি ইচ্ছা সুখের (মুক্তির) হেতু ইহা সিদ্ধ হইল। আত্মজ্ঞান বিহীন লৌকিক সাধারণ ব্যক্তি অনাত্ম পদার্থের অর্থাৎ অনিত্য সুখের ইচ্ছা করিয়া ঘটিযন্ত্রের ন্যায় পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর প্রবাহে পতিত হইতেছে। এই জন্ম মৃত্যু প্রবাহ হইতে কেহই স্বয়ং মুক্ত হইতে পারেনা। যেমন ঘূর্ণিতে পতিত প্রাণী নিজ চেষ্টায় ঘূর্ণিপাক হইতে বাহির হইতে পারেনা কিন্তু কোন দয়ালু ব্যক্তি সেই ঘূর্ণিপাক হইতে সেই প্রাণীকে স্থলে তুলিয়া দেন সেইরূপ এই জন্মমৃত্যুরূপ ঘূর্ণিপাক হইতে ত্রাণকর্ত্তা একমাত্র শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুই হন। শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত নিজ শত চেষ্টায়ও ঘূর্ণিতে পতিত প্রাণীর ন্যায় কখনই নিজেকে জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ হইতে ত্রাণ করিতে পারেনা। ঘূর্ণিতে পতিত প্রাণী যেরূপ নিজেকে, অপর প্রাণীকে উদ্ধার করিতে পারেনা সেইরূপ এই জন্ম মৃত্যু সংসার সাগরে নিমজ্জিত ব্যক্তি নিজেকে বা অন্য নিমজ্জিত ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে পারেনা—এইজন্য যিনি স্বয়ংমুক্ত এইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুই একমাত্র সেই বদ্ধ জীবকে জন্ম মৃত্যু হইতে ত্রাণ করিতে পারেন। এইজন্য বেদে উক্ত হইয়াছে "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", "তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাধীগচ্ছেৎ"। আচার্য্য হইতে

লোক জ্ঞানলাভ করে। পরমতত্ত্ব জানিবার জন্য গুরুর আশ্রয় লইবে। গীতা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন্ পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(৪ অঃ ৩৪ শ্লোক)

অর্থাৎ প্রণিপাত, প্রশ্নের পর প্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা তুমি সেই জ্ঞান লাভ কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন। আচার্য্যদেব সর্ব্ববেদান্ত, সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহে বলিয়াছেন—

উক্ত সাধন সম্পন্নোজিজ্ঞাসুর্যতিরাত্মনঃ।
জিজ্ঞাসায়ৈঃ গুরুং গচ্ছেৎ সমিৎপাণির্যোজ্জ্বলঃ॥

(২৫৩ শ্লোক)

অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল শমদমাদি সাধন উক্ত হইয়াছে—তাহা আয়ত্ত হইবার পরে আত্ম তত্ত্ব কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য যাহার অভিলাষ হইয়াছে সেই যতি উপহারার্থ অন্ততঃ কিছু কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বিনয়ের দ্বারা সমুদ্ভাসিত শরীর হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে। অন্য স্থানে আছে—"ঈশ্বরো গুরুরূপেণ গূঢ়শ্চরতিভূতলে"। অর্থাৎ ঈশ্বর গুরুরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

শ্রীগুরু ব্যতীত মুক্ত হওয়া যায়না তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ বহু পাওয়া যায় শ্রুতি, স্মৃতি, আচার্য্য বাক্য হইতে দেখান হইয়াছে ; এখন এ সম্বন্ধে যুক্তি আমাদের কি সাহায্য করিতে পারে তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে :—

এ সংসারে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে জীব মাত্রকে কাহারও না কাহারও নিকট সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় এবং তাহাদের নিকট হইতেই যত শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইহাতে কাহারও সংশয় থাকিতে পারেনা। শৈশবে মাতা পিতা—কৈশোরে পাঠশালার গুরুমহাশয় কুমার হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত টোলের বা আধুনিক স্কুল ও কলেজের মাষ্টার মহাশয়ের বা অধ্যাপকের নিকট হইতে অপরাবিদ্যা শিখিতে হয়। শৈশব হইতে প্রৌঢ় অবস্থা পর্য্যন্ত কাহারও না কাহারও নিকট জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য কাহারও শরণাপন্ন হইতে হয় অর্থাৎ কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অতএব দেখা গেল যে সাংসারিক সর্ব্ব অবস্থায় প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য কাহারও না কাহারও কাছে শিষ্য হইতে হয় ইহা অস্বীকার করা যায় না। এখন এই দৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানের জন্য যখন কাহারও অর্থাৎ শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই তখন অদৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মনের অগোচর পদার্থের জন্য বা পরাবিদ্যার জন্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে কি কাহারও অল্পও সন্দেহ থাকিতে পারে? ইহা নিঃসন্দেহ। আর লৌকিক জ্ঞানের স্বরূপ অনুসন্ধান করিলে এই বিষয়ের দৃঢ়তা হয় লৌকিক জ্ঞান বলিতে আমরা এই বুঝি যে সেই জ্ঞান কোন বস্তু সাদৃশ্য বা সমান কিংবা কোন বস্তুর বিষাদৃশ্য বা অসমান। এখ এই সমান বা অসমান জ্ঞানের জন্য পূর্ব্বে সেই বস্তুর পরিচয়ের জ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু সেই পরিচয় বা জ্ঞান স্বতঃ হয়না তাহা কাহারও নিকট হইতে শিখিতে হয় সুতরাং জ্ঞানমাত্রেই শিক্ষণী অতএব তাহা শ্রীগুরুর কৃপা ভিন্ন হইতে পারেনা। যেমন ঘটের জ্ঞা

বলিতে আমরা এই বুঝি যে এই ঘট অন্য ঘটের সমান এবং পটাদির অসমান। এখন এই ঘটের জ্ঞান বা পরিচয় পূর্ব্বে না থাকিলে ঘট ঘটের সমান এই জ্ঞান হইতে পারেনা।

সুতরাং সেই ঘটজ্ঞান পূর্ব্বেই কাহারও নিকট শিখিতে হয়—স্বতঃই হয় না। আর পটাদির অসমান এই জ্ঞানের জন্য পটাদি জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই পটাদির জ্ঞানও পূর্ব্বে কাহারও নিকট শিখিতে হয়—স্বতঃই হয় না। সুতরাং যেমন সমান অসমান জ্ঞানের জন্য পূর্ব্বে সেই বস্তুর পরিচয়ের বা জ্ঞানের প্রয়োজন এবং তাহা কাহারও নিকট শিখিতেই হয়—স্বতঃই হয় না। সেইরূপ জাগতিক সর্ব্ববস্তুর জ্ঞানের জন্য কাহারও না কাহার শরণাপন্ন হইতে হয় এবং যাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয় তিনিই শ্রীগুরু হন। সুতরাং গুরুভিন্ন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না তাহা যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইল। জাগতিক সর্ব্বজ্ঞানের জন্য যখন গুরুর একান্ত আবশ্যক তখন অলৌকিক এই আত্মজ্ঞানের জন্য শ্রীগুরুর একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু শিষ্যকে আত্মার বা আমির পরিচয় না করিয়া দিলে শিষ্য নিজ সামর্থ্যে কখনই আত্মা বা আমিকে জানিতে পারিবে না। শ্রীগুরু আত্মা বা আমির পরিচয় করিয়া দিলেই শিষ্য আত্মা বা আমিকে জানিতে পারিবে। লৌকিক জ্ঞান সাদৃশ্য বিষাদৃশ্য মূলক কিন্তু আত্মার সাদৃশ্য বা সমান অন্য আত্মা না থাকায় এবং আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থ মিথ্যা হওয়ায় আত্মার পরিচয় পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ তাহা একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপালভ্য এবং সেই আত্মা বা আমিকে জানিয়া শিষ্য সদা সর্ব্ব দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া নিজস্বরূপ যে পরমানন্দরূপ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত পরমানন্দরূপ নির্ব্বিকল্প স্বরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা স্বভাবতঃই হইবে, এই শ্রদ্ধা না হইলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও গুরু হইলে কোন ফলই হইবে না। অর্থাৎ সব নিষ্ফল হইবে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

এখন শ্রদ্ধা না হইলে যে মোক্ষ ফল পাওয়া যায় না তাহার যুক্তি এই :—এখন এই শ্রদ্ধা গুরু বেদান্তের বিশ্বাসকে বলা হয়। বিশ্বাস-হীন, সব রকমে হীন ও দীন হয়। বিশ্বাস সারা সংসারের আধার এবং উহা সকলের জীবন। অতএব বিশ্বাস না হইলে লোক ব্যবহারও বন্ধ হয়। বিশ্বাস না হইলে নিঃশ্বাসও গ্রহণ হয় না। মুক্তি লাভেচ্ছুক গণের আপ্তবাক্যে দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মিলে নির্ম্মল বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়। সমস্ত শাস্ত্রোপদেশ ইহার জন্য। সেই বিশ্বাস বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হইতে হয়। কারণ অন্তঃকরণের মন নামক বৃত্তি যে পরিমাণে "সংশয়" উত্থাপন করে অন্তঃকরণের বুদ্ধি বৃত্তি সেই পরিমাণে "নিশ্চয়" করিতে পারিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নির্দ্ধারিত হয়। সংশয় বহুল অন্তঃকরণ বিনাশের কারণ—

"সংশয় আত্মা বিনশ্যতি।" (গীতা)

আবার "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।" (গীতা)

অর্থাৎ অন্তঃকরণ শ্রদ্ধালু হইলে সংশয় উঠেনা। সেই হেতু অবিঘ্নে আত্মলাভ হয়। সুতরাং মননের পরিশ্রম করিতে হয় না, কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা, উপমা ও রূপকের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বুঝান যায়। জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই এই জন্মে উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধারূপে প্রাদুর্ভূত হয়। যখন মনুষ্য সকল ভোগের প্রতি রুচিহীন হইয়া চিত্তের সংসার বৈরাগ্য অনুভব করে তখনই বুঝিবে যে সেই

মনুষ্য "স্বানুকম্প" হইয়াছে অর্থাৎ আত্মকৃপা লাভ করিয়াছে। পরমেশ্বর তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহার সদ্‌গুরু জুটাইয়া দেন। সদ্‌গুরু তাহার প্রতি প্রীত হইলে, বেদও তাহাকে কৃপা করিয়া সত্য দৃষ্টি সম্যক্‌দর্শনের শক্তি প্রদান করেন। এইরূপে আত্ম-কৃপা হইতে ঈশ্বর-কৃপা লাভ, ঈশ্বর-কৃপা হইতেই সদ্‌গুরু-কৃপা লাভ এবং সদ্‌গুরুর কৃপা হইতে বেদ-কৃপা লাভ হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে বেদান্ত শাস্ত্রেও 'অধিকারী' হওয়া যায় না। জন্মান্তরীণ সুকৃতি ও গুরুকৃপা ব্যতীত শ্রদ্ধাদেবী অবতীর্ণ হন না। আবার সেই সুকৃতি ও গুরুকৃপার অবতারণার জন্য আত্মকৃপার প্রয়োজন। অর্থাৎ গুরুদেবে মনুষ্যত্ব বুদ্ধি না রাখা, তিনি "নিষ্কলঙ্ক আত্মস্বরূপ" আরাধ্য দেবতা। "গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন", এইরূপ বোধের অর্জ্জনে আত্মকৃপায় একবার শ্রদ্ধা জন্মিলে আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না। সমুদয় প্রতিবন্ধক অপসারিত হইয়া যায়। মন একবার ছিন্ন সংশয় হইলে ভাগীরথী প্রবাহের ন্যায় আপন গন্তব্য অভীষ্ট সচ্চিদানন্দসাগরে পৌঁছাইবেই পৌঁছাইবে। ইহাই বেদের নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্ত।

শ্রীগুরু পূর্ব্বোক্ত সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন শ্রদ্ধাবান শিষ্যকে নিম্নলিখিত রূপে আত্মজ্ঞানের আনুভাবিক উপদেশ দেন:—এখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু "ইন্দ্রিয়গোচর" হয় বা "কল্পনাগোচর" হয় সেই সবই "বস্তু" হয়। কারণ ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "বস্তুর অর্থ ধর্ম্ম"— "বসতি যৎতদ বস্তু" এইরূপ বস্তুপদের বুৎপত্তির দ্বারা ইহার অর্থ ধর্ম্মই হয়। কারণ ধর্ম্ম, ধর্ম্মীর উপর বাস করিয়া অর্থাৎ ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বস্তুপদের অর্থ হয় ধর্ম্ম তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু বহিঃইন্দ্রের দ্বারা এবং অন্তঃইন্দ্রের দ্বারা

অনুভব করি সে সকলই "বস্তু বা ধর্ম্ম"। এখন বস্তু বা ধর্ম্ম বলিতে আমরা কাহাকে বুঝি তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক—মাটীর ঘটের—"ঘট" এই নাম এবং তাহার "আকার" এই রূপ, এই "নামরূপ" মাটীকে আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ "ঘট" এই নাম ও তাহার "আকার" এই রূপ এই উভয়েই মাটীর সত্তায় ও মাটীর প্রকাশে "সত্তবান ও প্রকাশমান" সুতরাং মাটীর ঘট হইতে মাটীকে যদি সরাইয়া লওয়া যায় ত "ঘট" এই নাম ও "ঘটের আকার"—এই রূপ কিছুই থাকে না অর্থাৎ ঘটের "অস্তিত্ব ও প্রকাশ" তিরোহিত হয়। এখানে এই "নামরূপই হইতেছে ধর্ম্ম" কারণ নামরূপ মাটীরই—মাটীতেই থাকে। আর "মাটী" হইতেছে "ধর্ম্মী"। সুতরাং ধর্ম্মীরূপ মাটীরই "অস্তিত্ব প্রকাশের" দ্বারা ধর্ম্মরূপ মাটীর ঘটের "অস্তিত্ব প্রকাশ," সেই-রূপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের "নাম রূপ" ধর্ম্মের ধর্ম্মী সেই হইবেন যাঁহার "সত্ত ও প্রকাশের দ্বারা" এই বিশ্বের "নাম রূপের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়।" যেহেতু ধর্ম্মীর সত্তা ও প্রকাশের জন্য ধর্ম্ম নামরূপের সত্ত ও প্রকাশ সেইহেতু ধর্ম্মীই—সৎ এবং প্রকাশ বা চিৎ এবং ধর্ম্ম "ধর্ম্মীর দ্বারা সত্তবান ও প্রকাশমান" হয় বলিয়া ধর্ম্মের "নিজ সত্তা নাই" অর্থাৎ অসৎ বা অসত্য, ধর্ম্মের "প্রকাশ নাই" বলিয়া ধর্ম্ম—অপ্রকাশ। যাহা অপ্রকাশ অর্থাৎ "যাহা নিজেকে ও অপরকে প্রকাশিত করিতে পারে না" তাহাই জড়। আর "যে নিজেকে ও অপরকে প্রকাশ করে" সেই **চৈতন্য—চিৎ—প্রকাশস্বরূপ**। এখন আমরা বিশ্বে অস্তিত্ব প্রকাশ রূপ—**সৎ চিৎরূপ ধর্ম্মী** ও **অসত্ত বা অপ্রকাশ বা জড়রূপ ধর্ম্ম**—এই দ্বিবিধ পদার্থ পাইলাম। এখন এই ধর্ম্মীকে "কেবলভাবে" অর্থাৎ "ধর্ম্ম বিমুক্তভাবে" জানাই মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য—সাধ্য। ধর্ম্মকে সরান

দুই প্রকারে করা যাইতে পারে— এক "লয় মুখে"—চিন্তাহীন হইলে ধর্ম্মত্যাগ হয় দ্বিতীয়ঃ ধর্ম্মগুলির "মিথ্যাত্ব নিশ্চয় বা বাধ" হইলে ধর্ম্মের প্রতি "অনাসক্তিই"—ধর্ম্মগুলির ত্যাগ হয়। সারাংশ এই যে মনের ক্রিয়া দুইরূপ—অন্তঃবৃত্তি ও বহিঃবৃত্তি। অন্তঃবৃত্তি—"অহমাকার বৃত্তি" ও বহিঃবৃত্তি—"ইদমাকার বা এই এই প্রকার বৃত্তি।" মন দ্বারা "এই" এর সামান্য জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষ আকারের জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা ধর্ম্মের বা নামরূপের উপস্থিতিই বা বৃত্তিই "চিন্তা"—এই "চিন্তা ত্যাগই" ধর্ম্মরূপ বস্তুর—"নাম ও রূপের লয়ই"—নামরূপের "উপস্থিতির নিবারণই"—"ধর্ম্মীর কেবলীভাব।"

এই "চিন্তা ত্যাগ"—"নিশ্চিন্ত ভাব"—"যোগের" দ্বারা হয়। যোগী এই নিশ্চিন্তভাব লাভ করিবার জন্য চিত্তকে শমদম সাধনার দ্বারা শান্ত করিয়া—ধর্ম্মীর কেবলী ভাব রূপ "লক্ষ্যে চিত্তকে লক্ষিত" বা "ধারণা" করিয়া সেই "ধারণাকে সমভাবে ধারণ করিয়া"—"ধ্যান" করিয়া এবং সেই "ধ্যান অবিচ্ছিন্ন" ভাবে প্রবাহিত হওয়াই—"একাগ্রতা বা সমাধি" —"চিন্তাহীন বা নিশ্চিন্তভাব"। চিন্তাগুলি স্বতঃই আগমপায়ী অর্থাৎ আসে ও যায়—দৃষ্টনষ্ট স্বভাব—ক্ষণস্থায়ী—অনিত্য কিন্তু চিন্তার ধারা বা প্রবাহ—ক্ষণস্থায়ী নহে কিন্তু—জাগ্রত ও স্বপ্নকালস্থায়ী—জাগ্রত স্বপ্নকালেই চিন্তা থাকে—সুষুপ্তি কালে সাধন বিনাই সর্ব্ব প্রাণীর ও সর্ব্বজীবের চিন্তা অনায়াসে অক্লেশে ও স্বতঃই বিদূরিত হয়। এখন এই জাগ্রতকালে চিন্তার প্রবাহ নাশ করাই অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি নিবৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিবৃত্তি হয় সুতরাং "ইন্দ্রিয় ও চিত্তের বৃত্তি" নিবৃত্তি করাই "যোগ" অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন "অজ্ঞানবৃত্তির" অবস্থার মত চিত্তের অবস্থা করাকেই—"চিন্তাহীন"—"বৃত্তিহীন" অবস্থাই "যোগ"। অর্থাৎ

"সৃষ্টি হইতে দৃষ্টি", সরানই "যোগ"। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বারা দৃষ্টি হইতে বিক্ষেপকারী সৃষ্টি সরানই—"বিক্ষেপ নাশই"—"যোগ", কিন্তু তখনও "অজ্ঞানবৃত্তিরূপ আবরণ" থাকে।

এখন চিন্তাহীন বা বৃত্তিহীন অবস্থাকে বুঝিতে হইলে "চিন্তা" বা "বৃত্তি" সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন সুতরাং তাহা করা যাইতেছে :—

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ইন্দ্রিয়ের ও মনের দ্বারা ধর্ম্মের বা নামরূপের উপস্থিতিই বা বৃত্তিই "চিন্তা"। এখন নামরূপের উপস্থিতি বলিতে কি বুঝিলাম তাহাই দেখা যাক—জাগ্রত স্বপ্নকালে আমাদের মনে সদাই কোনও না কোন নামরূপের "সামান্য জ্ঞান" এবং "বিশেষ জ্ঞান" বা বিজ্ঞান বা প্রত্যয় হইতেছে।

এখন এই নামরূপের প্রত্যয়ের দুইটী প্রত্যয় দেখা যায়—প্রথমটী "ক্ষণিক বিজ্ঞান বা খুচরা প্রত্যয়" বা "অন্য" বা "অনাত্ম প্রত্যয়"—মনের "বহিঃবৃত্তি" ; দ্বিতীয়টী—"ধারা প্রত্যয়" বা "অনুগত প্রত্যয়"—"অহং-প্রত্যয়"—"আমিবোধ" মনের "অন্তঃবৃত্তি।" এখন এই দুইটি প্রত্যয়কে পরীক্ষা করা যাক। "রাম সুবোধ", "লাল গোলাপ" "সে দুঃখী" ইত্যাদি অন্য প্রত্যয় বা অনাত্ম প্রত্যয়গুলি "খুচরা প্রত্যয়।" ইহাদিগকে পরস্পর সাজাইলে তাহাদের পরস্পর একটি সম্বন্ধ পাওয়া যায়; তাহাদের নাম "ধারা প্রত্যয়"—"অহং-প্রত্যয়।" আমি জানিতেছি বা দেখিতেছি রাম সুবোধ, আমি জানিতেছি বা দেখিতেছি লাল গোলাপ, আমি জানিতেছি বা দেখিতেছি সে দুঃখী। এই যে প্রতি বিজ্ঞানে বা ব্যষ্টি প্রত্যয়ে বা বহিঃবৃত্তিতে "সর্ব্বত্র অনুগত"—"আমির জানা বা অনাত্ম দেখা" প্রত্যয় ইহার নাম "অন্তর বৃত্তি" বা "অহং-প্রত্যয়"

প্রত্যেক, ব্যষ্টি বা অনাত্ম প্রত্যয়ে ইহার "নিত্য সাহচর্য্য" অর্থাৎ "অবিনাব ভাব", পাওয়া যায়। ব্যষ্টি প্রত্যয়গুলিও যেমন প্রত্যয়, ব্যষ্টি সাপেক্ষ ও তৎ সমষ্টিতে অবশ্যানুগত নিত্য সহচর—অহং-প্রত্যয়টীও তেমনি একটী প্রত্যয়। ব্যষ্টি বা অনাত্ম প্রত্যয়গুলি বাধ হইলে সুতরাং আমির জানারূপ বা দেখারূপ যে একটী অনুগত প্রত্যয়—অহং-প্রত্যয়, তাহাও বাধিত হইবে; এবং হয় তাহাই। সুষুপ্তি মরণ মূর্চ্ছা সমাধিতে "ব্যষ্টি অনাত্ম প্রত্যয়গুলি" বা "বহিঃবৃত্তিগুলিও" অহং-প্রত্যয় নামক তাহাদের অনুগত প্রত্যয়—"অন্তঃবৃত্তি"—উভয়ই যুগপৎ লুপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত যেমন পৃথক পৃথক বিজ্ঞানগুলি নানাবিধ পুষ্পের মত এবং সেই বিজ্ঞানগুলির ধারা বিজ্ঞানটী—অহং-প্রত্যয়টী—মালার মত। পুষ্পগুলি বিচ্ছিন্ন করিলে যথা তৎসঙ্গে মালার অভাব আপনা আপনি হইয়া যায়, তদবৎ ব্যষ্টি বা অনাত্ম প্রত্যয়গুলির অনুদয়ে মালা বিজ্ঞানরূপ সমষ্টি—অহং-প্রত্যয়টিও নিঃসন্দেহরূপে অভাবরূপ অর্থাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

এখন এই নামরূপের উপস্থিতিকে "সত্য" বলিয়া বুঝাই "সঙ্কল্প" এবং "আমি নামরূপ জানিতেছি" "অর্থাৎ আমার নামরূপের আবরণ দূর করাই" "বিকল্প"। তাহা হইলে ধর্ম্ম বলিতে আমরা "সঙ্কল্প বিকল্প" বুঝিলাম। সঙ্কল্প ও বিকল্প রূপ ধর্ম্ম যাহাতে থাকে তাহাই ধর্ম্মী। শাস্ত্রে এই অহং-প্রত্যয়কে "জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাও দৃশ্য। কিন্তু কি ব্যষ্টি বা অনাত্ম প্রত্যয়গুলি—সঙ্কল্প, কি অনুগত নিত্য সহচর অহং-প্রত্যয়টী—বিকল্প, যে ধর্ম্মীর বা সাক্ষীর অবলম্বনে, যে ধর্ম্মীর বা সাক্ষীর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান হয় সেই ধর্ম্মীরূপ সাক্ষীই "আত্মা বা আমি"—তাহাই "সাধ্য"। এই ধর্ম্মীরূপ আত্মা কোন

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেকে নিজে স্বীকার না করিয়া পারে না, "আমি নাই" বলা চলে না; "আমি নাই" বলিলেও বক্তা "আমির" লোপ সিদ্ধ হয় না। শব্দের দ্বারা কিছু জানা যায় কিন্তু করা যায় না—শব্দের জ্ঞাপকত্ব আছে কারকত্ব নাই। যাহা নাই তাহা সৃষ্টি করিবার শক্তি বা যাহা আছে তাহার অপলাপ করিবার সামর্থ্য শব্দের নাই। শব্দ অস্তি আত্মার নিষেধ করিতে পারে না জ্ঞাপন করিতে পারে। কেহ কেহ যাহারা অস্তি আত্মার উচ্ছেদ শব্দ উপদেশ দ্বারা করা যায় বলেন এবং বিচার দ্বারা যাহার উচ্ছেদ করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন তাহা "বিম্ব" নহে—তাহা "প্রতিবিম্ব" মাত্র—তাহা "দ্রষ্টা" নহে, তাহা "দৃশ্য" মাত্র। তাহাদের আত্মাটী আত্মা নহে, আত্মার "নকল মাত্র"। "সাক্ষ্য অহং-প্রত্যয়" "প্রতিবিম্ববৎ"—তাহার উচ্ছেদেও "সাক্ষী বিম্বআত্মা", অক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই থাকিয়া যায়। উপনিষদে অহং-প্রত্যয়ও একটী দৃশ্য বা ধর্ম্মমাত্র তাহা মরিলেও আত্মা মরে না।

দৃশ্যলোপে অর্থাৎ "বহির্বৃত্তির অনুদয়ে" দ্রষ্টা নাম লুপ্ত হইলেও অর্থাৎ "অন্তঃবৃত্তি নিবৃত্তি" হইলেও দ্রষ্টা নামের "নামী পুরুষটার" অর্থাৎ "অন্তঃবৃত্তির আশ্রয়ীর" লোপ হয় না। টিকি কাটিয়া দিলে বটে টিকিদারকে পাওয়া যায় না কিন্তু মানুষটা বিনাটিকি মজুত থাকে।

এখানে ব্যষ্টি বা অনাত্ম প্রত্যয় ও অহং-প্রত্যয় অর্থাৎ সঙ্কল্প ও বিকল্প উভয়েই একযোগে সমগ্র দৃশ্যবর্গ ও টিকির মত, এই টিকি বা ধর্ম্ম আত্মা হইতে দূর করিলে আত্মার দ্রষ্টৃত্ব নাম বা উপাধি তাহাও দূরীভূত হইয়া যায়, কিন্তু "চরমাত্মা তথাপি অক্ষুণ্ণ"—"অনষ্ট পুরুষের" মতই থাকেন। যখন সুষুপ্তিতে না আছে ব্যষ্টি অনাত্ম বিজ্ঞান বা

"সঙ্কল্প"—না আছে সমষ্টি অহং-প্রত্যয় বা "বিকল্প" তখনও এবং যখন স্বপ্ন জাগরে ব্যষ্টি বা অনাত্ম প্রত্যয় বা সঙ্কল্প আছে, অহং-প্রত্যয় বা বিকল্পও আছে তখনও "আত্মা সদা বর্ত্তমান"। সুষুপ্তি সময়ে আত্মাতে সাক্ষীত্ব উপাধি নাই, স্বপ্ন জাগরে আত্মার সাক্ষীত্ব উপাধি আছে। অহং-প্রত্যয় আত্মা নহে; উহা আত্মার সাময়িক অস্থায়ী দৃশ্য মাত্র। স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় যিনি পর্য্যায়ক্রমে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন সেই "তুরীয় আত্মা" যাহা, তাহা অসঙ্গ, অপাপপুণ্য বিদ্ধ অভয়। তাহার মৃত্যু হয় না, তাহাতেই বরং সকলেই অনিচ্ছায় অবশে মরিয়া মিশাইয়া যায়।

এই আত্মা কখনও "উপহিত", যথা—অহং কর্ত্তা, অহং সুখী, অহং দুঃখী ইত্যাদি কখনও বা "নিরুপহিত"—সুষুপ্ত, অথচ উভয়কালে "উপাধির দ্বারা" এবং "উপাধির অভাব দ্বারা" "অসংস্পৃষ্ট", নিত্য সিদ্ধ। স্ফটিকের মত নীল, লোহিত, শুভ্র সকল অবস্থাতেই স্ফটিক—স্ফটিকই। এই আত্মা "উপহিত অবস্থায়" **দ্রষ্টা, দৃশ্য নহে**। "নিরূপহিত অবস্থায়" দ্রষ্টৃত্ব উপাধি বর্জ্জনপূর্ব্বক "নিরূপহিতই"—দৃশ্য নহে। ইহা **"কখনও দৃশ্য নহে"**—ইহা আত্মার একটী লক্ষণ, ইহার দ্বারা "অদৃষ্ট বা অদৃশ্য" দ্রষ্টা আত্মাকে সামান্যরূপে বুঝা যায়।

সাধক! তোমার ভিতরে যে "চৈতন্য-সত্তা" রহিয়াছেন—প্রতিনিয়ত যাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছ, উঁহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; অথচ সত্য—উঁহার ধ্বংস নাই, উৎপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, অপচয় নাই, উঁহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, অক্লেদ্য, উঁহা তোমার "অপ্রাপ্য না হইলেও ধরিতে, বুঝিতে বা ভোগ" করিতে পারিতেছ না; অথচ

প্রতিনিয়ত "তাঁহাকেই সম্ভোগ" করিতেছ। তুমি জন্ম মৃত্যু বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আসিতেছ; কিন্তু তাঁহার "সঙ্গচ্যুত" কখনও হও নাই। তোমার কতই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, হইবে; কিন্তু "তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই।" স্থূলকথায় যাহাকে প্রাণ বল, ঐ যে "চৈতন্য"—ঐযে "হুস" যাহা আছে বলিয়া তুমি আছ, তিনি অণু কি, মহান্ তাহা বলা যায় না। উহার নাম নাই, রূপ নাই, "গুণও কিছু নাই"। এইরূপ সাধারণভাবে তাঁহাকে জানিয়া লও। বাস্তবিক কিন্তু **আত্মাকে জানা যায় না**; কারণ তিনিই **জ্ঞানস্বরূপ**। জানার ভিতরে আসিলেই তাঁহার নিত্য স্বরূপটীর বিলক্ষণতা ঘটে।

এখন আত্মাকে "স্বয়ংপ্রকাশ" বা "অদৃশ্য দ্রষ্টা" এই কথাটী শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হইয়াছে যে আত্মাতে "ফলব্যাপ্তি" নাই, "বৃত্তি ব্যাপ্তি" আছে অর্থাৎ জীব "ব্রহ্মকে বিষয় করে না", কিন্তু জীবের মনে – "অহং ব্রহ্ম" রূপ একটী "বৃত্তি"—"আকার"—"অবস্থা"—"পরিণতি" হইতে পারে। মনের "অন্তঃবৃত্তিতে" আত্মা প্রকাশিত হন, আত্মা স্বয়ং গ্রহণকর্ত্তা বলিয়া কোন প্রকারে তাহাকে মনের "বহিঃবৃত্তি" রূপ "ইদংরূপে অর্থাৎ "এইরূপে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে কর্ম্মকারকরূপে" গ্রহণ করা যাইতেছে না। বিম্ব নিজেকে অন্য একটী বিম্ব করিতে পারিতেছে না। কিন্তু প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া তাহার সাহায্যে নিজেকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। "আমি নাই" এইরূপ জ্ঞান হয় না অথচ আমিটা যে কি—অর্থাৎ আমির "বিশেষরূপ"—অর্থাৎ "ইন্দ্রগ্রাহ্যরূপ" তাহাও ঠিক জানা যায় না, আত্মাটা বা আমিটা "স্বতঃসিদ্ধ" ও "সদা প্রকাশিত" হইয়াও "ইন্দ্রিয় মনের অবিষয়"—চিরগুপ্ত। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে "নিঃসন্দেহরূপ এক" আত্মাই বা আমিই। আমাকে আমি যেরূপ অসন্দিগ্ধভাবে জানি

সেইরূপ অন্য কোনও পদার্থকে সেইরূপ অসন্দিগ্ধভাবে জানিনা বা জানিতে পারিনা এবং এই আমার "আমিকে" আমিই কেবল জানিতে পারি, "আমি ভিন্ন অন্য কেহই আমিকে জানিতে পারে না।" এইজন্যই "আমি বা আত্মা" অন্যের নিকট অদৃশ্য হইলেও নিজে নিজেরই "অন্য-নিরপেক্ষ দ্রষ্টা"। এখন অন্য-নিরপেক্ষ দ্রষ্টার অর্থ এই যে "আমিকে" জানিবার জন্য কোনও "মনের বৃত্তি" বা "ইন্দ্রিয়ের বা অন্য কোন বস্তু বা সাধনের" প্রয়োজন না হওয়াকেই বুঝায়।

"আমি আছি" এই নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কোন অপেক্ষা নাই অথচ "আমির জ্ঞান" নিঃসন্দেহ, স্বতঃ ও নিত্য সিদ্ধ। "আমি আছি" এই জ্ঞান—চক্ষুরাদি সকল প্রমাণ নিরপেক্ষ, অপ্রমেয়, স্বয়ংসিদ্ধ। উপহিত বা উপাধিযুক্ত "আত্মা বা আমি" দ্রষ্টা এবং "আমি ভিন্ন" যাবৎ অনাত্মা যাহা বোধগম্য হয় অর্থাৎ **যাহাতে আমির স্ফুরণ নাই—তাহাই দৃশ্য।** দৃশ্য বলিতে জড়কে বুঝায়, **দ্রষ্টা বলিতে আত্মা, অজড় সাক্ষী—চেতনকে অর্থাৎ যাহাতে "আমির স্ফুরণ" হয়** তাহাকে বুঝায়।

এখন আত্মরূপ ব্রহ্ম "নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ" বলিয়া তাহা সাধ্য হইতে পারেনা, "যাহা সিদ্ধ নহে বা সন্দিগ্ধ" তাহাই সাধ্য হয়, সিদ্ধের সাধ্য বলিলে সিদ্ধের সিদ্ধত্বই নষ্ট হয় এবং শাস্ত্রে তাহা "সিদ্ধ সাধন" দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব এতাবৎ সাধক সাধন ও সাধ্যের সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচিত হইল—তাহা চিত্রিত বৃক্ষের ফলের ন্যায় নিষ্ফল হইল। এইরূপ সন্দেহ হইলে এই সন্দেহভঞ্জনের জন্য ইহাই বলিতে হয় "যে তত্ত্বতঃ ইহা নিষ্ফল বটে" অর্থাৎ "ফল দশায়" —যখন সাধকের "অদ্বৈতাত্মজ্ঞান নিশ্চয়রূপ" হইয়া থাকে অর্থাৎ "সিদ্ধ

অবস্থায়" তাহা নিষ্ফল হইলেও "অধিকার দশায়" বা "ব্যবহার দশায়" —যখন বেদান্তাধ্যয়নাদি রূপ শ্রবণাদি কার্য্য চলিতে থাকে এইরূপ অধিকার দশায় বেদান্ত শ্রবণাদিতে ও লোকের আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি ও প্রমাতৃত্বাদি জ্ঞান আবশ্যক হয় সুতরাং "সাধক অবস্থায়" তাহা নিষ্ফল নহে—তাহা সফলই হয়।

নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম উপনিষদ সাহায্যে যখনই তাহাকে আমরা যথার্থরূপে সাক্ষাৎকার করি তখনই আমাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। "মোক্ষ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা" ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে আর সেই মোক্ষ আমাদের স্বতঃসিদ্ধ হইলেও কেবল "ভ্রান্তিবশতঃই" আমরা আমাদিগকে বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি ও ফলে "সংসারী" হইয়া পড়ি। ব্রহ্ম জ্ঞান আমাদের সেই ভ্রান্তি বা অবিদ্যা যখনই দূর করিয়া দেয়, তখনই আমাদের "মুক্তি" হয় অর্থাৎ আমরা যে "**সর্ব্বদা বা চির মুক্ত**" তাহা বুঝিতে সমর্থ হই।

এখন এই ব্রহ্মের "বৃত্তি ব্যাপ্তি" বা ব্রহ্ম "সাক্ষাৎকার" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজনানুরোধে তাহাই করা যাইতেছে—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার "অন্তঃকরণেরই ব্রহ্মবিষয়কবৃত্তি বিশেষ"। আর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ হয় বলিয়া ব্রহ্মের প্রকাশ যে "অপরের অধীন হইবে" তাহাও ঠিক নহে, যেহেতু, ব্রহ্ম শাব্দজ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হন বলিয়া, উহা "স্বয়ং-প্রকাশ হইবেন না", তাহা নহে। কারণ "সর্ব্বোপাধি রহিত" যে ব্রহ্ম, তাঁহাকেই "স্বয়ং-জ্যোতি" বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু "উপহিত ব্রহ্মকে স্বয়ং-জ্যোতি" বলেন না। আর অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ সাক্ষাৎকার কালে এই ব্রহ্ম যে সকল প্রকার উপাধি হইতে মুক্ত— ইহাও বলা যায় না, কারণ সেই যে সাক্ষাৎ-

কারব্রূপ মনোবৃত্তি, পরবর্ত্তী ক্ষণে তাহার বিনাশ সম্ভবপর হইলেও এবং তাহা নিজের ও অন্য উপাধির বিরোধী হইলেও তাহা তৎকালে উপাধি-রূপেই বিদ্যমান থাকে। এজন্য, শ্রুতি যে ব্রহ্মকে "স্বপ্রকাশ" বলিয়াছেন, সে ব্রহ্ম "নিরুপাধিক" ব্রহ্ম। "উপহিত ব্রহ্মকে" শাস্ত্র কখনই স্বপ্রকাশ বা স্বয়ং-জ্যোতি শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করেন না। অর্থাৎ **আত্মা নিরুপাধিক ভাবে স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও সোপাধিক ভাবে তাহা জ্ঞেয় হইয়া থাকেন।** এখন যদি বল, মুক্তির হেতুভূত যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহা "নিরুপাধিক ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎকার" হওয়া উচিৎ, "উপহিত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার নহে।"

তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে "নিরুপাধিক ভাবে" তাহা সাক্ষাৎ-কারের বিষয় হইলেও, "সাক্ষাৎকাররূপ মনোবৃত্তির" আশ্রয় বলিয়া তাহাকে "সোপাধিক" বলা হয়। অর্থাৎ "মনোবৃত্তিতে নিরুপাধিক" ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত সেই মনোবৃত্তির সহিত ব্রহ্মের "কাল্পনিক" সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় বলিয়া ব্রহ্মকে "সোপাধিক" বলা হয় এই মাত্র। বাস্তব পক্ষে ব্রহ্ম এই অবস্থায় "নিরুপাধিকই" থাকেন।

আবার যদি বল যে, নিরুপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক মনোবৃত্তির দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইল বটে কিন্তু সেই মনোবৃত্তিরূপ উপাধি থাকিতেছে বলিয়া মুক্তি কি করিয়া বলা যাইবে? কারণ, একবারে 'অদ্বয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" ত আর তখন থাকিতেছেন না। যেহেতু তখনও অন্তঃকরণ বৃত্তি ও ব্রহ্ম এতদুভয়েই ত থাকিতেছে? তাহার উত্তর এই যে, এই নিরুপাধিক "ব্রহ্মাকারা যে মনোবৃত্তি" তাহা ত "নিত্য নহে", তাহা অপর জ্ঞানের মত উৎপন্ন হইয়া "স্বতঃই নষ্ট" হইয়া যায়। অতএব তাহার নাশের

জন্য অন্য কোন কারণের অপেক্ষা থাকেনা। আর উহা তখন "নিজেই বিনষ্ট" হইয়া যায় বলিয়া এবং পূর্ব্ব হইতেই সেই "অজ্ঞানও নষ্ট হইয়াছে" বলিয়া অন্য কোনও বৃত্তির উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে না, তখন উক্ত বৃত্তি বিনষ্ট হইলে, "নিরুপাধিক ব্রহ্মই" থাকিয়া যাইবেন। সুতরাং "মুক্তি অসিদ্ধ" হইতে পারিল না অর্থাৎ "মুক্তি সিদ্ধ" হইল।

সার কথা এই যে, যাঁহাদের নিকট মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ "ব্রহ্ম ব্যতিরেকে" কেবলই কল্পিত, "পরমার্থ সত্য" নহে, অর্থাৎ শুক্তি রজত স্থলে যেমন শুক্তিই সত্য আর দৃশ্যমান রজত কল্পিত মাত্র—অসত্য তেমনি যাঁহারা "একমাত্র ব্রহ্মকেই" সত্য বলিয়া জানেন এবং তদ অতিরিক্ত "সমস্তকেই কল্পিত অসত্য" বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষ নামক অক্ষয়া শান্তি "স্বভাবতঃই সিদ্ধ," অন্যের অধীন নহে; কেননা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাহাতে কোন প্রকার "উপচার" সম্ভব হয় না। কিন্তু সৎপথবর্তী এবং হীন ও মধ্যম দৃষ্টিসম্পন্ন অপর যে সমস্ত যোগী "মনকে অন্য" বলিয়া—আত্মা হইতে পৃথক্ "আত্ম সম্বন্ধী" বলিয়া দর্শন করেন, সত্যরূপ আত্মার স্বরূপ অনভিজ্ঞ সেই সমস্ত যোগীর পক্ষে অভয় প্রাপ্তি মনোনিগ্রহের (মনঃসংযমের) অধীন। আরও এক কথা দুঃখক্ষয়ও মনোনিগ্রহের আয়ত্ত; কারণ বিবেকহীন ব্যক্তিগণের আত্ম সম্বন্ধী মন চঞ্চল হইলে কখনই দুঃখ ক্ষয় হয় না, এবং আত্ম প্রবোধও মনোনিগ্রহের অধীন। সেইরূপ তাঁহাদের অক্ষয় মোক্ষ নামক শান্তিও মনোনিগ্রহের আয়ত্ত। "সৃষ্টি হইতে দৃষ্টি" সরানই "যোগ" আর "দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি উৎপন্ন" করাই "জ্ঞান"। **এই দৃষ্টির আকারের নিবৃত্তি হওয়াই মোক্ষ।** অর্থাৎ যোগী সৃষ্টি-দৃষ্টি বাদী। সমাধিতেও উহার "সৃষ্টি বর্ত্তমান" থাকে, উহা কেবল সৃষ্টি হইতে

দৃষ্টি (চিত্ত বৃত্তি) সরাইয়া লয়, কিন্তু তখনও অজ্ঞানের বৃত্তি থাকে। কিন্তু "জ্ঞানী"—দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদী হন, উঁহার দৃষ্টিই সৃষ্টি হয়, তথা উঁহার দৃষ্টির "আকারের" নিবৃত্তিতে অর্থাৎ দৃষ্টির "বিষয় প্রকাশ" না করাই—"দৃষ্টি বহিঃমুখ" না হওয়াই—অন্তর মুখ হওয়ায় সম্পূর্ণ প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়। যোগীর দৃষ্টিতে আত্মভেদ, প্রাকৃতিক সত্তা, ঈশ্বরের অন্যথা হয়, **কিন্তু জ্ঞানী স্বয়ংই সর্ব্বরূপ হন**। সমাধি অবস্থায় প্রপঞ্চের অপ্রতীতি উভয়েরই হয় কিন্তু এই "অপ্রতীতিই কল্যাণের বা মোক্ষের" কারণ নহে। যদি প্রপঞ্চের "অপ্রতীতিই মোক্ষ" হইত ত সুষুপ্তি আদিতে সকলের প্রপঞ্চের অভাব অনুভব হয় বলিয়া সকলের মুক্ত হওয়া উচিৎ কিন্তু এইরূপ হয় না। অতএব আত্যন্তিক নিঃশ্রেয়সের কারণ "প্রপঞ্চের অপ্রতীতি নহে"—"**ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধই**" একমাত্র কারণ।

এখন যদি পুনরায় বল যে, "আবরণ ভঙ্গ" করিয়া "বৃত্তি নষ্ট" হইয়া যায় তাহা হইলে "স্বরূপানুসন্ধানেন বসেৎ" "নিমিসার্দ্ধ ন তিষ্ঠতি বৃত্তি ব্রহ্মোময় বিনা" ইত্যাদি বাক্য কি প্রকারে চরিতার্থ হইবে? তাহার উত্তর এই যে, যে সময়ে দ্রষ্টা দৃশ্যের বিবেক করিতে করিতে "দৃশ্যের অত্যন্ত অভাব নিশ্চয় হয়" সেই সময়ে অর্থাৎ দৃষ্টির "অন্তর মুখ" অবস্থায় "যাহা কিছু অবশিষ্ট" থাকে তাহা কি হয়? সেই সময়ে যে বৃত্তির দ্বারা সবকে ত্যাগ করা যায় তথায় "সর্ব্বাভাবরূপা বৃত্তি থাকে" সেই সর্ব্বাভাবরূপা বৃত্তি ঘটাকার পটাকার "বিশেষ বৃত্তির" সমান হয় না। উহা "সমবৃত্তি" হয়; উহাকে "শুদ্ধাবৃত্তি" বলা হয়। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" এই শ্রুতি যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন উহা তাহাই। কিন্তু ইহার নাম সাক্ষাৎকার নহে সেই সময়ে যখন "দশমস্ত্বমসি" এই ন্যায়ে শ্রীগুরু মহাবাক্যের উপদেশ করেন তখন

উহার দ্বারা অর্থাৎ "মহাবাক্যের দ্বারা সাক্ষাৎকার" হয়। উহাকেই "অভেদাকার বৃত্তি" বা "বোধ বৃত্তি" বলা হয় আর ইহারই নাম "বৃত্তি ব্যাপ্তি"। নিষেধাকার বৃত্তি সমস্ত "উপাধির নিরাশ" মাত্র করে ; উহার দ্বারা (উপাধি নিরাশের দ্বারা) "বোধ" হয় না, কেবল বোধ গ্রহণের "যোগ্যতা" মাত্র হয়। উহার পর যখন "বৃত্তিব্যাপ্তি"—"আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ বৃত্তি হয় তখন উহার জন্য সমস্ত বৃত্তিই জল তরঙ্গের মত (অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন জলের স্বরূপভূত হইয়া যায়) স্বরূপভূতই হইয়া যায়, তাঁহার "সারা সংসার ব্রহ্মময়" হইয়া যায়, ইহারই নাম **স্বরূপানুসন্ধান** হয়। মরুভূমির যথার্থ জ্ঞান হইয়া যাইলেও পুনরায় ভ্রমরূপ জলরূপে প্রতীতি হইলেও উহার দৃষ্টিতে উহা "মরুভূমিই" থাকে। সেইরূপ "আমি দেহাদি হই"—এইরূপ "ভ্রম" উহার আর কখনও হয় না। জীবন মুক্ত অবস্থায় যে কার্য হয় তাহাতে "সমষ্টি ব্যষ্টির" ভেদ থাকে না ; কিংবা "দ্রষ্টা দৃশ্যের" ও ভেদ থাকে না। যাঁহার বিবেক হইয়াছে তাঁহার এই বোধ "নিরন্তর" থাকে যে "সারা প্রপঞ্চ আমা হইতে ভিন্ন নহে।" উঁহার জন্য কেবল "একই সত্তা" থাকিয়া যায়। তাঁহার এই দৃষ্টি অর্থাৎ "সর্ব্বাত্মদৃষ্টি" কখনও অন্যথা হয় না।

এখন "সারা প্রপঞ্চ" "আমা হইতে ভিন্ন" নহে—এই যে "সত্তার একত্ব বোধ"—ইহাই "অন্বয় দৃষ্টি"। ইহা ব্যতিরেক দৃষ্টির পশ্চাৎ প্রাপ্ত হয়। "ব্যতিরেক দৃষ্টি" "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সকলের "বাধ" অর্থাৎ "মিথ্যাত্ব নিশ্চয়" হইবার পর যাহা কিছু প্রতীত হয় উহা "আত্মসত্তা" হইতে ভিন্ন হয় না। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, সাধন-সাধ্য আর লৌকিক ব্যবহারে সকলেই "আপনার সহিত অভিন্ন" প্রতীত হয়। বোধ হইয়া যাইবার পর যদি "আত্মসত্তা হইতে ভিন্ন" কোনও সত্তা

দেখে ত বস্তুতঃ সে "বোধবানই নহে"। বোধ হইবার পর যে স্বরূপানু সন্ধান তাহাই **অভেদ ভক্তি**। কিন্তু এই স্বরূপানুসন্ধান সাধন কালীন স্বরূপানুসন্ধানের সমান নহে।

সাধন কালীন স্বরূপানুসন্ধানে কেবল "নিষেধ বৃত্তিরই" অভ্যাস করা হয়, কিন্তু বোধ হইবার পর যে স্বরূপানুন্ধান সেই সময়ে নিষেধ করিবার যোগ্য কোন বস্তুই না থাকিবার কারণ "সারা বস্তুই আপন স্বরূপই" হইয়া যায়।

নির্ব্বিকল্পাবস্থাই—"সমাধি" আর নির্ব্বিকল্পস্বরূপই—"বোধ"। "সমাধি কর্ত্তার অধীন" আর "বোধ অকৃত্রিম"; নির্ব্বিকল্পাবস্থায় বৃত্তি যতই "লীন" হউক না কেন "তখনও বৃত্তি থাকে"। কিন্তু **বোধে বৃত্তি থাকে না**। এই যে নির্ব্বিকল্পস্বরূপ "সব প্রকার বিকল্প রহিত", সমাধি-আদি রহিত; তথা আদি, মধ্য এবং অন্ত রহিত।

নির্ব্বিকল্পস্বরূপ আত্মা সবিকল্প বিবর্জ্জিতঃ।
সদা সমাধি শূন্যাত্মা আদি মধ্যান্ত বর্জ্জিতঃ॥

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহার নিষ্কর্ষ অর্থ এই হয় যে ঃ—

মুক্তিকামীকেই মুমুক্ষু বলা হয়। মুমুক্ষা না হইলে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়াও কোন ফল হয় না। সেই "মুমুক্ষুরই" সাধনের প্রয়োজন "মুক্তের" নহে। এখন ধর্ম্মকে ধর্ম্মী হইতে সরানই—সাধন হয়! "যাহা ধর্ম্মীতে থাকে" তাহাই "ধর্ম্ম" অর্থাৎ "ধর্ম্মীর আশ্রেয়কে" "ধর্ম্ম" বলে এবং "যাহাতে ধর্ম্ম থাকে" অর্থাৎ "ধর্ম্মের আশ্রয়কে" "ধর্ম্মী" বলা হয়। ধর্ম্মী ব্যাপক ধর্ম্ম ব্যাপ্য। ধর্ম্ম বলিতে জাগতিক যাবৎ সৃষ্ট বস্তুকেই বুঝায় তাহা ধর্ম্মীর "কল্পিত" নাম

রূপ ভিন্ন "তত্ত্বতঃ" কিছুই নহে। সেই নামরূপ "কল্পিত" দ্রব্যের "চলনেই"—"ভাবনায়"– বা ' সঙ্কল্প-বিকল্পেই" উদিত হয়। এখন ধর্ম্মী বলিতে তাহাকে বুঝায় যাহাতে সমস্ত প্রপঞ্চ "আধ্যাসিক সম্বন্ধে" আধেয় রূপে থাকে। অর্থাৎ নামরূপাত্মক "সমস্ত প্রপঞ্চই" "ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আধারে কল্পিত", **সকল বস্তুরই সত্তা ও প্রকাশ ব্রহ্মেরই সত্তা প্রকাশ লইয়া**; সেই সত্তা ও প্রকাশের অতিরিক্ত "বস্তুর নাম ও রূপ" আগমপায় স্বভাব—"পরিবর্ত্তনশীল।" বস্তুর "নামরূপ তিরোহিত" হইতে থাকিলেও বস্তুর "সত্তা ও প্রকাশ" অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায় বলিয়া তাহা "সত্তা ও প্রকাশ নিত্য"—"অপরিবর্ত্তনশীল"। তাহা ব্যাপক বলিয়া "বিষ্ণু" অর্থাৎ "ব্যাপনশীল ব্রহ্ম"। সুবর্ণে প্রকল্পিত বলয় কুণ্ডলাদির নামরূপ তিরোহিত হইতে থাকিলেও সুবর্ণ যেমন অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়, সেইরূপ নামরূপাত্মক প্রপঞ্চলয়ে, ' সত্তা, প্রকাশ ও আনন্দরূপ ব্রহ্মই" অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যান। এই ব্যাপক ও নিত্য ব্রহ্মই "ধর্ম্মী"। "ধর্ম্মের অপেক্ষায় ধর্ম্মী" কিন্তু "নিরপেক্ষায়" ধর্ম্মীত্ব উপাধি ত্যাগ করিয়া অনষ্ট পুরুষের ন্যায় "কেবল স্বরূপ" হন।

সেই ধর্ম্মের সরান দুই প্রকারে হয়—প্রথম "লয়মুখে", দ্বিতীয়—"বাধমুখে"। যাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম লয়মুখে সৃষ্টি-দৃষ্টি বাদীরা অর্থাৎ যাঁহারা মানেন—বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিতে হইলে নিজের ন্যায় অপরের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এবং জগৎ যেমন তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছে অপরের নিকটও সেইরূপ প্রতীত হইতেছে এবং সেইরূপ পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক এই "ত্রিবিধ সত্তাই" স্বীকার করেন, তাঁহাকে ব্যবহারিক পক্ষবাদী সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদী আখ্যা দেওয়া হয়।

"সৃষ্টি হইতে দৃষ্টিকে সরান" তাহা "যোগের দ্বারা" হয় অর্থাৎ "মনের চলন—গতি রহিত করিয়া"—"বৃত্তি—ভাবনা বা সঙ্কল্প বিকল্পের উদয় রাহিত্য" করিয়া "নামরূপের ধর্ম্মের উপস্থিতি নিবারণ" করিয়া অর্থাৎ "পরিবর্ত্তন নিবারণ" করিয়া "নির্ব্বিকল্প অবস্থায়" বা "সমাধিতে" থাকেন তখনও "সংস্কাররূপ অজ্ঞান বৃত্তি" থাকে অর্থৎ "অজ্ঞান বৃত্তিরূপ আবরণ" থাকে "চিত্তবৃত্তিরূপ বিক্ষেপ" থাকে না। অর্থাৎ তখনও 'সর্ব্বাভাবরূপাবৃত্তি' থাকে তাহাকেই 'সূক্ষ্ম বুদ্ধি' বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তাহা কেবল সর্ব্বাভাব-বৃত্তিরূপ উপাধি ভিন্ন 'অন্য সর্ব্ব উপাধি নিরাশ' মাত্র করে, তাহার দ্বারা **'বোধ' হয় না, বোধের 'যোগ্যতা' মাত্র হয়** কারণ সর্ব্বাভাবরূপ বৃত্তি থাকে বলিয়া তখনও 'পরিবর্ত্তনের অভাব' না হওয়ায়—**'অপরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মীর স্ফুরণ হয় না।**

সারাংশ এই হয় যে—বিষয় দুইপ্রকারের হয়—'পঞ্চভৌতিক' এবং 'মনোময়'। যেমন মৃন্ময় ঘট প্রমাণ দ্বারা—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "মেয়"—'জ্ঞেয় বা প্রমাতৃভাস্য,' অর্থাৎ 'সাক্ষী' চক্ষুরাদি 'প্রমাণ বা বৃত্তির' দ্বারা মৃণ্ময় ঘটকে 'বাহ্য বস্তুরূপে' প্রকাশ করেন, আর 'মনোময় ঘট' যাহা 'সাক্ষীভাস্য' অর্থাৎ যাহাকে (চিত্তবৃত্তি হইতে ভিন্ন) 'অবিদ্যা বৃত্তিরদ্বারা' স্বপ্ন, সুখ দুঃখ ও কামাদির ন্যায় 'ভিভরে প্রকাশ' করিয়া থাকেন অর্থাৎ 'মন' যেমন পাঞ্চভৌতিক বিষয়কে বা 'মৃণ্ময় ঘটকে' 'এই' বলিয়া 'সামান্য আকারে' গ্রহণ বা 'উপলব্ধি' করিতে পারে, মনোময় ঘটকে ত সেইরূপে পারে না কারণ "মৃণ্ময়ঃ মানমেয়"—মৃণ্ময় ঘট মনোবৃত্তিরূপ প্রমাণ দ্বারা প্রমাজ্ঞানে বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ 'প্রমাতার দ্বারা' বা 'অধিষ্ঠান চৈতন্যের সহিত চিদাভাস যুক্ত

অন্তঃকরণ বৃত্তি' দ্বারা প্রকাশ্য; সেইরূপ "ধীময়ঃ সাক্ষীভাস্য"— মনোময় ঘট 'সাক্ষীভাস্য' অর্থাৎ 'অবিদ্যার বৃত্তির' দ্বারা অভ্যন্তরের সুখ দুঃখের ন্যায় 'কূটস্থের নিকট প্রকাশিত' হয়—তাহার প্রকাশের জন্য 'অন্তঃকরণ বৃত্তির' প্রয়োজন হয় না।

এখন এই পাঞ্চভৌতিক বিষয়কে—যাহাকে 'মন বা চিত্ত' 'ইদংরূপে' গ্রহণ করিতে পারে তাহার অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক বিষয়ের নিবৃত্তির জন্য 'মনের বা চিত্তের বৃত্তি নিরোধেই' তাহা সম্ভব হয় কারণ সেই পঞ্চভৌতিক বিষয় 'চিত্তবৃত্তিরূপ প্রমাণের' দ্বারা প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয় সুতরাং সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদী এই পাঞ্চভৌতিক 'বিষয়রূপ ধর্ম্মকে' 'ধর্ম্মীরূপ সাক্ষী' হইতে বৃত্তি নিরোধের দ্বারা সরাইয়া দেয়। সূক্ষ্ম মনোময় পদার্থ অর্থাৎ 'অপঞ্চীকৃত তন্মাত্র' সাক্ষী ভাস্য সেই 'নিরোধরূপ সমাধি' অবস্থায় থাকিয়া যায়। 'লয়মুখ সমাধীতে' অজ্ঞানের কার্য্য 'চিত্তবৃত্তিরূপ বিক্ষেপরই' নিবৃত্তি হয় বলিয়া এবং 'নামরূপের সংস্কার-রূপ অজ্ঞান বৃত্তি' তখনও থাকে বলিয়া **'অজ্ঞানের আবরণ শক্তি' থাকিবার জন্য 'বোধের উদয় হয় না'।**

এখন 'পাঞ্চভৌতিক বিষয়' 'ঈশ্বর রচিত' আর 'মনোময় বিষয়' 'জীব রচিত।' **জীব রচিত দ্বৈতই সুখ দুঃখরূপ বন্ধের কারণ,** 'অন্বয় ও বেতিরেক' যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে 'মনোময় বস্তু থাকিলেই সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়'; 'ইহা না থাকিলে সুখ দুঃখ উপস্থিত হয় না।' উদাহরণ যেমন লোকে 'স্বপ্ন, স্মৃতি, ভ্রান্তি মনোরাজ্য' প্রভৃতি অবস্থায় **'বাহ্যবস্তু না থাকিলেও'** কেবল 'মনোময় বস্তু বিদ্যমান থাকায়' 'সুখ দুঃখ রূপ বন্ধন' প্রাপ্ত হয় এবং 'সমাধি, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার' অবস্থায় 'বাহ্যবস্তু থাকিলেও' 'মনোময় বস্তু না থাকায়'

বন্ধনপ্রাপ্তি হয় না। অতএব 'মনোময় দ্বৈত বা জগৎ বন্ধের হেতু', ইহা প্রমাণিত হইল। এইরূপ বুঝিয়া সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদী যোগী 'মনের নিরোধ' করিয়া 'যোগ বা সমাধি' দ্বারাই সেই মানস দ্বৈতেরও নিবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হন। আর ও 'চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগাভ্যাস' দ্বারা 'তৎকালিক' নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ 'যতক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে ততক্ষণের জন্য নিবৃত্তি', 'আত্যন্তিক নিবৃত্তি' অর্থাৎ 'উৎপত্তি হীন নিবৃত্তি' বা 'কারণ সহিত কার্য্যরূপ' দ্বৈতের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং বাহ্য ও অন্তর বা মনোময় দ্বৈতের নিবৃত্তির জন্য সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদী যোগের শরণাপন্ন হন। ইহাতে কেবল 'বিক্ষেপের নিবৃত্তি' হয় 'আবরণের নিবৃত্তি' হয় না। **এই 'বৃত্তি নিরোধ' এবং 'আত্মলাভ' ইহা একই কথা নহে।** 'আত্মলাভ' হইলে বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু 'বৃত্তি নিরুদ্ধ' **হইলেই আত্মলাভ হয় না। কারণ 'বৃত্তিনিরোধ সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই'। আত্মা বুদ্ধির উপরে অবস্থিত।** 'বৃত্তি নিরোধের ব্যাপার বড় জোর বুদ্ধি পর্য্যন্ত'। অর্থাৎ 'বিক্ষেপ দুঃখের নিবৃত্তিমাত্র' করিতে পারে। সাধনা এবং বৈরাগ্যাদির ফলে 'দুঃখের নিবৃত্তি' হয়, ইহা খুব সত্য, কিন্তু 'পরমসুখের' প্রাপ্তি হয় না। 'দুঃখের নিবৃত্তি' মাত্র যে 'সুখ', মাত্র তাহাই হয়। দুর্ব্বহভার বহনকারী ব্যক্তির মস্তক হইতে ভারটি নামাইয়া নিলে, তাহার 'দুঃখের নিবৃত্তি জন্য যে সুখ' তাহা লাভ হয় বটে ; কিন্তু 'পরমসুখ' লাভ হয় না। **আত্মা সর্ব্ব ভাবাতীত ;** সুতরাং **সর্ব্বভাবের সহিত সাধনা ও বৈরাগ্যকে বিলয় করিয়া, তাহার পরে তিনি স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন।** 'চিত্তটা শান্তি ক্ষেত্র' নহে। 'নিরুদ্ধই হউক' বা 'বিক্ষিপ্তই হউক', ওখানে 'যথার্থ

বিদিত' থাকায় 'আবধক হয়।' আবার সেই ঈশ্বর রচিত দ্বৈত অদ্বৈত জ্ঞানের সাধক হয়; কেননা 'গুরু শাস্ত্রাদিরূপে' সেই ঈশ্বর রচিত দ্বৈত জ্ঞানের সাধক; আকাশাদি দ্বৈতের নাশ—অসাধ্য এই হেতু সেই ঈশ্বর রচিত দ্বৈত যেমন আছে তেমনিই থাকুক—তাহার প্রতি দ্বেষের কোন কারণ নাই। (ইহার দ্বারা "বেদান্তের সহিত সাঙ্খ্য দর্শনের 'প্রকৃতির' সত্যত্ব মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে বিরোধের পরিহার হইল।")

জীব রচিত দ্বৈত 'শাস্ত্র বিহিত' ও 'শাস্ত্র নিষিদ্ধ'ভেদে দুই প্রকার। 'যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়',সেই পর্য্যন্ত 'শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিতজ্য নহে।' অন্তর আত্মার স্বরূপভূত ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ক 'শ্রবণ মননাদিরূপ বিচারই' শাস্ত্র প্রতিপাদিত 'মনোময় জগৎ;' 'শ্রবণ মননাদি' মনেরই 'কল্পনা' বলিয়া 'জীবকৃত দ্বৈত।' কিন্তু শাস্ত্রীয় বচন রহিয়াছে—"অসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্ত চিন্তয়া"—'প্রতিদিন নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুনঃনিদ্রা পর্য্যন্ত যতদিন মৃত্যু না আসে ততদিন পর্য্যন্ত জীবন কাল বেদান্ত বিচার দ্বারা অতিবাহিত করিবে।' ইহার উত্তর এই যে জ্ঞানোদয় হইলেই তদনন্তর শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যজ' ইহা শ্রুতির আদেশ। "তত্ত্বে বুদ্ধে তৎচ হেয়ম্—ইতিশ্রুত্যনুশাসনাম্"—'দৃশ্যের মিথ্যাত্ব' নিশ্চয় পূর্ব্বক 'ব্রহ্ম ও আত্মার একতা' অবাধে 'অপরোক্ষীকৃত' হইলে—"সাক্ষাৎকার" হইলে সেই 'শাস্ত্রীয় দ্বৈত' পরিত্যাগের যোগ্য—ইহা শ্রুতির আদেশ তাহা হইলে পূর্বোক্ত বচনের এই 'উদ্দেশ্য' হয় যে উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ রূপ শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ হইতেছে—"দত্ত্বান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি"—যাহাতে 'কাম, ক্রোধাদি' চিত্তে প্রকটিত হইতে পারে এইরূপ 'অবসর'

তাহাদিগকে স্বল্পমাত্র দিবেনা—'এই নিষেধই' উক্ত শ্লোকার্দ্ধের 'তাৎপর্য্য' সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্যে কোন অসঙ্গতি নাই।

জীব রচিত আশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুই প্রকার - তীব্র ও মন্দ। 'কাম ক্রোধাদি রূপ মানস দ্বৈত প্রপঞ্চ' তীব্র এবং তৎভিন্ন মানস প্রপঞ্চ যথা 'মনোরাজ্য' ইত্যাদি মন্দ। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই উক্ত' উভয়' প্রকার 'আশাস্ত্রীয় দ্বৈতের' নিরাকরণ করার প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য শ্রুতিই 'শম,' ও "সমাধান" এই দুইটী বিধান করিয়াছেন। "শমের দ্বারা" কামাদিরূপ 'তীব্র' জীব দ্বৈতের এবং "সমাধান" দ্বারা মনোরাজ্য রূপ 'মন্দ' জীব দ্বৈত্যের নিষেধ করিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও জীবনমুক্তির জন্য 'আশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ,' যেহেতু কামাদি ক্লেশরূপ বদ্ধ বা সংসার বন্ধন দ্বারা আক্রান্ত পুরুষের জীবনমুক্তি হয় না।

কনিষ্ঠ অধিকারী "সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদী" ও মধ্যমাধিকারী "দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদী" উভয়েরই ধর্ম্মকে ধর্ম্মী হইতে সরানর জন্য সাধনের প্রয়োজন—**সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদী 'চিত্তের বৃত্তি নিরোধ' করিয়া ধর্ম্ম সরান এবং দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী—'অধ্যারোণ অপবাদের' দ্বারা 'ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়' করিয়া ব্রহ্মানুভব করেন।**

আর উত্তমাধিকারী, **যিনি চৈতন্যরূপ একই পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন।** অর্থাৎ **যিনি বুঝেন চৈতন্যের সত্যতা প্রপঞ্চ সংস্কার বর্জ্জিত বুদ্ধির দ্বারাও অনুমোদন নিরপেক্ষ। তিনি নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বিকার স্বরূপ সৃষ্টি হইতেই পারেনা এবং বস্তুতঃ কোন কালেইহয় নাই এইরূপ "সংশয় বিপর্য্যয় রহিত" সিদ্ধান্তে. উপনীত হন।** তাঁহাকে—"**অজাতবাদী**" বলা হয়।

সেই উত্তমাধিকারীকে ব্রহ্মের সৃষ্টি 'অধ্যারোপ ও অপবাদ' দ্বারা ব্রহ্মানুভব করিতে হয় না। সেই হেতু মহাবাক্যের অন্তর্গত "তৎ" ও "ত্বম" পদার্থের 'বাচ্যার্থের ও লক্ষ্যার্থের' 'কল্পনার' প্রয়োজন নাই। মহাবাক্য শ্রবণ মাত্রই ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা তাঁহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া যায়। তাঁহার 'মায়া কেন হইল' 'কে করিল' ইত্যাদি নানা দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দিবার আর প্রয়োজন থাকে না।

সকল মহাবাক্যেরই লক্ষ্যার্থ—**শুদ্ধব্রহ্ম**। সেই লক্ষ্যার্থের ধারণা করাইবার জন্য চারটি মহাবাক্যেরও প্রয়াস। সেই প্রয়াস 'কেবল উপাধি বর্জ্জন' পূর্ব্বক 'একত্বোপলব্ধি' করিতে সহায়তা করিবার জন্য। 'বুদ্ধির শুদ্ধতা' বশতঃ সর্ব্বাপেক্ষা 'অল্প প্রয়াসেই অথবা বিনা প্রয়াসেই' যিনি লক্ষ্যার্থে পৌঁছান, তিনি উত্তমাধিকারী—তিনি অজাতবাদী—বলিয়া খ্যাত অর্থাৎ যিনি ধারণা করিয়াছেন 'উপাধি আদৌ জন্মে নাই'—তাঁহার বুদ্ধি সৃষ্টি ও সৃষ্টির কারণরূপ উপাধির দ্বারা 'অব্যাহত' থাকিয়া একেবারেই "নিরুপাধিক ব্রহ্মের" সহিত "আপনার অভেদ" উপলব্ধি করিতে পারেন। যিনি সেই 'উপাধিকে লঘু' করিয়া অর্থাৎ উপাধিকে 'ব্যবহারিক প্রতিভাসিক' না মানিয়া 'কেবল প্রতিভাসিক' বলিয়া মানেন তিনি 'অল্প প্রয়াসে' "শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত অভেদ" উপলব্ধি করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী—দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী। যিনি উপাধি বর্জ্জনের প্রয়াস অনুভব করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন তিনি কনিষ্ঠাধিকারী—সৃষ্টি-দৃষ্টি-বাদী। তিন অধিকারী একই বেদান্ত সিদ্ধান্তের আনুসারি।

সাধন সম্বন্ধে অল্প কথায় এতাবৎ বলা হইল, অর্থাৎ ধর্ম্মকে কিরূপে ধর্ম্মী হইতে সরান যায় সে সম্বন্ধে আলোচিত হইল। এখন ধর্ম্মহীন

ধর্ম্মীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। যদ্যপি ধর্ম্মীর সম্বন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচিত হইয়াছে তথাপি দুর্ব্বোধ্যের জন্য পুনরুল্লেখ দোষনীয় নহে।

ধর্ম্মী বা সাক্ষীর 'ধর্ম্ম বা উপাধি' বলিতে 'স্থুল সূক্ষ্ম ও কারণ' 'দেহ,' 'পঞ্চকোশ' 'কতৃত্ব' 'ভোগতৃত্ব' ইত্যাদিকে বুঝায়। এই সব ধর্ম্ম বা উপাধির **যিনি দ্রষ্টা—তিনিই সাক্ষীর স্বরূপ আত্মা**। অথবা এই সব উপাধি হইতে 'বিচার বিবেকের' দ্বারা যিনি ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হন অর্থাৎ 'তিন শরীর' 'পঞ্চকোশ' হইতে 'নিজেকে যিনি ভিন্ন' বলিয়া বোঝেন 'তিনিই সাক্ষী।'

দার্শনিকগণ কনিষ্ঠাধিকারী সৃষ্টি-দৃষ্টি-বাদীর জন্য জাগতিক যাবতীয় পদার্থকে তিনটী রাশিতে বিভাগ করিয়াছেন পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। পারমার্থিক সত্তাটী 'প্রত্যক আত্মা'; ইহা স্বয়ং সিদ্ধ, স্বয়ং পূর্ণ, ভূমা, অভয়, অদ্বয়, 'দৃশ্যমাত্রের বা সাক্ষ্যের' অভাববশতঃ অ—সাক্ষী। কিন্তু ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক কিছু 'দৃশ্যের কল্পনা' করিলেই, পারমার্থিক সত্তাটী একটু হীন, সবিকল্প, সদ্বয়, অল্প 'ঈশ্বর' হইয়া পড়িবে। পারমার্থিকের সাক্ষীত্ব উপাধি যোগ হইল। সুতরাং পারমার্থিকটী সাক্ষীত্ব উপাধির দ্বারা ঈষৎ জড়িত, পৃষ্ঠ, বদ্ধ, 'ঈশ্বর সাক্ষী' হইয়া পড়িল। সেই সাক্ষী ঈশ্বরের 'সাক্ষ্য'—ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ। যাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় তাহা 'ব্যবহারিক' আর যাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না অথচ দৃশ্য হয় তাহা 'প্রাতিভাসিক'। আপাততঃ দৃষ্টিতে প্রাতিভাসিকে ব্যবহার হয় না বলিয়াই মনে হয় কিন্তু একটু মনোযোগ করিলে বুঝা যায় যে 'প্রাতিভাসিকেও ব্যবহার হয়'। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই—যেমন

প্রাতিভাসিক সর্প হইতে 'ভয় কম্পনাদি', প্রাতিভাসিক রজত হইতে 'লোভাদি', প্রাতিভাসিক স্বপ্ন হইতে 'সুখদুঃখাদির' ব্যবহার দৃষ্ট হয় সুতরাং প্রাতিভাসিকেও ব্যবহার হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইল। অতএব ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয়ের ব্যবহার হয় বলিয়া উহাদের উভয়কে প্রাতিভাসিক অথবা ব্যবহারিক বলিতে হইবে। ব্যবহারিক বলিলে জগতের 'তাত্ত্বিক সত্তা' স্বীকার করিতে হইবে এবং জগদন্তরাগত 'দুঃখও সত্য' হইয়া পড়িবে। দুঃখের নাশ না হইলে 'আত্যন্তিক দুঃখ' নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আর হইতে পারিবে না। তাহা হইলে 'সর্ব্বশাস্ত্র ও মুক্ত পুরুষের বাক্যও' মিথ্যা হইয়া যাইবে। সুতরাং শাস্ত্র ও সজ্জনের বাক্যে প্রামাণ্য রক্ষার জন্য ব্যবহারিককে প্রাতিভাসিকই বলাই যুক্তিসঙ্গত। এখানে নিগূঢ় অর্থ এই হয় যে—ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয়েই দৃশ্য কিন্তু দৃশ্যমাত্র চৈতন্যে কল্পিত হইলেও ব্যবহারিক দৃশ্য 'কল্পিত বিশেষ', প্রাতিভাসিক দৃশ্যের মত নহে। প্রাতিভাসিক দৃশ্যের স্বীয় জ্ঞানের পূর্ব্বে সত্তা না থাকিলেও অর্থাৎ প্রাতিভাসিক দৃশ্য স্বীয় জ্ঞানের 'পূর্ব্ব ভাবী' না হইলেও ব্যবহারিক দৃশ্য চৈতন্যে 'কল্পিত' হইয়াও স্বীয় জ্ঞানের 'পূর্ব্ব ভাবী' হইতে পারে। ব্যবহারিক দৃশ্য প্রাতিভাসিক রজতাদির মত 'প্রাতিভাসিক মাত্র শরীর' নহে—ইহাই ব্যবহারিকের সহিত প্রাতিভাসিকের পার্থক্য। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী 'ব্যবহারিককে প্রাতিভাসিক' বলিয়া বুঝেন—সুতরাং তাহারা 'দুই সত্তা' স্বীকার করেন—'পারমার্থিক ও প্রাতিভাসিক।' এবং যাঁহারা কেবল 'এক সত্তা' অর্থাৎ 'পারমার্থিক সত্তাই' স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁহারা সৃষ্টির ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্যত্ব 'উভয়েরই অস্বীকার' করেন, কেবল পারমার্থিক সত্তা স্বীকার

করেন অর্থাৎ **সৃষ্টিই হয় নাই এইরূপ মানেন তাঁহারা অজাতবাদী।**

অজাতবাদী সৃষ্টি হয় নাই তাহার "যুক্তি" এইরূপ বলেনঃ—সৃষ্টির কারণানুসন্ধান করিলে তাহার নিশ্চয়তা হয় না অর্থাৎ 'অসৎ' হইতে অথবা 'সৎ' হইতে সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নির্ণয় হয় না বলিয়া অসৎ-কার্য্যবাদী ন্যায় বৈশেষিক ও সৎকার্য্যবাদী সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল পরস্পর পরস্পরের মত খণ্ডন প্রয়াসে উভয়েই তর্কের দ্বারাও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, সেইজন্য অজাতবাদী বা সৎকারণ বাদী বলেন যে, যেহেতু 'অসৎ' হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না অর্থাৎ 'অসৎ কখনও সৎ' হইতে পারে না অর্থাৎ 'যাহা নাই' তাহা হইতে 'কিছু জন্মাইতে পারে না' এবং সৎ হইতেও সতের সৃষ্টি হইতে পারে না কারণ সৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইলে সতের সত্যত্ব নষ্ট হয় কারণ 'সৎ' বলিতে ইহাই বুঝায় যে 'যাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই' তাহাই সুতরাং সেই সৎ যদি উৎপন্ন হয় বলা হয় তাহা হইলে তাহাকে আর সৎ বলা কিরূপে যায়? এবং 'সৎ' হইতে 'অসৎ' সৃষ্টি হওয়া 'অসম্ভব' সুতরাং 'সৎ অথবা অসৎ হইতে সৃষ্টি হয় না' তাহা অসৎকার্য্যবাদী ও সৎকার্য্যবাদী উভয়ের 'অকাট্য যুক্তির' দ্বারা প্রমাণিত হইল। এখন 'সদাসৎ' হইতে সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও বলা যায় না কারণ সৎ অসৎ "পরস্পর বিরুদ্ধ" স্বভাব বলিয়া সদাসৎ বলিয়া কোন পদার্থের 'কল্পনাই' করা যায় না সুতরাং যাহা 'কল্পনার অতীত' তাহা হইতে সৃষ্টি হওয়া একান্তই অসম্ভব। অতএব 'সদসদ্' হইতে ভিন্ন যে 'অনির্ব্বচনীয়' পরিশিষ্ট বস্তু যাহাকে 'মিথ্যা' বলা হয় সেই 'মিথ্যা বস্তু হইতেই সৃষ্টি' হইয়াছে বলিতে হইবে অতএব সেই 'সৃষ্টিও মিথ্যা' হইতে বাধ্য সুতরাং

সৃষ্টির "মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ের" দ্বারা অজাতবাদও নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইল।

অজাতবাদের অন্য যুক্তি এই যে—'যাহা আদি ও অন্তে নাই' তাহা 'মধ্যেও' থাকিতে পারেনা। যেমন রজ্জু সর্প 'ভ্রমের পুর্ব্বে' এবং 'অধিষ্ঠান জ্ঞানের পর', 'ভ্রমনিবৃত্তির পরে' থাকে না', সুতরাং 'মধ্যে ভ্রমকালে'দেখা যাইলেও সেই সর্প রজ্জুতে 'তিন কালেই' অর্থাৎ 'ভ্রমের পূর্ব্বে, ভ্রমকালেও ভ্রমের অন্তে বা নিবৃত্তিতে থাকে না ইহা সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সেইরূপ এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইবার'পূর্ব্বে ও অন্তে', 'প্রলয়কালে' থাকে না, কেবল মধ্য অধ্যাস সময়ে 'দৃশ্য' হয় বলিয়া তাহা সত্য নহে—তাহা রজ্জু সর্পের মত তিন কালেই নাই তাহার সম্বন্ধে বেশী বলাই বাহুল্য।

এখন এই 'জীবরূপ কর্ত্তা', 'মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়া' এবং পরস্পরের 'বিভিন্ন বিষয় সমূহকে' অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয় এবং অন্তর বহিঃইন্দ্রিয় সমুদয়কেও 'এক প্রযত্নদ্বারা' **চৈতন্যময় যিনি প্রকাশ** করিয়া থাকেন তাঁহাকে **বেদান্তে সাক্ষী** বলা হয় অর্থাৎ আমি দেখিতেছি, শুনেতেছি, শুঁকীতেছি, আস্বাদন করিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, এই প্রকারে 'অনুব্যবসায়রূপে নির্ব্বিকার' থাকিয়া **দীপের ন্যায় সকলকে প্রকাশ করেন তিনিই সাক্ষী।**

এখন দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত আভাস চৈতন্যরূপ **জীবভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য** তাহাই বেদান্ত শাস্ত্রে **"কুটস্থ"** শব্দের অভিপ্রেত অর্থ। আর **সমস্ত জগৎ ভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য তিনিই ব্রহ্ম শব্দের লক্ষিত অর্থ।**

'কূটস্থ নির্ব্বিকার' থাকেন এবং **'পরিণামের সাক্ষী'** বলিয়া

কূটস্থ পরিণামী হইতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে 'সাক্ষীর চৈতন্য রূপতার' এবং সেই হেতু 'সাক্ষীতার' ভঙ্গ হয় এবং 'জড়ত্ব' প্রাপ্তি ঘটে। 'বিকার বিনা দুঃখানুভব হইতে পারে না', যাহা 'বিকারী' তাহার 'সাক্ষীতা' অসম্ভব; আবার **আত্মা সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী** সেইহেতু **আত্মা সর্ব্বপরিণাম রহিত।** কূটস্থের সাক্ষীতা না থাকিলে 'দেহাদিরূপ জগৎ প্রকাশিত' হইত না। আর জন্ম-মরণাদিরূপ বিকারশীল দেহদ্বয়ের সহিত **চিদাভাস বিকারী।'**

সাক্ষী চৈতন্যের 'বাহ্য স্থানও নাই অন্তর স্থানও নাই।' সেই বাহ্য অন্তর স্থান **'বুদ্ধির স্থান'** মাত্র। বুদ্ধ্যাদিরূপ অশেষ উপাধি বিনষ্ট হইলে তিনি **তথায় স্ব-স্বরূপে প্রকাশমান, তাহাই তাঁহার দেশ।** অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মের যে 'সাক্ষীতা' তাহা 'সাক্ষ্য বস্তুর দ্বারা নিরূপিত' হয়। 'অজ্ঞানই' সেই সাক্ষিতায় 'প্রয়োজক বা উৎপাদক' বলিয়া সেই অজ্ঞান নাশে "তিনিই সাক্ষী" এইরূপ 'ব্যবহার' হইয়া থাকে। এই হেতু সেই 'ব্যবহারই সাক্ষীর নিজস্থান।' 'সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার' অর্থাৎ 'প্রতীতি নিবৃত্ত' হইলে 'দেশেরও প্রতীতি' হয় না সুতরাং তিনি কোনও দেশে অবস্থিত নহেন। "সর্ব্বদেশের কল্পনা" দ্বারাই সাক্ষীর বা আত্মার "সর্ব্বগতত্ব" সিদ্ধ হয়। তাঁহার **স্বরূপতঃ সর্ব্বগতত্ব নাই।** তিনি "দেশাদিকল্পনার অধিষ্ঠান". তাঁহার আপনা হইতে ভিন্ন দেশের অপেক্ষা নাই। **সর্ব্বগতত্বের ন্যায় সর্ব্বসাক্ষিত্ব বাস্তব** নাই। যে 'যেরূপাদি-বস্তু বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত হইবে' সেই সেই বস্তুকে প্রকাশ করিয়া **কূটস্থ তৎসমুদয়ের সাক্ষী হইবেন স্বরূপতঃ তিনি বাক্যবুদ্ধির অগোচর।**

ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায় না অর্থাৎ 'বুদ্ধি বৃত্তির' বিষয় না হইলেও 'শব্দের লক্ষণাবৃত্তির' দ্বারা এবং মনের বৃত্তিব্যাপ্তি' দ্বারা মন প্রভৃতির সাক্ষী "স্বয়ং প্রকাশ" সেই আত্মাকে বুঝা যায়। **আপনার অতিরিক্ত "সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে" তাহার যে নিবৃত্তি অর্থাৎ "প্রতীতির উপশান্তি" হয়, সেই নিবৃত্তির পর আত্মাই সত্যরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যান।** সেই আত্মবিষয়ে 'প্রমাণাপেক্ষা নাই', কেননা তাহা 'স্বপ্রকাশরূপ' তথাপি উত্তমাধিকারীর 'স্বানুভব' কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরু মুখে 'শ্রুতি শ্রবণেই হয়'—আর মন্দবুদ্ধি অধিকারীর গুরুপদেশানুসারে 'বুদ্ধিকে লক্ষ্য' করিয়া 'বাহ্য ও অন্তর ধর্ম্মসহিত বুদ্ধির দর্শন ছাড়িয়া' সাক্ষীরূপাতাহেতু বুদ্ধির সমীপস্থিত বলিয়া 'যেন বুদ্ধির অধীন'—**পরমাত্মাকে স্বস্বরূপে (সাক্ষীরূপে) অনুভব করেন।**

জ্ঞানীর কৃত কৃত্যতা—'পূর্ব্বে-অজ্ঞানাবস্থায়' এই জ্ঞানী ঐহিক সুখভোগ সমূহের জন্য, পারলৌকিক ভোগের সিদ্ধির জন্য, আর মুক্তির জন্য 'অনেক কর্ত্তব্য' ছিল এখন অর্থাৎ 'জ্ঞানোদয়ে' (সাধ্যবস্তুর অভাবে) কৃতের অর্থাৎ সম্পাদিতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জ্ঞানীর যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছেন বলিয়া, যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছেন বলিয়া, 'পাইবার ও জানিবার'জন্য কোন 'ক্রিয়ার' প্রয়োজন নাই এবং জ্ঞানী চৈতন্যস্বরূপ **বিদেহ বলিয়া**—ইন্দ্রিয়াদি **করণবর্গ নাই** বলিয়া—'ক্রিয়া করিবার অক্ষমতার' জন্য **নিস্ক্রিয়। অন্যের দৃষ্টিতে ক্রিয়ামান হইলেও 'আপন দৃষ্টিতে সদাই নিস্ক্রিয়।'** জ্ঞানীর 'শ্রবণ-মননে কর্ত্তব্যতা নাই' কারণ তাঁহার 'অজ্ঞান ও সংশয় নাই বলিয়া।' জ্ঞানীর 'বিপরীত' ভাবনা নাই বলিয়া নিদিধ্যাসনও

করিতে হয় না। জ্ঞানীর 'ব্যবহার নিবৃত্তি প্রারব্ধ নিবৃত্তি' দ্বারা হয়। কিন্তু **জন্ম নাই বলিয়া প্রারব্ধ ও নাই সুতরাং ব্যবহারও নাই** অতএব ব্যবহার নিবৃত্তির জন্য কাহার ও অপেক্ষা নাই, তাহা **নিত্যনিবৃত্ত**। এইহেতু জ্ঞানী 'ব্যবহারকে আত্মজ্ঞান বা মোক্ষের অবাধক' বলিয়া বুঝেন ব্যবহার হ্রাসের উদ্দেশ্যে 'ধ্যানের' আবশ্যকতা বোধ করেন না। জ্ঞানীর 'বিক্ষেপ নাই' বলিয়া 'সমাধিরও' প্রয়োজন নাই; **বিক্ষেপ ও সমাধি উভয় বিকারশীল মনের ধর্ম্ম**। সুতরাং 'জ্ঞান উৎপত্তিনাশ রহিত অকর্ম্মক।' অর্থাৎ **'অনুভাব্যহীন অনুভব'** বলিয়া **'অনুভব স্বরূপ'** বলিয়া তাহার 'পৃথক বা সম্পাদনীয় অনুভব' কোথাও নাই। যাহা 'করনীয় ছিল' তাহা করিয়াছেন; যাহা 'প্রাপ্তব্য ছিল' তাহা পাইয়াছেন এইরূপ 'কৃতকৃত্য ভাব' জ্ঞানীর নিশ্চয় হয়। কৃতকৃত্য জ্ঞানীর 'আচরণের কোন নিয়ম নাই' কারণ **স্বীয় দৃষ্টিতে তাঁহার আচরণই নাই অন্যের দৃষ্টিতে উৎকট প্রারব্ধ বশে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আচরণই সম্ভব।** জ্ঞানী জানেন—তিনি 'অকর্ত্তা নির্লেপ বা অভোক্তা'; প্রারব্ধবশে তাঁহার সকল প্রকার ব্যবহার লৌকিক শাস্ত্রীয় অথবা তদুভয়ের বিরুদ্ধ যে প্রকারই হউক না কেন তাহাতে তাঁহার 'ক্ষতি বৃদ্ধি নাই' জ্ঞানীর শরীর দেবার্চ্চনা স্নান শৌচ বা ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হউক বা তাঁহার বাগিন্দ্রিয় প্রণবরূপে বা উপনিষদ পাঠে নিবিষ্ট হউক, জ্ঞানীর বুদ্ধি বিষ্ণুর ধ্যানই করুক বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক, **সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞানী ইহসংসারে কিছুই করেন না ও কাহাকে কিছুই করান না।**

"সাক্ষী চেতা কেবল নিগুর্ণশ্চ" এখন সর্ব্বসার নিগূঢ় অর্থ এই হয় যে ঃ—যাহা আমরা জানিতে পাই, অর্থাৎ দেখিতে শুনিতে পাই তাহাই 'পরিবর্ত্তনশীল—তাহাই ধর্ম্ম', আর সেই পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের 'নিজ অপরিবর্ত্তনীয় রূপ'—'ধর্ম্মী বা সাক্ষী', তাহা আমরা দেখিতে বা জানিতে পাই না। কোন বস্তুরই পরিবর্ত্তনশীল রূপটী স্থায়ী নহে, তাহার 'জ্ঞানের পরই তাহা আর থাকে না'। এজন্য **তাহা নাই অথচ জ্ঞানের বিষয়** হয়—ইহাই বলা হয়। আর **ইহাই মিথ্যার লক্ষণ**। মিথ্যা বস্তু উপলব্ধ হয় কিন্তু উপলব্ধির অতিরিক্ত কালে তাহার সত্তা নাই।

পরিশর্ত্তনশীলের, ধর্ম্মের—নিজ 'অপরিবর্ত্তনশীল রূপটী'—ধর্ম্মটী অবশ্য সত্য অর্থাৎ সর্বকালেই আছে কিন্তু তাহা আমরা জানিতে পারিনা। 'পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল না থাকিলে 'পরিবর্ত্তনের জ্ঞান' কোনকালে হইত না।

এইজন্যই এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিজ "অপরিবর্ত্তনশীল রূপটী" বৈশেষিকাদিরমতে "পরমানু প্রভৃতি" স্বীকার করা হয় আর সাংখ্যাদির মতে "প্রকৃতি" স্বীকার করা হইয়াছে। কেহ পরিবর্ত্তনশীলের মধ্যগত নিজ "অপরিবর্ত্তনশীলের অস্বীকার" করেন নাই। এখন অপরিবর্ত্তনশীলের পরিবর্ত্তনশীল রূপটী "অসম্ভব অথচ দৃশ্য" হইতেছে বলিয়া এই "পরিবর্ত্তনশীল রূপকে"—ধর্ম্মকে "অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যাই" বলা ভিন্ন—যেমন আর উপায় নাই তদ্রূপ **অপরিবর্ত্তনশীল অদ্বৈত ভাবকে সত্য বলা ভিন্ন আর উপায় নাই।**

অদ্বৈতবাদী দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকার করেন; কিন্তু তাহা 'মিথ্যা বলিয়াই স্বীকার' করেন। বস্তুতঃ এ স্থলেও

অদ্বৈতবাদী ইহাকে "অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা" বলিয়া উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন এবং স্বমতের দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। কারণ তাঁহাদের 'উভয়কেই ভ্রম' বলা হয়, অন্য কথায় 'উভয়ের খণ্ডনকেই 'সত্য' বলা হয়। ভেদাভেদবাদীর 'অভেদ' যখন 'ভেদের বিরোধী নহে' তখন ভেদাভেদবাদীকে 'ভেদবাদী' বলিতে কোন আপত্তিই হওয়া উচিত নহে। অদ্বৈতবাদীর 'অভেদ' ভেদের বিরোধী সুতরাং তাঁহাদের মতে হয়—"ভেদ সত্য" না হয়—"অভেদ সত্য" হইবে। কিন্তু "ভেদ অনির্ব্বচনীয়" "অভেদই সত্য" বলিতে হয়। অতএব কি "ভেদভাব" অথবা কি "অভেদভাব" সকল ভাবই 'জ্ঞেয়'—'ধৰ্ম্ম' হয় বলিয়া সে "সকল গুলিই মিথ্যা" **জ্ঞানস্বরূপ এক অভেদ অদ্বৈতই (ধৰ্ম্মীই) সত্য** বলিতে হইবে।

ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্মীতে "অধ্যাসিক" সম্বন্ধে থাকে অর্থাৎ ধৰ্ম্মীরূপ সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়, দেহ ও বাহ্য বিষয় সমূহ এবং ইহাদের গুণ ও ধৰ্ম্ম সমূহ ক্রমে "আরোপিত" হইয়া থাকে। সেই সকল অধ্যাসের মধ্যে "পূর্ব্ব পূর্ব্ব" অধ্যাস বিশিষ্ট যে আভাস চৈতন্য তাহা "উত্তরোত্তর" অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে হইবে। আত্মার উপর যে বাহ্য বিষয় নিবহের অধ্যাস হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বিবাদ করা উচিত নহে। কারণ লোকতঃই আমরা দেখিয়া থাকি যে পুত্র, ভার্য্যা প্রভৃতি যদি বিকল বা স-কল হয়, তাহা হইলে সকলেই বুঝিয়া থাকে, আমি বিকল বা স-কল হইলাম। যদি বল, "অত্যন্ত স্নেহ" নিবন্ধনই এই প্রকার জ্ঞান পিতাদির হইয়া থাকে। এরূপ "অভিমান" কিন্তু অধ্যাসবশতঃ হয় না তাহাও ঠিক নহে। কারণ "স্নেহও অধ্যাসেরই পরিণাম" তাহা যদি না হয়, তবে সেই পিতাই যখন

বৈরাগ্যবশতঃ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং সেই সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁহার যখন "বিবেকজ্ঞান" হয় তখন কিন্তু সেই পুত্র ভার্য্যাদিতে, তাঁহার পূর্ব্বে যেরূপ স্নেহ ছিল, তাহা থাকে না, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

এ স্নেহ কেন থাকেনা যে হেতু "স্নেহ অধ্যাসমূলক," অধ্যাস যখন নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন অধ্যাস হইতে উৎপন্ন যে 'স্নেহ' তাহাও স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়া বেদান্ত বাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসীর যখন আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হয়, তখন সেই "আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বশতঃই" তাহার 'স্নেহের মূলীভূত কারণ যে অধ্যাস', তাহা শিথিলতাকে প্রাপ্ত হয়।

"মূল কারণ অধ্যাসের" শৈথিল্য বশতঃ সেই কালে তাহার স্নেহাদিও শৈথিল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই স্নেহ যদি "বাস্তব" হইত অর্থাৎ "অধ্যাস মূলক" না হইত তাহা হইলে 'বিবেক জ্ঞান দ্বারাই' তাহার অপগম সম্ভবপর হইত না। "জ্ঞানই" 'অজ্ঞানের নিবর্ত্তক' হইয়া থাকে।

যাহা, যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া মনে করাকে "অধ্যাস" বলে।

সেই অধ্যাসের 'দ্বিবিধ' আকার—'স্বরূপাধ্যাস' ও 'সম্বন্ধ বা ধর্ম্মাধ্যাস'—'আমি' ও 'আমার'—অর্থাৎ **যাহা আমি নই তাহাকে আমি বলিয়া মনে করা 'স্বরূপাধ্যাস' এবং যাহা আমার নহে তাহাকে আমার বলিয়া মনে করা 'সম্বন্ধাধ্যাস'**—স্বরূপাধ্যাস —নিজের দেহকে প্রদর্শিত করিয়া মুখে 'আমি' এইরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা যে 'তাদাত্ম্যাধ্যাস' হইয়া থাকে তাহাই বুঝায়; 'আমি কৃশ'

'আমি কৃষ্ণবর্ণ' এইরূপ ব্যবহার সমূহেও 'দেহ ধর্ম্ম' কৃষ্ণত্বাদির আত্মাতে যে অধ্যাস হয়, তাহাও প্রসিদ্ধ আছে। 'আমি মূক' 'আমি বক্তা' 'আমি অন্ধ' 'আমি দ্রষ্টা' এইরূপ ব্যবহার স্থলে 'ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম' আত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে ঐ সকল ধর্ম্মের 'আশ্রয় স্বরূপ যে ইন্দ্রিয়' তাহার অধ্যাস আত্মার উপর হইয়া থাকে, ইহা বলিতে পারা যায় না কারণ, 'ইন্দ্রিয় সমূহ' 'প্রত্যক্ষের গোচর' হয় না। তাহারা 'অনুমেয়'। এই কারণে আত্মার উপর তাহাদের যে 'অপরোক্ষ অধ্যাস,' তাহা হইতে পারে না। 'আমি কামী' 'আমি ক্রোধী'—এই সকল ব্যবহারে অন্তঃকরণের ধর্ম্মসমূহ 'আত্মাতে অধ্যস্ত' হইয়া থাকে। কামাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নয়, কিন্তু আত্মারই ধর্ম্ম এইরূপ বলা যায় না। কারণ 'অন্তঃকরণ থাকিলেই' তাহাদিগের 'সদ্ভাব' দেখা যায়, 'অন্যথা নহে'। শ্রুতিতে অন্তঃকরণকে 'কাম সঙ্কল্প' ইত্যাদিকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং কামাদি **'অন্তঃকরণের ধর্ম্ম' আত্মার ধর্ম্ম নহে**। 'আত্মাতেই' ঐ সকল ধর্ম্ম 'আরোপিত' হইয়া থাকে। ইহার নাম 'সম্বন্ধের আরোপ।' 'অন্তঃকরণ কিন্তু নিজের সাক্ষী' যে আত্মা, তাহাতে 'অভিন্ন ভাবে' অধ্যস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অধ্যাসকে 'ঐক্যাধ্যাস' বলা হয়। ইহা 'সম্বন্ধাধ্যাস নহে'। এইরূপ যদি না হইত অর্থাৎ 'অধ্যাস' যদি না হইত তাহা হইলে 'কেবল' অর্থাৎ 'শুদ্ধ সাক্ষী' তাহার **'আমি'** এইরূপ যে **'অভিমান বিশিষ্টরূপে প্রতীতি,'** তাহা কখনই সম্ভবপর হইত না।

মন 'ইন্দ্রিয় বেদ্য' নহে কিন্তু 'সাক্ষী বেদ্য' সেই সাক্ষী হইল আমাদিগের **'প্রত্যগাত্মা'**। সেই **'প্রত্যগাত্মাতেই'**—'অনাত্মভূত

অন্তঃকরণ' প্রভৃতিতে 'ঐক্যের' অধ্যাস হইয়া থাকে এবং 'সেই কারণেই' অহঙ্কারাদিতেও 'চৈতন্যের' উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ অহঙ্কার প্রভৃতি বস্তু 'স্বতঃ চেতন' না হইলেও চিদাত্মা যে সাক্ষী তাহারই 'তাদাত্ম্যাধ্যাস' ঐ সকল বস্তুর উপর হইয়া থাকে বলিয়াই ঐ সকল বস্তু 'অগ্নি সংযুক্ত লৌহপিণ্ড' যেমন 'অগ্নি' বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ 'চেতন' বলিয়া প্রতীত হয়। 'কেবল' অন্তঃকরণেই 'শুদ্ধ আত্মার অধ্যাস' হইয়া থাকে। 'ইন্দ্রিয়াদিতে' কিন্তু 'আত্মাধ্যাস বিশিষ্ট' যে 'অন্তঃকরণ' তাহাই আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু 'চৈতন্যই' ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা 'অবিচ্ছিন্ন' হইয়া প্রকাশিত হন, 'অন্তঃকরণ হয় না'। সেই চৈতন্যকেই 'সাক্ষী বা ধর্ম্মী' বলা হয়।

এখন সাক্ষীর 'নিত্যত্ব', 'ব্যাপকত্ব', 'স্বপ্রকাশত্ব' ও 'অসঙ্গত্ব' ইহা 'শ্রুতি', 'স্মৃতি', 'যুক্তি' ও 'আনুভাবিক' প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে :—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

অর্থাৎ 'এক' 'অদ্বিতীয়' আত্মদেব সর্ব্বশরীর মধ্যে গূঢ় হইয়া স্থিত তথা সর্ব্বব্যাপী তথা সর্ব্বভূত 'অন্তর আত্মা', তথা অপূর্ণরূপ 'কর্ম্মফল দাতা' তথা সর্ব্বভূতের 'অধিষ্ঠান' তথা বুদ্ধিরাদি 'সর্ব্ব-সংঘাতের সাক্ষী' তথা 'চৈতন্যরূপ' তথা 'অদ্বিতীয়রূপ' তথা 'নির্গুণ' ও 'নিষ্ক্রিয়' হন। এই শ্রুতির 'স্থাবর জঙ্গম' রূপ সর্ব্বশরীরে সম্বন্ধ যুক্ত 'এক' 'নিত্য' 'বিভু' আত্মাকে বুঝাইয়াছেন। যাহা 'অতীত' 'ভবিষ্যৎ' ও 'বর্ত্তমান' এই 'তিন কালে' বিদ্যমান তাহাকে 'নিত্য'

বলা হয়। এই 'নিত্যের লক্ষণ' সাক্ষীরূপ আত্মাতে পাওয়া যায় কিনা তাহার আলোচনা করা যাক :—'ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান' এই তিন কালের মধ্যে 'জগৎ মণ্ডলবর্ত্তী যত দেহ আছে সেই 'সব দেহ' যাঁহার হয় তাঁহাকে 'দেহী' বলা হয়। সেই 'এক দেহী আত্মা' 'বিভু' হন বলিয়া 'সর্ব্বদেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে' সেইজন্য 'এক চেতন আত্মা কর্ত্তৃক' সর্ব্বশরীরে নানা প্রকার চেষ্টা সিদ্ধ হইতে পারে। 'দেহী এক' বুঝাইবার জন্য ভগবান গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোকে আত্মাকে **'দেহিনঃ'** এই পদে **'একবচন'** প্রয়োগ করিয়াছেন।

'প্রতিদেহে' 'আত্মা ভিন্ন' ইহার কিঞ্চিৎমাত্র 'প্রমাণ শ্রুতিযুক্তি সিদ্ধ' নাই। এইরূপ 'এক দেহী আত্মার' যেমন এই বর্ত্তমান দেহে বাল্য অবস্থা, যৌবন অবস্থা, বৃদ্ধ অবস্থা এই পরস্পর 'বিরুদ্ধ তিন অবস্থা' হয় সেই বাল্যাদি 'তিন অবস্থার ভেদে' সেই 'দেহী আত্মার ভেদ' হয় না কারণ 'যে আমি' 'পূর্ব্বে' বাল্য অবস্থায় আপন পিতা-মাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম 'সেই আমিই' 'এখন' বৃদ্ধাবস্থায় আপন পুত্রপৌত্রাদিকে অনুভব করিতেছি। এই **'প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের'** জন্য বাল্য অবস্থায় আত্মা তথা বৃদ্ধ অবস্থায় "আত্মার **অভেদই সিদ্ধ** হয়।" আর 'বাল্য অবস্থার শরীর' তথা 'বৃদ্ধ অবস্থায় শরীরের' 'ভেদ ত' সকলের প্রত্যক্ষই প্রতীত হয়, সুতরাং **দেহের ভেদে আত্মার ভেদ হয় না**। এইরূপ জন্মাদি 'বিকার রহিত' আত্মাকে এই শরীর হইতে 'অত্যন্ত বিলক্ষণ' শরীর প্রাপ্তি 'স্বপ্নে' তথা 'যোগের' প্রভাব জন্য ঐশ্বর্য্যে হয়। তথায় সেই সেই 'দেহের ভেদ' প্রতীতি হইলেও 'সেই আমি' হই এইরূপ 'প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের' বলে 'আত্মার একতাই' সিদ্ধ হয়। যদি কদাচিৎ এই 'স্থূল দেহই' আত্মা হইত

তাহা হইলে বাল্য যৌবনাদির 'অবস্থার' ভেদে **'আত্মার'** ভেদ সিদ্ধ হইত সুতরাং 'সেই আমি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান না হওয়া উচিত। কারণ **'অন্যের সংস্কার'** অন্য পুরুষের **'প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের' কারণ হয় না** কিন্তু **'এক অধিকরণে বর্ত্তমান যে 'সংস্কার ও ' প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান' তাহাদের পরস্পর 'কারণ কার্য্য'** ভাব হয়। কিন্তু চার্ব্বাকাদির মতানুসারে যদি বলা হয় যে **'বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ'** এই 'তিন অবস্থার' ভেদ হইলেও 'তিন অবস্থার ধর্ম্মের' যে **'আশ্রয়' যে দেহ** হয় সেই দেহ বাল্য অবস্থা হইতে বৃদ্ধ অবস্থা **পর্য্যন্ত** 'একই থাকে' **সেই 'দেহের একতাকেই'** সেই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান বিষয় করে। 'আত্মার একতা' সেই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান বিষয় করে না। এইরূপ বলাও যায় না কারণ **'স্বপ্নের' দেহ 'জাগ্রতের' দেহ হইতে ভিন্ন** হয়। আর 'যোগের প্রভাবে' যোগী অনেক দেহ রচনা করেন। সেইখানে ধর্ম্মীরূপ **'দেহেরই ভেদ'** হয় সেইজন্য তথায় 'সেই আমি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান না হওয়া উচিত কিন্তু **'সেই আমি'** অর্থাৎ যে **'আমি স্বপ্নে ছিলাম' 'সেই আমি জাগ্রতে আছি'** এইরূপ 'প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান' হয় সেইরূপ যোগী পুরুষেরও **'সমস্ত দেহে.' 'আমিই দেহী'** এইরূপ 'প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান' হয় সুতরাং 'দেহের একতাকে' সেই প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান বিষয় করে না। অতএব **প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানের জন্য আত্মার একতা স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।**

যেমন জন্মাদি 'বিকার' রহিত 'একই আত্মা' কৌমারাদি **'তিন অবস্থা'** প্রাপ্ত হন সেইরূপ 'বর্ত্তমান দেহ' হইতে প্রাণ উৎক্রমণের অনন্তর অন্য দেহ প্রাপ্তি হয়। তথায় যেমন বাল্যাদি 'তিন অবস্থার'

প্রতীতিকালে' 'সেই আমি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান হয় সেইরূপ 'মরণের পর' অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া 'সেই আমি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের দ্বারা 'জাতিস্মর' ব্যতীত অন্যের যদ্যপি তথায় পূর্ব্ব উত্তর দেহে' আত্মার একতা সিদ্ধ হয় না তথাপি 'যুক্তির' দ্বারা তথায় আত্মার একতা সিদ্ধ হইতে পারে।

সেই 'যুক্তি' এই হয় যে—'সদ্যজাত' অর্থাৎ মাতার উদর হইতে বাহির হইয়াছে এইরূপ শিশু, সেই শিশুর সেই সময়েই 'হর্ষ শোক, ভয়, আদি' প্রাপ্তি হয়। সেই হর্ষ শোকাদির প্রাপ্তির অন্য কোনও কারণ 'এই জন্মে' সম্ভব নাই কিন্তু কেবল 'পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই' সেই হর্ষ শোকাদির কারণ হয়। যদি কদাচিৎ 'পূর্ব্বজন্মের সংস্কার' অঙ্গীকার না করা যায় ত সদ্যজাত শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়াই মাতার স্তন্যপানাদি বিষয়ে 'প্রবৃত্তি' হয়, শিশুর সেই প্রবৃত্তি না হওয়া উচিত কারণ 'চেতন প্রাণির যখনই প্রবৃত্তি' হয় তখনই সেই 'প্রবৃত্তি' এই বস্তু আমার 'ইষ্ট সাধন' এই প্রকার 'ইষ্টসাধনতা জ্ঞান' হইতে জন্মায়। 'ইষ্টসাধনতা জ্ঞান' বিনা কোনও প্রবৃত্তি হয় না। শিশুর যে মাতার স্তন্য পানে 'প্রথম প্রবৃত্তি' হয় সেই প্রবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে স্তন্যপান আমার 'ইষ্ট সাধন' এই প্রকার 'ইষ্টসাধনতা জ্ঞান' সেই শিশুর অবশ্য হয় ইহা মানা উচিত। আর এই জন্মে' সেই শিশুর সেই ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানের অনুভব সম্ভাবনা নাই কিন্তু সেই 'ইষ্ট সাধনতা' জ্ঞান 'স্মৃতিরূপ' মানা উচিত। আর যখনই স্মৃতি জ্ঞান হবে তখনই 'অনুভব জন্য সংস্কার' দ্বারা হইবে, 'সংস্কার বিনা স্মৃতিজ্ঞান' হয় না। সেইজন্য সদ্যজাত শিশুর পূর্ব্বজন্মে মাতার স্তন্যপান আমার 'ক্ষুধা নিবৃত্তিরূপ ইষ্ট সাধন' হয় এই প্রকার

অনুভব বহুবার হইয়াছে সেই "অনুভবজন্য সংস্কার" হইতে সেই শিশুর জন্মকালে সেই 'স্মরণরূপ ইষ্ট সাধনতাজ্ঞান' হয়। ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। আর "অনুবুদ্ধ সংস্কার" হইতে স্মৃতি হয় না কারণ তাহা হইলে 'সর্ব্বকালে' সেই বস্তুর স্মৃতি হওয়া উচিত কিন্তু 'সর্ব্বকালে স্মৃতি হয় না' কিন্তু 'উদ্বুদ্ধ' হইয়াই 'সংস্কার স্মৃতিজ্ঞান' উৎপন্ন করে। পাপপুণ্যরূপ 'অদৃষ্ট' দ্বারাই 'সংস্কার উদ্বুদ্ধ' হয়। সেইজন্য পাপপুণ্যরূপ 'অদৃষ্টই জন্মকালে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ' করে। আর সেই 'পূর্ব্বজন্মের সংস্কার' তথা 'পাপপুণ্যরূপ অদৃষ্ট' 'আত্মারূপ আশ্রয়' বিনা 'স্বতন্ত্র' থাকিতে পারে না। সুতরাং 'পূর্ব্বজন্মে আত্মার বিদ্যমানতা অঙ্গীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এইরূপ 'যুক্তির দ্বারা' এবং 'জাতিস্মর দ্বারা' 'পূর্ব্ব উক্ত শরীরে 'আত্মার একতা সিদ্ধ হয়।'

যেমন 'একই দেহ' ক্রমে দেহের বাল্যাদি 'অবস্থার' 'উৎপত্তি বিনাশ' হইলেও 'আত্মা নিত্য হন বলিয়া তাঁহার 'ভেদ নাই' সেইরূপ 'বিভু হন' বলিয়া 'একই আত্মার' 'একই কালেই' সর্ব্বদেহের প্রাপ্তি হয়। এখন আত্মাকে দেহাদির ন্যায় 'মধ্যম' পরিমাণ মানিলে আত্মার দেহাদির ন্যায় 'অনিত্যতা' প্রাপ্ত হইবে আর আত্মাকে যদি 'অণুপরিমাণ' বলিয়া মানিলে সর্ব্বশরীর 'ব্যাপক' সুখদুঃখের প্রতীতি না হওয়া উচিত। এই দুই দোষ অর্থাৎ 'অনিত্যতা' ও 'সর্ব্বশরীর ব্যাপক সুখদুঃখের অপ্রতীতিরূপ' দোষ নিবৃত্তি করিবার জন্য 'আত্মাকে বিভু' মানা উচিত। আর সর্ব্বশরীরে 'অহম অস্মি' 'অহম্ অস্মি' এই প্রকার 'একাকার' প্রতীতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য 'সর্ব্বশরীরে একই আত্মা

ব্যাপক হন্।' সুতরাং সর্ব্বশরীরে **'আত্মার একতা সিদ্ধ' হইল।** আত্মার একতা **'শ্রুতি সিদ্ধ'** যাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যথা—'একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি'—অর্থাৎ একটী আত্মদেব সর্ব্বভূত প্রাণি মধ্যে ব্যাপক তথা কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নির-ন্যায় গুহ্য। তথা সর্ব্বভূত প্রাণির অন্তর আত্মা হন।

এইরূপ আত্মার 'নিত্যত্ব' ও 'বিভুত্ব' সিদ্ধ করা হইল। 'আত্মার নিত্যত্ব ও বিভূত্ব সিদ্ধ হইল' বলিয়া চার্বাকাদির 'স্থূল দেহাত্মবাদ' 'ইন্দ্রিয়াত্মবাদ' 'প্রাণাত্মবাদ' 'মনাত্মবাদ' 'ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদ', দিগম্বর 'দেহ পরিণাম বাদ' 'অণুপরিণামবাদ' ইত্যাদি **সর্ব্বমত খণ্ডন হইল।**

আত্মা 'নিত্য ও বিভু' ইহা প্রমাণিত হইলেও **'একজনের সুখ দুঃখাদি** অন্যের কিম্বা সকলের হয় না' বলিয়া 'আত্মার একত্বের সংশয়' হয়। অর্থাৎ 'সর্ব্বদেহে আত্মা এক' ইহার সংশয় হয় (কারণ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংস্কার এই 'নবগুণ'যুক্ত 'নিত্য বিভু আত্মা' 'প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হয়' ইহা বৈশেষিক তার্কিক মীমাংসকাদি অঙ্গীকার করেন। আর আত্মাকে 'নির্গুণ মানিয়াও' সাংখ্যশাস্ত্র 'প্রতি শরীরে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন' ইহ অনঙ্গীকার করেন না। একজনের সুখদুঃখাদি সকলের অনুভব হয় না বলিয়া এই যুক্তির বলেই বৈশেষিকাদি আত্মা প্রতি শরীরে 'ভিন্ন ভিন্ন' প্রমাণ করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ যাহার দ্বারা 'বিষয় জানা' যায় তাহাকে 'মাত্রা' বলে। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় জানা যায়। সুতরাং 'ইন্দ্রিয় মাত্রা' এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 'সংযোগকে মাত্রা স্পর্শ' বলা হয়। অন্য কথায় 'বিষয়াকার অন্তঃকরণের পরিণাম' রূপ 'বৃত্তিকে'

মাত্রা **স্পর্শ**' বলা হয়। কৌষীতকি উপনিষদে দশ ইন্দ্রিয়কে '**প্রজ্ঞা** মাত্রা' বলা হইয়াছে আর নামাদি 'দশ বিষয়কে' 'ভূতমাত্রা' বলা হইয়াছে। সেই বাগাদি দশ ইন্দ্রিয়কে ও নামাদি দশ বিষয়কে মাত্রা শব্দ বলা হইয়াছে। আর ইন্দ্রিয় বিষয়রূপ মাত্রার যে পরস্পর 'বিষয় বিষয়ী' 'সম্বন্ধ' তাহা 'মাত্রা **স্পর্শ**' বলা হইয়াছে। অথবা মাত্রা এই তৃতীয়া বিভক্ত্যান্ত 'প্রমাতাবাচক' ভিন্ন ভিন্ন পদ বলিয়া মানা উচিত সেই প্রমাতার সহিত বিষয় ইন্দ্রিয়ের 'সম্বন্ধের' নাম 'মাত্রাস্পর্শ।'আগমপায়ী 'অন্তঃকরণেরই' সেই মাত্রাস্পর্শ শীত উষ্ণাদির প্রাপ্তিদ্বারা সুখদুঃখের প্রাপ্তি করে। **সর্ব্বত্রব্যাপক নিত্য আত্মাকে সেই 'মাত্রাস্পর্শ সুখদুঃখ প্রাপ্তি করে না'** কারণ সেই নিত্য আত্মা '**নিগু´ণ**' আর **'নির্ব্বিকার' হন**। 'সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গু´ণশ্চ' অর্থাৎ আত্মদেব সর্ব্ব সাক্ষী তথা চেতন অদ্বিতীয় নির্গু´ণ ও নিষ্ক্রিয় হন। এইরূপ 'নির্ব্বিকার নিত্য আত্মার' 'অনিত্য অন্তঃকরণের' 'সুখদুঃখাদির ধর্ম্মের' 'আশ্রয়তা' সম্ভব নহে কারণ 'ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী' এই দুইএর 'অভেদই' হয়। অভেদ বিনা অন্য কোন সম্বন্ধ সম্ভব নহে। সেই **নিত্য অনিত্যের অভেদ বলা অত্যন্ত বিরুদ্ধ** হয় সুতরাং **সুখদুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে**। আর সুখদুঃখাদিরূপ **'সাক্ষ্য পদার্থ' সাক্ষী আত্মার ধর্ম্ম** হওয়া কদাচিৎ সম্ভব নহে সেইজন্য ইহা সিদ্ধ হইল যে সুখদুঃখাদি ধর্ম্মের 'আশ্রয়' কেবল 'অন্তঃকরণই,' আত্মা সেই সুখদুঃখের ধর্ম্মের আশ্রয় নহেন। সেই অন্তঃকরণ প্রতি শরীরে **'ভিন্ন ভিন্ন'** হয় সেই অন্তঃকরণের ভেদ অঙ্গীকার করিয়াই 'কাহার সুখ', 'কাহার দুঃখাদির' ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং 'সুখদুঃখাদির ব্যবস্থার অনুপপত্তিতে' প্রতি শরীরে আত্মার ভেদ মানা অত্যন্ত অসঙ্গত।

কিম্বা 'সর্ব্বজগতের প্রকাশক' তথা জন্মাদি 'বিকার রহিত' যে আত্মা সেই **আত্মা 'সৎরূপে' 'তথা' 'স্ফুরণরূপে' সর্ব্বপদার্থে 'অনুগত' হইয়া** প্রতীতি হইতেছেন সুতরাং সেই **'সত্তাস্ফুরণরূপ' আত্মার ভেদ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই** কিন্তু তৎ বিপরীত "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়" ইত্যাদি 'অনেক শ্রুতি' 'আত্মার অভেদ' বিষয়েই প্রমাণ। সুখদুঃখাদির প্রতি অন্তঃকরণের কারণতা 'নৈয়ায়িক' ও 'সিদ্ধান্তী' উভয়ে অঙ্গীকার করেন। তথাপি নৈয়ায়িক 'মনরূপ' 'অন্তঃকরণকে' সুখদুঃখাদি ধর্ম্মের 'নিমিত্ত কারণ' মানেন। আর সিদ্ধান্তে 'অন্তঃকরণ' সুখদুঃখাদির 'উপাদান কারণ' বলিয়া মানা হয়। তথা 'সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' ইত্যাদি শ্রুতি আত্মাকে নির্গুণ বলিয়াছেন সেইজন্য নির্গুণ আত্মার' গুণের সমবায়ি কারণতা বলা শ্রুতি বিরুদ্ধ'। আর 'অন্তঃকরণ বিনা' অন্য কোনও পদার্থে সুখদুঃখাদির 'সমবায়ি কারণতার' সম্ভব নহে। আর নিমিত্ত কারণতাপেক্ষা সমবায়ি কারণতা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব নৈয়ায়িকেরও অন্তঃকরণকে সুখদুঃখাদি ধর্ম্মের উপাদান কারণ অসিদ্ধ নহে কিন্তু শ্রুতি প্রমাণেও সিদ্ধ। সেই শ্রুতি— 'কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং এবেতি মনঃ' অর্থাৎ ইচ্ছাদি এই সব 'মন' রূপই হয়। এই শ্রুতি কামাদিক 'বিকারকে মনের সহিত অভেদই বলিয়াছেন' 'মনকেই' সেই কামাদি বিষয়ের 'উপাদান কারণত্ব' বলা হইয়াছে। আর 'আত্মাকে স্বপ্রকাশজ্ঞান আনন্দরূপতা' করে অনেক শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব **স্পর্শরূপ সুখদুঃখাদি অবিকারী আত্মার' কিঞ্চিৎমাত্র ও হানি** করিতে পারে না। দুঃখাদি ধর্ম্মযুক্ত অন্তঃকরণের 'তাদাত্ম' অধ্যাস করে আত্মার দুঃখাদি 'মানা উচিত নহে।'

'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি'। এই শ্রুতি দ্বারা সর্ব্ব-শরীরে 'আত্মার একতা' প্রতিপন্ন করে। এই শ্রুতির অর্থ :—স্বপ্নাবস্থায় সূর্য্যাদিক জ্যোতির অভাব হইলেও এই আত্ম পুরুষই 'স্বয়ং জ্যোতি' হন ইতি। এই শ্রুতি প্রমাণে 'স্বপ্রকাশরূপ' করিয়া সিদ্ধ যে চেতন আত্মা সেই চেতন আত্মা সর্ব্বশরীর রূপ পুরমধ্যে নিবাস করেন বলিয়া শ্রুতি ভগবতী সেই 'চেতন আত্মাকে 'পুরুষ' এই নামে বলিয়াছেন। অথবা 'অষ্টপুরে' যে নিবাস করে তাহাকে পুরুষ বলা হয়। সেই অষ্টপুর এই ঃ—(১) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (২) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (৩) অন্তঃকরণ চতুষ্ট (৪) পঞ্চপ্রাণ (৫) পঞ্চভূত (৬) কাম (৭) কর্ম্ম (৮) তম। "স বায়ং পুরুষঃ সর্বাসুপূর্বু পরিবাশয়ঃ" অর্থাৎ এই চেতন আত্মা শরীরাদিরূপ 'সর্ব্বপুরিতে নিবাস' করেন বলিয়া 'পুরুষ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"এষ নিত্য মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্ধতে কর্মণা নো কণীয়ান্" অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ ব্রাহ্মণের এই নিত্য মহিমা হয় যে 'পুণ্যকর্ম্ম' করিয়া 'সুখবৃদ্ধি' প্রাপ্ত হন না আর 'পাপকর্ম্ম' করিয়া দুঃখরূপ কনিষ্ঠতাকে' প্রাপ্ত হন না। এই শ্রুতিতে **আত্মার সুখদুঃখ দুই ধর্ম্মেরই নিষেধ** করা হইয়াছে। তাহার দ্বারা কাম সংকল্পাদি 'সর্ব ধর্ম্মে নিষেধ' মানা উচিত। আর সেই স্বয়ং জ্যোতিআত্মা নিজ 'চিদাভাস' দ্বারা বুদ্ধির সহিত "তাদাত্ম্য অধ্যাস" প্রাপ্ত হইয়া সেই 'বুদ্ধিকে শুভাশুভ কার্য্যে প্রেরণা করেন' বলিয়া **'বুদ্ধির প্রেরক সাক্ষী আত্মাকে'** 'ধীর' এই নামে বলা হয়। 'সধী স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি' অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মদেব স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া এই জাগ্রতকে পরিত্যাগ করেন ইহার দ্বারা আত্মাতে 'বন্ধনের প্রসক্তি' অর্থাৎ

'আরোপ' দেখান হইল। 'যতো মানানি সিধ্যন্তি জাগ্রদাদিত্রয়ং তথা। ভাবাভাববিভাগশ্চ স ব্রহ্মাস্মীতি বোধ্যতে'—অর্থাৎ যে স্বয়ংজ্যোতি আত্মা প্রত্যক্ষাদি 'সর্বপ্রমাণ সিদ্ধ' ও জাগ্রদাদি 'তিন অবস্থা সিদ্ধ' তথা এই 'ভাব পদার্থ' এই 'অভাব' ইত্যাদি 'ভেদ সিদ্ধ' হয় সেই 'সাক্ষী আত্মাই' 'ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মহাবাক্যে বলা হইয়াছে।

'স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ' 'সর্ববিকারের প্রকাশক' সুতরাং তাঁহার 'বিকার' হইতে পারে না। এই বিষয় শ্রুতি :—'সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈবাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্য ইতি।' অর্থাৎ যেমন সর্বলোকের চক্ষু যে সূর্য্য ভগবান সেই সূর্য্য ভগবান চক্ষুর বিষয় বাহ্য দোষে লিপমান হন না তেমনই 'এক অদ্বিতীয় রূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা' বাহ্য লোকদুঃখ দ্বারা 'লিপমান' হন না। এই কারণে সেই ধীরপুরুষ আপনার স্বরূপভূত **'ব্রহ্মাত্মার একতাজ্ঞান'** করিয়া 'সর্ব্বদুঃখের উপাদান কারণরূপ' **অজ্ঞানের নিবৃত্তিপূর্ব্বক** 'অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ **পরমানন্দরূপ' মোক্ষ** প্রাপ্তির 'যোগ্যতা' প্রাপ্ত হন। যদি কদাচিৎ এই স্বয়ং জ্যোতি আত্মা 'আরোপিত বন্ধনের' 'আশ্রয় না হন' ত কিন্তু 'স্বাভাবিক বন্ধনের' আশ্রয় হন তাহা হইলে 'ধর্ম্মীর নিবৃত্তি' বিনা 'স্বাভাবিক ধর্ম্মের নিবৃত্তি' হয় না। আর 'আত্মানিত্য' সেইজন্য আত্মার 'কদাচিৎ নিবৃত্তি সম্ভব নাই' তাহা হইলে 'আত্মা কদাচিৎ মুক্ত হইবে না।' 'বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে' 'জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যম' ইত্যাদি 'জ্ঞানেই মোক্ষ' প্রাপ্তি বর্ণিত অনেক 'শ্রুতির বিরোধ' হইবে। অতএব **আত্মার স্বাভাবিক বন্ধন নাই বুদ্ধি আদি উপাধিকৃত বন্ধন** তথায় শ্রুতি :—'আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।'

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মনরূপ 'উপাধিযুক্ত আত্মা' 'ভোক্তা' হন এই প্রকার বুদ্ধিমান পুরুষ বলিয়াছেন। এইরূপ আত্মার 'উপাধিকৃত বন্ধন' অঙ্গীকার করিয়া আত্মরূপধর্ম্মীর বিদ্যমান হইলেও 'ঔপাধিক' বন্ধনের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তি হইতে পারে। বাস্তবিক কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিক 'সর্ব্বসংসার ধর্ম্মের সম্বন্ধের প্রতীতি' হয় 'ইহাই আত্মার বন্ধন' আর আপনার 'বাস্তব স্বরূপের জ্ঞানে' যখন আপনার 'স্বরূপের অজ্ঞান নিবৃত্তি' হয়, এবং 'অজ্ঞানের কার্য্যবুদ্ধি' আদি উপাধির নিবৃত্তি হয়, তথা 'উপাধিকৃত সর্বভ্রমের নিবৃত্তি' হয় তখন 'সব দৃশ্য প্রপঞ্চের সম্বন্ধ রহিত' বলিয়া **শুদ্ধরূপ তথা স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপতার সর্বত্র পরিপূর্ণরূপ যে আত্মা সেই আত্মদেবের স্বতঃই কৈবল্যরূপ মোক্ষ হয়।**

আত্মার যে 'অন্তঃকরণাদির প্রকাশকপণা' তাহা সেই 'স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপ' হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু তাহা 'স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপই' হয়। এইরূপ **স্বপ্রকাশকপণা আত্মা হইতে ভিন্ন অন্তঃকরণাদিতে সম্ভব নহে।** যদি বল যে 'বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন' অন্য কোনও জ্ঞান নাই সুতরাং 'বুদ্ধিবৃত্তিই জ্ঞানরূপ হয়।' ইহা ঠিক নহে কারণ 'জ্ঞান সর্ব্বদেশে' তথা 'সর্ব্বকালে' 'অনুগত তথা ভেদক ধর্ম্ম' 'রহিত' সুতরাং সেই **জ্ঞান বিভু তথা নিত্য তথা এক হন।** আর 'বুদ্ধির পরিণামরূপ' 'বৃত্তি' তাহা 'পরিচ্ছিন্ন' তথা 'অনিত্য' তথা 'অনেক' হয়। এইরূপ **বিভু নিত্য এক জ্ঞানের পরিচ্ছিন্ন অনিত্য অনেক বৃত্তিরূপতা সম্ভব নহে।** ইহাতে যদি আবার বল যে 'ঘটজ্ঞান নাশ' হইয়া 'পটজ্ঞান উৎপন্ন' হইতে দেখা যায় অর্থাৎ 'জ্ঞানে উৎপত্তি নাশ' তথা ঘটজ্ঞান পটজ্ঞানরূপ 'ভেদ' দেখা যায় অতএব

জ্ঞান, বিভু নিত্য ও এক কিরূপে হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলা যায় যে 'সেই প্রতীতি **জ্ঞানের উৎপত্তি নাশকে বিষয় করে না'** কিন্তু 'সাক্ষী আত্মরূপ জ্ঞানের যে ঘটাদি বিষয়ের সহিত বৃত্তি দ্বারা সম্বন্ধ' সেই **'সম্বন্ধের উৎপত্তি নাশাদির'** সেই প্রতীতি বিষয় করে। 'সাক্ষী আত্মরূপ জ্ঞান' নিত্য বিভু ও এক অদ্বিতীয় তাহার শ্রুতি প্রমাণ এই ঃ—'নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টি র্বিপরিলোপ বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ আকাশবৎসর্বগতশ্চ নিত্যঃ মহদদ্ভুতমনন্তমপারং বিজ্ঞান ঘন এব তদেব ব্রহ্মপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্মসর্বানুভূরিতি।' অর্থাৎ 'দ্রষ্টা আত্মার স্বরূপভূত যে জ্ঞানরূপ দৃষ্টি' সেই "দৃষ্টি নাশ রহিত' সুতরাং সেই দৃষ্টির 'কোন অবস্থায় অভাব' হইবে না। আর এই জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আকাশের ন্যায় 'সর্ব্বত্র ব্যাপক' তথা 'নিত্য।' আর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা 'মহানরূপ' তথা 'অনন্ত' 'অপায়' তথা 'বিজ্ঞান ঘন' হন। আর এই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম 'কারণরহিত তথা কার্য্যরহিত' তথা 'অন্তর রহিত তথা বাহ্যপণাতে রহিত' এই **জ্ঞান স্বরূপ আত্মা ব্রহ্মরূপ ইতি।** এইরূপ বহুশ্রুতি আত্মার 'বিভু, নিত্যত্ব স্বপ্রকাশজ্ঞান স্বরূপ' করিয়া বলিয়াছেন।

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—**অবিদ্যারূপ কারণ উপাধিতেই' আত্মার ভেদ সিদ্ধ** হয় সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে 'স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপ **অসত্য উপাধিকৃত** যে 'আত্মার বন্ধন ভ্রম' সেই বন্ধ-ভ্রম যখন **'অধিষ্ঠানরূপ আত্মার জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি'** হয় তখন এই 'স্বয়ং জ্যোতি পুরুষের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়' সুতরাং 'আত্মার একত্বে' কোন দোষ কিঞ্চিৎমাত্রও নাই।

পূর্ব্বে আত্মার নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু সেই 'নিত্যত্ব'

যে কিরূপ তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইতেছে ঃ—'নিত্য তিন রকমের' যথা ঃ—১। 'পরিণামিরূপ নিত্যত্ব' ২।' যাবৎকালস্থায়িত্বরূপ নিত্যত্ব' ৩। 'কূটস্থরূপ নিত্যত্ব'।

১। 'পরিণামিরূপ নিত্যত্ব' বলিতে বস্তুর "অবস্থান্তরকেই" বুঝায় যেমন দেহই বাল্য যৌবন বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইয়াও দেহত্বরূপে বিদ্যমান থাকে—"দেহত্বই পরিণামিরূপ নিত্যত্বের" দৃষ্টান্ত। (২)' যাবৎকাল স্থায়িত্বরূপ নিত্যত্ব' অর্থাৎ 'যতদিন পর্য্যন্ত কাল থাকে' ততদিন পর্য্যন্ত থাকার নাম 'যাবৎকাল স্থায়িত্বরূপ নিত্যত্ব' যেমন 'দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদক' যে 'অবিদ্যাদিক' হয় সেই **অবিদ্যাদিক 'অধিষ্ঠান আত্মায় কল্পিত'** বলিয়া যদ্যপি **'অনিত্য'** হয় তথাপি সেই অবিদ্যাদিক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'গৌণনিত্যপণা প্রতীত' হয়। 'তিন কালে অবাধ্যত্বরূপ নিত্যত্ব' সেই অবিদ্যাদিতে নাই। (৩) আর 'কূটস্থরূপ নিত্যত্ব' অর্থাৎ 'দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ রহিত' বলিয়াই **অকল্পিত যে আত্মা'** সেই আত্মার নাশের কোন কারণ নাই বলিয়াই সেই 'আত্মার মুখ্যকূটস্থরূপ নিত্যত্ব।' 'অবিদ্যাদিকের [illegible] য়' পরিণামরূপ নিত্যত্ব' তথা 'যাবৎকাল স্থায়িত্বরূপ নিত্যত্ব' সেই আত্মাতে নাই। কারণ **আত্মার তাত্ত্বিক পরিণাম** বা **অবস্থান্তর নাই** বলিয়া 'পরিণামিনিত্য নহেন' এবং **ত্রিকালাবাধ্যত্ব বলিয়া** যাবৎকাল স্থায়িত্বরূপ নিত্যত্ব নাই। **আত্মা সর্ব্বব্যাপক বিভু বলিয়া** 'দেশ পরিচ্ছিন্ন নহেন' **কূটস্থ নিত্য বলিয়া** 'কাল পরিচ্ছিন্ন নহেন' এবং **আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ নাই** বলিয়া 'বস্তু পরিচ্ছিন্ন নহেন' তথাপি কেহ কেহ আত্মায় 'বস্তু পরিচ্ছদ'

থাকে ইহা 'কুতর্কের' দ্বারা, নিম্নলিখিত ভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন :—

তাহারা বলেন যে বিভু চৈতন্য 'আত্মার' 'কোনও প্রমাণ আছে অথবা নাই।' তথায় সেই চৈতন্য আত্মার কোন 'প্রমাণ নাই' এই দ্বিতীয় পক্ষ সম্ভব নহে কারণ যে বস্তু কোন 'প্রমাণ জন্য জ্ঞানের বিষয় না হয়' 'সেই বস্তু অসত্যই' হইবে।

তাহা হইলে আত্মার সাক্ষাৎকার জন্য যে শাস্ত্রারম্ভ তাহা ব্যর্থ হইবে। এইরূপ "সর্ব্বদোষের নিবৃত্তির জন্য' দেহী আত্মার কোন প্রমাণ আছে" এই প্রথম পক্ষ অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিম্বা "শাস্ত্র যোনিত্বাৎ" এই সূত্র ব্যাখ্যা করিবার সময় ভগবান ভাষ্যকারও সেই আত্মার সিদ্ধি এক "উপনিষদ শাস্ত্রই প্রমাণ" বলিয়াছেন। তথা "তংত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এই শ্রুতিও আত্মার সিদ্ধি 'উপনিষদ-রূপ প্রমাণ বলিয়াছেন।' সুতরাং 'প্রমাণের বিষয় হন' বলিয়া সেই চৈতন্যরূপ আত্মার "ভেদরূপ বস্তু পরিচ্ছেদ" অবশ্য প্রাপ্ত হইবে। ইহার উত্তর এই যে সর্ব্ব পদার্থ প্রকাশ করেন যে সূর্য্য ভগবান সেই সূর্য্যভগবানের আপনার প্রকাশের জন্য ঘটাদিক 'পদার্থের অপেক্ষা' হয় না সেইরূপ 'প্রমাণ প্রমেয়াদিক' **'সর্ব্বজগতকে প্রকাশ করেন যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ আত্মা'** সেই চৈতন্য আত্মার আপনার 'প্রকাশের জন্য' **'প্রমাণাদির অপেক্ষা হয় না'** কারণ আত্মদেব অপ্রমেয়। সেই শ্রুতি—"এক ধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম প্রমেয়ং ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তিকুতো-ঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। যেনেদং সূর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন

বিজানীয়াৎ।" অর্থাৎ এই চৈতন্য আত্মা 'একপ্রকার' করিয়াই দেখিবার যোগ্য হন তথা এই আত্মদেব 'অপ্রমেয়' হন তথা "কূটস্থ" তথা "অপ্রমেয় হন।" আর সেই স্বয়ং জ্যোতি আত্মাকে সূর্য্য ও প্রকাশ করেনা তথা চন্দ্রতারাগণও প্রকাশ করে না তথা বিদ্যুৎও প্রকাশ করেনা আর সেই স্বয়ংজ্যোতি "আত্মার প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া" "পশ্চাৎ এই সূর্য্যচন্দ্রমাদিক" "সব পদার্থ প্রতীত হয়" যথা সেই আত্মদেবের "স্বয়ং জ্যোতি প্রকাশ করিয়াই" এই সূর্য্য চন্দ্রমাদিক সর্ব্বজগৎ প্রকাশমান হয়।

আর যে "স্বয়ংজ্যোতি" আত্মাদ্বারা এই লোক এই সব পদার্থকে জানে সেই "সর্ব্বদ্রষ্টা বিজ্ঞাতা আত্মাকে এই জীব কি প্রমাণে জানিবে"—কিন্তু "কোনও প্রমাণে জানিতে পারিবে না" এইরূপ স্বয়ংজ্যোতি আত্মায় "আপনার প্রকাশের জন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নাই।" কিন্তু আপনাতে কল্পিত যে অজ্ঞান তথা অজ্ঞানের কার্য্য-তা, "কার্য্য সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য" সেই স্বয়ং জ্যোতি আত্মার কল্পিত "বৃত্তি বিশেষের অপেক্ষা" আছে কারণ—"যেমন যক্ষ হয় সেইরূপ তাহার বলি হয়" সুতরাং "কল্পিত অন্তঃকরণের বৃত্তি" দ্বারা "কল্পিত কার্য্য সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি" সম্ভব হয়। আর "কল্পিত সর্ব্বপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি" করে যে অন্তঃকরণের "বৃত্তিবিশেষ" কেবল তত্ত্বমসি আদিক বাক্য মাত্রতেই উৎপন্ন হয়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ করিয়া উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সেই "বৃত্তিবিশেষের" উৎপত্তির জন্য শাস্ত্রের আরম্ভ সফল। আর সেই চৈতন্য স্বরূপ আত্মদেব "সর্ব্বকালে স্বতঃই প্রকাশমান" তথা "সর্ব্বকল্পনার

অধিষ্ঠান" তথা "সর্ব্বদৃশ্য" প্রপঞ্চের "প্রকাশক" হন। এইরূপ 'স্বপ্রকাশ অধিষ্ঠান আত্মায়' বন্ধ্যা পুত্র, শশশৃঙ্গাদিকের ন্যায় 'অসত্য-রূপতা সম্ভব নহে।'

আর "একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শাস্ত্র অদ্বিতীয় "ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন" "সর্ব্বজগৎকে কল্পিত" বলিয়াছেন। যদি 'শাস্ত্র আপনাকেও কল্পিত না বলিতেন' তাহা হইলে সেই শাস্ত্র সদ্বিতীয় ব্রহ্মকে অদ্বিতীয়রূপ করিয়া বুঝাইলে 'নিজেই অপ্রমাণরূপ' হইয়া যাইবে। 'কল্পিত বস্তু অকল্পিত বস্তুর' "পরিচ্ছেদ" করেনা সুতরাং স্বপ্রকাশ আত্মায় 'ভেদরূপ' "বস্তু পরিচ্ছেদও নাই।"

সর্ব্বকালে আত্মার স্বপ্রকাশতা কেবল 'শ্রুতি' প্রমাণ করিয়া সিদ্ধ নহে কিন্তু ভাষ্যকারের 'যুক্তিতেও' সেই আত্মার 'স্বপ্রকাশতা' সিদ্ধ করিয়াছেন। সেই যুক্তি এই :—যে পুরুষের যে বস্তুতে "সংশয়" "বিপর্য্যয়" "ব্যতিরেক প্রমা" এই তিনের একটিও হয় না সেই পুরুষের সেই বস্তুতে সেই "সংশয়াদির বিরোধী জ্ঞান" অবশ্য করিয়া হইবে। এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র দেখা যায় যেমন যে পুরুষের যে 'ঘট সম্বন্ধে ঘট আছে কি নাই' এই প্রকার "সংশয়" তথা "ঘট নাই" এই প্রকার "বিপর্য্যয়" তথা "ঘট নাই" এই প্রকার "ব্যতিরেক" প্রমা 'এ তিনের একটিও না হইলে' সেই পুরুষের তথায় সেই সংশয়াদি 'তিনের বিরোধী জ্ঞান তথায় না হয়ত' সেই 'সংশয়াদি তিনের মধ্যে কোন একটি অবশ্য হওয়া চাই।' আত্মা সম্বন্ধে কোনও পুরুষের "আমি আছি কি নাই" এই প্রকার 'সংশয়' তথা 'আমি নাই' এই প্রকার 'বিপর্য্যয়' তথা 'আমি নাই' এই প্রকারের 'ব্যতিরেক' প্রমা এই 'তিনের একটিও হয় না' অতএব সর্ব্বপুরুষের সর্ব্বকালে সেই সংশয়াদির

'বিরোধী' আত্মার 'বাস্তব স্বরূপের' জ্ঞান অবশ্য হয় বলিতে হইবে। যদি কদাচিৎ সেই আত্মার 'স্বরূপের জ্ঞান' না হইবে তাহা হইলে সেই 'সংশয়াদি তিনের মধ্যে কোনও একটি অবশ্য করিয়া হওয়া চাই।' আর 'আত্মা সম্বন্ধে সেই সংশয়াদি হয় না' সুতরাং সেই আত্মা সর্ব্বকালে "স্বপ্রকাশ" হন।

বেদান্ত সিদ্ধান্তে সেই 'স্বপ্রকাশজ্ঞান' আত্মার 'আশ্রিত' নহে কিন্তু সেই "স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপই" আত্মা হন। যদি কদাচিৎ আত্মাকে সেই 'জ্ঞানের আশ্রয়' মানা যায় তাহা হইলে যে বস্তু যে জ্ঞানের "আশ্রয়রূপ কর্ত্তা" হয় সেই বস্তু সেই জ্ঞানের "বিষয়রূপ কর্ম্ম" হয় না কিন্তু জ্ঞানের "কর্ত্তা বা কর্ম্ম" "ভিন্ন ভিন্নই" হয় সুতরাং 'সেই জ্ঞানের দ্বারা আত্মার সিদ্ধি হইবে না।' কিম্বা 'আত্মাকে' যদি 'জ্ঞান হইতে ভিন্ন' মানা যায় তবে যে যে পদার্থ 'জ্ঞান হইতে ভিন্ন' হয় সেই সেই "পদার্থ জড়ই" হয়। যেমন জ্ঞান হইতে ভিন্ন হয় বলিয়া ঘটাদি পদার্থ জড়রূপ হয় সেইরূপ "জ্ঞান হইতে ভিন্ন" হইলে "আত্মাও জড়রূপ" হইবে। আর যে যে পদার্থ "জড়" হয় সেই সেই পদার্থ "কল্পিত" হয় যেমন জড় হয় বলিয়া ঘটাদি পদার্থ কল্পিত সেইরূপ জড় হইলে আত্মাও কল্পিত হইবে। আত্মা কল্পিত হইলে "শূন্যবাদের প্রাপ্তি" হইবে সুতরাং "আত্মা জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে।" কিন্তু আত্মা "স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপই হন"। এইরূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও এই আত্মা 'অবিদ্যারূপ উপাধির' সম্বন্ধে "সাক্ষী" বলা হয়। আর "বৃত্তিমত্ অন্তঃকরণ বা চিত্ত রূপ উপাধির" সম্বন্ধে "প্রমাতা" বলা হয়। সেই প্রমাতার এই "চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়" "করণ" হয়। আর সেই "প্রমাতাই" সেই চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা "অন্তঃকরণের

বৃত্তিরূপ পরিমাণের" সঙ্গে বাহ্য ঘটাদি পদার্থকে "ব্যাপ্য করিয়া" সেই "ঘটাদিকের আকারে আকারিত" হয়। সেই অন্তঃকরণের 'একই বৃত্তিরূপ' পরিণামে "ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য" তথা" অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য" দুই 'একতা ভাবকে' প্রাপ্ত হয়। 'গৃহমধ্যস্থিত ঘটে যেমন সেই গৃহাকাশের তথা ঘটাকাশের' একতা হয় সেইরূপ 'বৃত্তিরূপ উপাধি' তথা 'ঘটরূপ উপাধি' 'একদেশ স্থিত' হইয়া সেই 'বৃত্তি উপহিত চেতনের' তথা 'ঘট উপহিত চেতনের একতা' হয়। তাহার পর সেই "ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য" "প্রমাতা চৈতন্যের" সহিত "অভেদে" আপন "অজ্ঞানের নাশ করিয়া" "অপরোক্ষ" হয়। আর আপন উপাধি রূপ যে ঘট হয় সেই ঘটকে আপন "তাদাত্ম্য অধ্যাসে" সেই "চৈতন্য প্রকাশ" করে। আর 'অত্যন্ত স্বচ্ছ যে অন্তঃকরণ পরিণামরূপ বৃত্তি' হয় সেই "বৃত্তিকে" সেই "বৃত্তি উপহিত চৈতন্য" প্রকাশ করে। এইরূপে "অন্তঃকরণ, বৃত্তি, ঘট" এই "তিনের" অপরোক্ষতা হয়। "অহং জানামি ঘটম্" এই তিনের অপরোক্ষতা আকার হয় এইরূপ, "অন্তর বহিঃস্থিত" সর্ব্ব **"অনাত্ম পদার্থকে প্রকাশ করে যে" "চৈতন্য যদ্যপি একরূপ"** হয় তথাপি ঘটাদি **"বাহ্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে" সেই "চৈতন্যের অন্তঃকরণের বৃত্তির"** অপেক্ষা করিতে হয়। এই জন্যই সেই **"চৈতন্যে প্রমাতাপণা"** হয়। আর **"অন্তঃকরণকে তথা সেই অন্তঃকরণের বৃত্তিকে" প্রকাশ করিতে** সেই **"চৈতন্যের কোন বৃত্তির অপেক্ষা"** নাই এই জন্যই সেই **"চৈতন্যের সাক্ষীরূপতা"**। যদি "অন্তঃকরণকে" ও তাহার "বৃত্তিকে" প্রকাশ করিতে "অন্য বৃত্তির" অপেক্ষা হইত ত 'অনাবস্থা দোষ' হইত সুতরাং সেই "সাক্ষী আত্মা" আপন

"স্বরূপেতেই" "অন্তঃকরণকে তথা তাহার বৃত্তিকে" প্রকাশ করেন। শ্রুতিযুক্তি করিয়া এই "স্বপ্রকাশ" "স্ফুরণরূপ আত্মা" "সর্ব্বদা নিত্য" তথা "সর্ব্বত্র ব্যাপক" তথা "সর্ব্ব পদার্থের প্রকাশক" তথা "সর্ব্বদা একরূপ" দেখান হইল।

এখন "চৈতন্যরূপ **ধর্ম্মী" হইতে "ধর্ম্মগুলিকে" সরাইলেই "চৈতন্য কেবল" হন**। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে ধর্ম্ম ধর্ম্মীতে 'অধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকে। "অধ্যাসিক সম্বন্ধ" অর্থাৎ "মিথ্যা" বা "ভ্রম" বা "নাই" এই সম্বন্ধ বুঝায়। অতএব ধর্ম্ম ধর্ম্মীর উপর "মিথ্যা সম্বন্ধে" অর্থাৎ "ধর্ম্ম ধর্ম্মীতে" "নাই" এই সম্বন্ধে থাকে এবং "এরূপ **বোধকেই" "ধর্ম্মকে ধর্ম্মী হইতে সরান বলা হয়**।

এখন এই "সাক্ষীভাবে অবস্থান" কি প্রকারে হয় সেই পদ্ধতি এই ঃ—অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' 'জীবই ব্রহ্ম' কিম্বা সবদৃশ্যের "আমিই আশ্রয়।" রজ্জুতে সর্পের মত "সব দৃশ্য আমায় কল্পিত" "এই জ্ঞান" হৃদয়ে "নিশ্চয়" করিয়া "সাক্ষীরূপে" তার (এই জ্ঞানেরও) "আমি প্রকাশক" এই 'আমি বিনা' তাহাদের "দৃশ্যের সত্তা" কিছু নাই। যেমন "স্বপ্নে" "সর্ব্বদৃশ্য আমার কল্পনা" "জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি" ও তেমনি "আমার ভাবনা।" অথবা "আমি জ্ঞানে" "আমিকে ত্যজিয়া" শুধু "জ্ঞান মাত্র"—"আমি" সাক্ষাৎ করিয়া, যথাবিধি সুখাসনে অবস্থান করিয়া শুধু দেখিতে হইবে—"আমি কবে অন্তর্ধান" হয়—"সাক্ষীসহ" —"আমি" কবে "মিশে যায়"—আর সেই "সাক্ষী" কবে "কেবল শুদ্ধ" রূপ হবে। যখনই "মনোরাজ্য" "দেহবোধ" সহদৃষ্ট হবে তখনি ভাবিতে হবে "এই সব জ্ঞান" "আমাতে কল্পিত" আমি তার "অধিষ্ঠান।" শুক্তিকা যেরূপ শুক্তিরজতের অধিষ্ঠান **"আমিও" সেইরূপ "সর্ব্বজ্ঞান বৃত্তির**

"অধিষ্ঠান"। 'শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ" "যত বিষয় জ্ঞান" আর "সুখী", "দুঃখী, কর্ত্তা ভোক্তা" 'যত জ্ঞাতৃভাব" অথবা "করিব" কিম্বা "করিবনা" ভাব "আমি—আমি বোধ" কিম্বা "অজ্ঞানের ভাব" এসকলই "অন্তঃকরণের বৃত্তি।" 'যতক্ষণ বোধ হয় "ততক্ষণ স্থিতি।" এই সব ভাব সহ "যথার্থ যে আমি" যাহা "সাক্ষী স্বপ্রকাশ" "সর্ব্ব অন্তর্য্যামী" "মিথ্যা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধে" মিশিয়া "অন্তঃকরণের বৃত্তি" প্রকাশিয়া দেয়। এইরূপ "মেলামেশাকে অধ্যাস" বলা হয়—"অধ্যাস বিনা কোন বোধ (বৃত্তিজ্ঞান) কভু হয় না।" "অধ্যাস বিনা কখনও জ্ঞান হয় না"—"প্রতি জ্ঞানাজ্ঞানে" ইহা "স্মরণ" করিতে হইবে। "প্রতিবোধে" এইরূপ "অধ্যাস স্মরণ" করিলে তাহার ফলে "অধ্যাসের অধিষ্ঠান" মাত্র থাকিবে। তখন "জাগ্রদ্‌দৃশ্য" ও "স্বপ্ন দৃশ্য" "সকলই নিজরূপ" বলিয়া অবশ্য বোঝা যাইবে। "আমি ব্রহ্ম" এ জ্ঞানও "অধ্যাস" থাকে শেষে এ অভ্যাসও ত্যাগ করিতে হইবে। তখন "জ্ঞান মাত্রে" "ইহা নহে" এই মাত্র ভাব "প্রতিবোধ সহ যেন আবির্ভাব হয়।" তখন ক্রমে সুষুপ্তি ও দৃশ্য হবে, "অজ্ঞানের প্রকাশক" "আমিই" হইব। এই সময়ে "বুদ্ধিই অজ্ঞান আকার" ধারণ করে সেইজন্য "সর্ব্বসাক্ষী আমি জ্ঞান" "বুদ্ধিরই" হয়। "প্রকৃত সাক্ষীর অনুভব," হয় না কারণ "সকলের জ্ঞাতা" যিনি তাঁহাকে কে জানিতে পারে? সেই জন্য সে 'সাক্ষী অনুভব' "বুদ্ধিরই কল্পনা" তাহাকেই "অজ্ঞানের দ্রষ্টা" বলিয়া মানা হয়। "সাক্ষী অনুভব" "বুদ্ধির কল্পনা" হইলেও এইরূপে "সাক্ষী ভাবিতে ভাবিতে" "প্রকৃত সাক্ষীর" ভাব ক্রমে ফুটে উঠিবে। এই ভাব যত যার সুদৃঢ় হইবে, "আমি ভাব" অন্তর্ধান তার তত হবে। 'আমি ভাব অন্তর্ধান সুদৃঢ়

হইলে’ ‘এই ভাব সেই কালে আর ভাঙ্গে না।’ সাধকের দিনরাত কোথা চলে যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা আধিব্যাধি সব লয় হয়। অন্যে যদি জোর করে এ ভাব ভাঙ্গায় তবেই তাহার কভু “আমি বোধ” হয়।

ইহাই ‘প্রকৃত তন্ময় ভাব” “এই ভাব প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে” “সাধনার শেষ” এই নিশ্চয় জানিবে, ‘অধ্যাস নিবৃত্তি ভিন্ন’ ‘ব্রহ্ম কিসে হবে ?” “সর্ব্ব অনুভব মধ্যে” “অধ্যাস দেখাতে” ধ্যান ভঙ্গ সম্ভাবনা না পায় আসিতে। দেখ যেই সাক্ষী ধ্যানে উপবিষ্ট হয় ধ্যানভঙ্গ চিন্তা তার দেখা যায়। আসন ত্যজিয়া উঠে যাইতে বাসনা কতরূপে তার মনে করে আনাগোনা। আসন ত্যাগ করিয়া উঠে যাই এবে যেহেতু অমুক কার্য্য মোর করিতে হইবে। ঐ বুঝি কেহ মোরে আহ্বান করিছে তাহে আর ধ্যান নাহি উচিৎ হতেছে।

আসনের দুঃখ আর সহ্য নাহি যায়, অথবা কাতর মোরে করে যে ক্ষুধায়। বাহিরের যত শব্দ করয়ে শ্রবণ ততই আসন ত্যাগে যায় তার মন। এইরূপ “যত চিন্তা যত অন্তরায়” আসিলেও এ সাধন করিতে সহায়। অমনি ভাবিবে “ইহা আমার কল্পনা” “জ্ঞান কাল অতিরিক্ত ইহারা থাকে না।” তাহা হইলে সে ‘সর্ব্ব চিন্তা’ দূর হয়ে যাবে আসন ত্যাগের চিন্তা আর না আসিবে এইরূপে আসন ত্যাগ নাই হয় একাসনে বসে তবে সিদ্ধি সুনিশ্চয়। এইরূপ **“জ্ঞানাজ্ঞান পারে” যেতে হবে “জ্ঞানের স্বরূপ মাত্রে থাকিতে”** হইবে। ইহা ‘অনুভব মাত্র’ বিষয় বর্জ্জিত ইহাতে কিছুই অনুভূত হয় না। অধ্যাসেই ‘বৃত্তিরূপ জ্ঞান” কিম্বা “অজ্ঞানের বৃত্তির উৎপত্তি”। ইচ্ছাযত্নাদিযত অনুভব সবই অধ্যাস হইতে উদ্ভব। **অধ্যাস ব্যতীত কখন কোনও কালে “ভাবের উদয় হয় না।”** ইহা ভাবিয়া **“অধ্যাসের অধিষ্ঠান**

ভাবে" 'নেতি নেতি' দ্বারা সদা থাকিতে হইবে তাহাকেই "সাক্ষী ভাবে অবস্থান" বলা হয়। তাহা অর্থাৎ সেই সাক্ষীভাবে অবস্থান "ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম সরাইলে" অর্থাৎ "ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়" বোধ হইলেই হয়। তখন এ জীব ভাব আর নাহি আসে শুদ্ধ জলে বিন্দু যেন শুদ্ধ জল মিশে। এই কথাই শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতে শ্রীভগবান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

অর্থাৎ দেহের ধর্ম্ম প্রাণের ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম মনের ধর্ম্ম বুদ্ধির ধর্ম্ম চিত্তের ধর্ম্ম অহংকারের ধর্ম্ম বর্ণ ধর্ম্ম আশ্রম ধর্ম্ম ইত্যাদি এবং দেহাদির ধর্ম্মের যে অষ্ট দোষ যথা ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও বিষ্ঠা মূত্রের বাধা "এই সর্ব্বধর্ম্ম" ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের "মিথ্যাত্ব নিশ্চয়" করিয়া "আমি যে এক" সেই "একের শরণ" করিবে। "একের শরণে দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না," সুতরাং "কর্ম্ম বদ্ধ" করিতে পারিবে না। "একের শরণে কর্ম্মবন্ধন নাশ হয়।" "আমি কর্ত্তা" বোধ হয় "বন্ধন কারণ" ইহা ত্যাগ করা হয় পরম সাধন।" সেই হেতু 'যেই যাহা করয়ে চিন্তন,'—'তাহাই হইয়া যায়' সে ব্যক্তি তখন। একের শরণে হয় শরণ্যে একত্ব। 'শরণ গ্রহণরূপ যেই ধর্ম্ম" হয় তাহা ভিন্ন যত কিছু 'অন্য ধর্ম্ম রয়" "সেই সব ধর্ম্ম ত্যাগে" "দ্বৈত সংস্কার" আর "কর্ম্ম সংস্কার" সকল প্রকার সর্ব্বতোভাবে সকলই ত্যক্ত হয় তখন কেহ তারে আবদ্ধ করিতে পারে না। কিম্বা 'সর্ব্বধর্ম্মত্যাগে" "নির্দ্ধর্ম্মক" সেই "ব্রহ্মমাত্র" বস্তু "নির্ব্বিশেষ" হয়, তাহে তাহা 'এক' আর "নির্গুণ অদ্বয়," "তদ্‌ভিন্ন সকলি হয় মিথ্যাই নিশ্চয়।" 'ব্রহ্ম সর্ব্বধর্ম্ম বিহীন'

বলিয়া 'জ্ঞেয় কিম্বা ধ্যেয়' নহে। "সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি" 'এক' গ্রহণ করায় 'দ্বৈত ত্যজি' 'অদ্বৈতের তাহে সমাশ্রয়' এতদ্বারা বলা হল। **"আগে দ্বৈত মিথ্যা বুঝিতে হইবে তবে অদ্বৈত বুঝিবে"—"দ্বৈতমিথ্যা নাহি হলে অদ্বৈত না হবে।"** এইরূপ "অদ্বৈত এক আমার শরণে" (অভেদচিন্তনে) 'জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ' "আমি"-পদ ফল, তাহে তার "জীবভাব" "মিথ্যাই কেবল।" "নিরপেক্ষ প্রকাশ" হই 'আমি' বলে তাহে ব্রহ্ম "জ্ঞানরূপ স্বপ্রকাশ" পেলে। 'আমি' পদ হতে ইহা আরও বলা হয় 'ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিশ্চয়'। কারণ "আত্মার অভাব কেহ ভাবিতে পারে না" তাহে 'সৎরূপ' আত্মা বলে হয় মানা। আত্মারে "অজ্ঞান" বলে কেহ নাহি ভাবে তাগে আত্মা 'জ্ঞানরূপ' অবশ্য হইবে। "নিরানন্দ ভাব আত্মা কভু নাহি চাহে" এহেতু "আনন্দরূপ ব্রহ্ম" সবে কহে। এইরূপ **"অভেদচিন্তা জ্ঞানীর সাধন"** তাহে "সাক্ষিধ্যান হয় অতি প্রয়োজন"। শরণ বলিয়া যার জ্ঞানোদয় হয়, "নিদিধ্যাসনের" ফল তার তাহে হয়। যেহেতু 'আশ্রিতের সব জ্ঞানে' 'আশ্রয়ের জ্ঞান সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে' অতএব শ্রীভগবান গীতার শেষে যে 'শেষ সাধনের' কথা সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য শ্লোকে 'সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ' করিয়া 'ধর্ম্মীরূপ' "আমিকে" 'শরণ' করিতে অর্থাৎ "অভেদে" জানিতে বলিয়াছেন তাহার নিগূঢ় ভাবার্থ বঙ্গ ভাষায় বলিলে এই বলা যায় যে:—

"আমি কে জানিনা" বলে 'যত দুঃখ পাই।'
"আমিকে জানিয়া সুখ" 'শান্তিতে ঘুমাই॥'

এখন, যে 'আমিকে' জানিলে 'সব দুঃখ চলে' যায় এবং 'সুখ শান্তি পাওয়া' যায় সেই 'আমিকে' জানিবার জন্য শ্রীভগবান বলিলেন যে,-

"কল্পিত অনাত্মার সব ধর্ম্মকে" "অধ্যাসকে" এবং "অকল্পিত আত্মার" "কল্পিত সব ধর্ম্মের অধ্যাসকে" "ত্যাগ" করিলে অর্থাৎ "মিথ্যা" বলিয়া "নিশ্চয় কারলে" **"অকল্পিত আত্মা বা আমি পরিশিষ্ট থাকেন"—ইহারই নাম "আমিকে জানা"।** 'ধর্ম্ম বলিতে জ্ঞেয়কেই' বুঝায় এবং "জ্ঞেয়ই দুঃখের হেতু" সুতরাং "ধর্ম্মত্যাগে দুঃখত্যাগ" হয় সেইজন্য "চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত" হয়। সারাংশ এই হয় যে, "আত্মা বা আমিকে" 'অবিদ্যার আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া' আত্মা বা 'আমিকে' 'না জানা রূপ অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি হইতে' 'দেহাত্মা ইত্যাদি অধ্যাসে' দুঃখের আবির্ভাব হয় এবং সেই দুঃখকে নাশ করিবার জন্য ষড়দর্শন প্রয়াস করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে 'একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ব্যতীত' অন্য পঞ্চ দর্শনে "সাধনের দ্বারা" "দুঃখ নিবৃত্তি হয়" এইরূপ বলিয়াছেন কিন্তু "সাধনের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয় তাহা অনিত্য" সুতরাং 'দুঃখ নিবৃত্তিও অনিত্য হইবে সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তি নষ্ট হইয়া পুনরায় দুঃখ হইবে।' কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন কেবল বলেন যে "দুঃখ নিত্য নিবৃত্ত" অর্থাৎ "দুঃখ কোথায়ও কখনও নাই" সুতরাং "তাহার নিবৃত্তির জন্য কোন সাধনের প্রয়োজন নাই" **"কেবল সুখ স্বরূপ" "অধিষ্ঠানরূপ আত্মার জ্ঞান" হইলেই অর্থাৎ "আমি চির সুখ স্বরূপ দুঃখ আমাতে কখন নাই"** "নিত্য নিবৃত্তিরূপ দুঃখের নাশ হয়।" সুতরাং "এইরূপ আমির জ্ঞানেই দুঃখ নিবৃত্তি হয়।" কিন্তু সাধারণতঃ 'আমির জ্ঞান বলিলে 'জ্ঞান হইতে আমি ভিন্ন বলিয়া মনে হয়' কিন্তু যেমন 'রাহুর শির'— বলিলে কেবল 'শিররূপ রাহুকেই' বুঝায় সেইরূপ "আমির জ্ঞান" বলিতে "জ্ঞান স্বরূপ আমিকেই" বুঝায়।

এখন জ্ঞান বস্তুর 'প্রকৃতির' আলোচনা করিয়া দেখা যাক—'জ্ঞেয় বস্তুটী জ্ঞানেরই রূপান্তর' অর্থাৎ 'জ্ঞান বস্তুটা নিয়ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে'। যেমন আমি যখন ঘটকে জানি তখন 'আমি আমার ঘটাকার' 'অন্তঃকরণ বৃত্তিকেই' জানি। ঘটের 'যথার্থ স্বরূপ জানিনা'। কারণ কোনরূপ দোষ বশতঃ অন্তঃকরণটী ঘট দেখিয়া 'ঘটাকার ধারণ না করিলে' আর আমাদের ঘটজ্ঞান হয় না। আর আমি যখনই ঘটের জ্ঞান করি তখনই আমি যে 'জ্ঞাতা,' তাহাও জ্ঞান করিনা এবং 'আমার ঘটজ্ঞান হইয়াছে' তাহাও জ্ঞান করি না কিন্তু "ইহা ঘট" এই জ্ঞানের পরক্ষণেই সেই জ্ঞানটী হয় "অর্থাৎ আমি ঘটকে জানিতেছি" এইরূপ একটী জ্ঞান হয়। প্রথম জ্ঞানে "ঘট" বিষয় হয়, আর দ্বিতীয় জ্ঞানে 'ঘট ঘটজ্ঞান ও আমি'—এই 'তিনটীই বিষয়' হয়। শাস্ত্রে এই দ্বিতীয় জ্ঞানের নাম "অনুব্যবসায়াত্মক-জ্ঞান" বলা হয় এবং প্রথম জ্ঞানকে "ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান" বলা হয়। আর সকল জ্ঞানেই এইরূপ 'দুইটী ক্ষণে' 'দুইটী জ্ঞানের' প্রয়োজন হয়। 'ইহা জ্ঞানেরই স্বভাব'।

তাহার পর আরও দেখা যায় উক্ত দ্বিতীয় জ্ঞানের সময় 'প্রথম জ্ঞানটী' এবং 'প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা আমিও' 'দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়' বলিয়া 'জড়রূপই' হয়; অর্থাৎ যেমন "আমি ভিন্ন বলিয়া বিষয় জড়-রূপই হয়," তদ্রূপ সেই "প্রথম জ্ঞানটী ও প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতাটী দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতৃরূপ আমি ভিন্ন হইয়া জড় মধ্যে পরিগণিত হয়।" আর যতক্ষণ 'প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা' এবং 'প্রথম জ্ঞানটী' দ্বিতীয় জ্ঞানের 'বিষয় না হয়,' ততক্ষণ দ্বিতীয় 'জ্ঞানে' জ্ঞাতা "আমি" হইতেও উহা 'পৃথক বলিয়া বোধ' হয় না। আর এই যে 'আমি বস্তুটী,' এটী একটী

"আমি আমাকে জানি" এরূপ 'একটী ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।' অতএব দেখা যাইতেছে 'দ্বিতীয় জ্ঞাতা' উক্ত 'জ্ঞানরূপ অনভিব্যক্ত' 'আমি ভাব' হইতে "প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা আমি" "প্রথম জ্ঞান" এবং সেই 'প্রথম জ্ঞানের বিষয় জড় বস্তুটীর অভিব্যক্তি' হইতেছে। অর্থাৎ "জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়" বা "চেতন ও জড়" বা "বিষয় ও বিষয়ী"—'এই উভয়ই একটী' 'জ্ঞানময় আমি' ভাব হইতে 'অনবরত বিনির্গত বা অভিব্যক্ত' হইতেছে। তাহার আর 'ক্ষয়' হইতেছে না। 'আমি জ্ঞানটী অনবরতই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতেছে'।—এখন এই "আমি আমাকে জানিতেছি"—এইরূপ একটী 'জ্ঞানবস্তু সত্য সত্যই অভিব্যক্তি' হইতেছে, অথচ 'মূল জ্ঞানবস্তুটীর' 'পরিবর্ত্তন হইতেছে না'—ইহা অসঙ্গত। 'কারণটী অবিকৃত' থাকিয়া 'কার্য্য উৎপন্ন হইলে, উৎপত্তিই বাস্তব হয় না।' 'কি অন্তর্জগৎ কি বহির্জগৎ' উভয় জগতেই ইহা প্রযোজ্য।

তাহার পর "আমি আমাকে জানিতেছি" এই ভাবটী "মূলতত্ত্বই নহে।" কারণ 'আমি আমাকে যখন জানি', 'তখন উভয় আমি পৃথক হইয়া যায়' এইজন্য আমি আমাকে ঠিকঠিক জানিতেই পারিনা। এস্থলে "কর্ম্মভূত আমি" "কেবল আমি" থাকে না। আমি আমাকে জানিবার কালে "দেশ ও কালের সম্বন্ধ" আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং **"কেবল আমি" জ্ঞেয় ও হয় না। "সর্ব্বোপাধিবিনিমুক্ত" "কেবল আমি" "কেবল আমাকে জানিতেই পারে না।"** জানিতে গেলেই "উপাধি বিশিষ্ট হয়।" অর্থাৎ **'আমিকে জানিতে গেলেই' আমি আর ঠিক 'সেই আমি' থাকে না।'** বস্তুতঃ আমিকে জানিতে গেলে **'দুইটি আমি বস্তুই হারাইয়া যায়'**—ইহাই

অনুভব হয়। "চিত্ত বিক্ষিপ্ত" থাকিলে কখন "জ্ঞাতৃভাব" কখন "জ্ঞেয় ভাব" প্রবল হয় মাত্র 'আমিকে ঠিক জানা যায় না।'

তাহার পর এই দ্বিতীয় জ্ঞানের "কর্ম্মভূত আমি" "আমি জ্ঞানের" সঙ্গে 'বিলীন' হয়। ঘটজ্ঞান যেমন ক্ষণস্থায়ী, এই 'আমি জ্ঞান' ও তদ্রূপ 'ক্ষণস্থায়ী'। অন্য জ্ঞানোদয়ে যেমন ঘটজ্ঞান নষ্ট হয় আমি জ্ঞানও তদ্রূপ নষ্ট হয়।' এইরূপ অবস্থায় 'জ্ঞাতা আমি' ও 'জ্ঞেয় আমি' 'মিলিত যে আমি' 'আমাকে জানিতেছি ভাব' সেই ভাবটীকে 'নিত্য মূল বস্তু বলা সঙ্গত হয় না'—'ইহা নিতান্তই অনুভব বিরুদ্ধ।' জ্ঞানের বিষয় "জ্ঞেয় আমি" বস্তুটী নষ্ট হয় সুতরাং তাহাকে নিত্য বলা যায় না। অতএব 'জ্ঞান বস্তুটী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে প্রকটিত' হইয়াও "নিত্য অবিকৃত" বলা যায় না, **'জ্ঞান বস্তুটিকে নিত্য অবিকৃত বলিলে' 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবকে মিথ্যা বলিতে হইবে।'** তাহার পর এই যে "জ্ঞাতা আমি" ইহা "জাগ্রত" "স্বপ্নে" যেরূপ হয় 'সুষুপ্তিতে সেরূপ নহে।' সেখানে "আমি আমাকে জানিতেছি" 'এই ভাবই থাকে' না। সুতরাং "জ্ঞাতার" যে "প্রকৃত স্বরূপ" তাহা 'জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি', এই 'তিন অবস্থা ভিন্ন' 'অন্য একটী রূপ"। আর বস্তুতঃ জাগ্রত স্বপ্নেও যখনই জ্ঞান হয়, তখনই সেই "জ্ঞানের জ্ঞাতা" "সুষুপ্তির জ্ঞাতার" ন্যায় "**অনভিব্যক্তই**" থাকে। **'জ্ঞানের জ্ঞান কালেই' কেবল 'জ্ঞাতার জ্ঞান হয়'** অর্থাৎ "আমি আমাকে জানিতেছি" এই জ্ঞান হয়।

এখন সুষুপ্তি কালেও "আমি আমাকে জানিতেছি" এই জ্ঞানটী 'থাকে কিম্বা থাকে না' তাহারও 'সংশয়' হয়। সুষুপ্তি কালে 'জ্ঞাতার জ্ঞান' থাকে যাহারা মানেন তাহাদের যুক্তি এইরূপ ঃ—"কোন বস্তুতে

গাঢ় মনোনিবেশ" করিলে যেমন 'অন্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে না,' সুষুপ্তি কালেও সেইরূপ উক্ত 'আমি আমাকে অনুভব করিতেছি' এই ভাবটী 'অনুভূত হয় না মাত্র ইত্যাদি।' কিন্তু 'একথাও অসঙ্গত।' কারণ 'গাঢ় মনোনিবেশ কালে' যে বিষয়টীর ভান হয় তাহার 'অনুব্যবসায়ে' "সেই বিষয়ও তাহার জ্ঞাতা ও জ্ঞানের অর্থাৎ ত্রিপুটিরও ভান হয়," কিন্তু সুষুপ্তি কালে যে জ্ঞান হয় 'তাহার অনুব্যবসায়ে কোন জ্ঞাতার বা জ্ঞানের তথায় ভান হয় না।' তখন 'আমি কিছুই জানি নাই' এমন কি 'আমি আমাকেও জানি নাই' এইরূপ জ্ঞানই হয়। অতএব ইহা অর্থাৎ 'সুষুপ্তি কালীন জ্ঞাতার জ্ঞান হওয়া' নিতান্ত 'অনুভব বিরুদ্ধ' কথা। "আমি আমাকে জানিতেছি" এই ভাবটি 'জ্ঞানের মূলতত্ত্ব নহে।' **জ্ঞানের যাহা "মূলতত্ত্ব' যাহা হইতে 'সকল জ্ঞাতা ও সকল জ্ঞেয় অভিব্যক্ত' তাহাই "স্বপ্রকাশ তত্ত্ব"।** তাহা **বেদান্তেরই "অদ্বৈত তত্ত্ব।"** তাহা **অবেদ্য হইয়াও অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্যত্ব।** অর্থাৎ তাহা **"নিরপেক্ষ প্রকাশ"।** এখন এই "নিরপেক্ষ প্রকাশ" যখন "পরিচ্ছিন্নের বা ব্যাপ্যের মত" হয় তখন "প্রকাশ্য বা "জ্ঞেয়" হয়। এবং যখন "অপরিচ্ছিন্নের বা ব্যাপকের মত" হয় তখন "প্রকাশক বা জ্ঞাতা হয়।" অর্থাৎ "সামান্য জ্ঞানই" যখন "বিশেষ" হয় "নিরপেক্ষ" যখন "সাপেক্ষ" হয়—তখনই 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রকাশের দ্বারা **প্রকাশিতের মত হয়।'** "জ্ঞানের কর্ত্তা"—"জ্ঞাতা" "জ্ঞানের কর্ম্ম"-"জ্ঞেয়" সুতরাং উভয়ে "জ্ঞানের ব্যাপ্য"। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ'—'ব্যাপকতা ও পরিচ্ছিন্নতা।' ব্যাপক প্রকাশ জ্ঞাতা আর পরিচ্ছিন্ন প্রকাশ 'জ্ঞেয়'। যেমন রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে সর্প মালাদির অধ্যাস হয় এবং রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞানে সর্পাদির

অধ্যাসের নিবৃত্তি হয় সেইরূপ "প্রকাশরূপ অধিষ্ঠানে" "জ্ঞাতা জ্ঞেয়রূপ" "প্রকাশক প্রকাশ্যরূপ" অধ্যাস হয় এবং "প্রকাশরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞানে" "প্রকাশক প্রকাশ্যরূপ" বা "জ্ঞাতাজ্ঞেয় রূপ" অধ্যাসের নিবৃত্তি হয়। এখন "প্রকাশ" বলিতে "স্ফুরণকে"ই বুঝায়। এখন এই "স্ফুরণ" বা "বোধ" কাহার ধর্ম্ম (১) বিষয়ের ধর্ম্ম (২) ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম (৩) আত্মার ধর্ম্ম (৪) বুদ্ধির ধর্ম্ম।

এখন 'বিষয়ের ধর্ম্মরূপ বোধ হয়'—এই প্রথম পক্ষ হইতে পারেনা। কারণ 'বোধ যদি ঘটাদি বিষয়ের ধর্ম্ম' হয়ত 'ঘটাদি বিষয় চৈতন্য হওয়া উচিত।' "যাহার বোধ আছে তাহাই চৈতন্য।" ইহাই নিয়ম। কিন্তু যদি কেহ স্বীকার করে যে, ঘটাদি 'বিষয় চৈতন্য স্বরূপ।' ঘটাদি 'বিষয়কে চৈতন্য স্বরূপ মানিলে' ঘটাদি বিষয়ের নিজের জ্ঞানের জন্য অন্যের অপেক্ষা হইবেনা। কারণ চেতন স্বপ্রকাশ হন। "যিনি আপনার সিদ্ধির জন্য অন্য প্রকাশের অপেক্ষা না করেন তাঁহাকে স্বপ্রকাশ" কহে। কিন্তু ঘটাদি 'বিযয় আপনার সিদ্ধির জন্য অন্য প্রকাশের অপেক্ষা করে। অতএব ঘটাদি "বিষয়ের ধর্ম্ম বোধ নহে।" কিম্বা যদি ঘটাদি বিষয়ের ধর্ম্ম বোধ মানিলে ভোক্তা আর ভোগের বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইবে। তাৎপর্য্য এই—"ভোগ্যরূপ" প্রসিদ্ধ ঘটাদি বিষয় "ভোক্তার স্বরূপ হইবে।" আর ঘটাদি বিষয় হইতে ভিন্ন ভোক্তা 'ভোগ্য স্বরূপ হইবে।" কারণ বোধবানই ভোক্তা হয়। সুতরাং ঘটাদি "বিষয়ের ধর্ম্মবোধ নহে।"

'ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মবোধ হয়'—এই দ্বিতীয় পক্ষও হয়না যাহা 'যাহার ধর্ম্ম হয়' তাহা 'সদাই তাহাতে প্রতীত হইবে।' যেমন অগ্নির উষ্ণ স্পর্শ রহিত প্রতীত হয় না। সেইরূপ যদি বোধ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম

হয় ও যেখানে যেখানে ইন্দ্রিয় সেই খানে সেই খানে নিয়মপূর্ব্বক বোধের প্রতীতি হওয়া চাই। অনিয়মে বোধ প্রতীত হবেনা, কিন্তু কখন ইন্দ্রিয় থাকিলে বোধ প্রতীত হয়, আর কখন প্রতীত হয়ও না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বোধ নহে। এখন নিয়মের অভাব নিরূপণ করা যাইতেছে। 'শব্দ বিদ্যমান' থাকিলেও 'বধির পুরুষের চক্ষু ইন্দ্রিয়' শব্দকে জানিতে পারে না সেইরূপ 'রূপ বিদ্যমান' থাকিলেও 'অন্ধপুরুষের শ্রোত্র ইন্দ্রিয়' রূপকে জানিতে পারিবেনা। আর যখন "অন্যমনস্ক" থাকে তখন সম্মুখেস্থিত অথবা পশ্চাতেস্থিত পুরুষকে চক্ষু ইন্দ্রিয় জানিতে পারে না। সেইরূপ 'অন্যমনস্ক থাকিলে শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ও শব্দাদিক বিষয়কে জানিতে পারে না।' যদি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বোধ হইত ত 'যেখানে ইন্দ্রিয় থাকিবে সেইখানেই বোধ অবশ্য প্রতীত হওয়া উচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রতীত হয়না।' অতএব ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বোধ নহে। কিন্তু "বোধের উপকরণ" ইন্দ্রিয় হয়। তাৎপর্য্য এই—'অন্তঃকরণ বৃত্তিতে আরূঢ় চৈতন্যের নাম বোধ।' সেই 'বৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি হইতে উৎপন্ন হয়।' সুতরাং 'ইন্দ্রিয় বোধের উপকরণ' হয়। উপকরণ মানিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ আর হইবেনা। কিম্বা ইন্দ্রিয়তে যদি বোধ থাকিত ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম হইত। 'সেই বোধ কোন ইন্দ্রিয়ে প্রতীত হয় না।' কিন্তু 'ঘটাদি অর্থে' থাকে বলিয়া বোধ প্রতীত হয়। তাৎপর্য্য এই যে "স্ফুরণের" নাম "বোধ" হয়। সেই বোধ 'ঘটস্ফুরণ' হয় আর 'পটস্ফুরণ' হয় এই রূপ অনুভব 'বিষয়ে থাকে' বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ভূত ইন্দ্রিয়ে বোধ থাকে ইহার কোনও প্রমাণ নাই। এখানে শঙ্কা এইরূপ করা যায় যে:—যেমন নৈয়ায়িকের মতে আত্মস্থিত বোধ ঘটাদি পদার্থকে বিষয় করে সেইরূপ ইন্দ্রিয়স্থিত

বোধও ঘটাদিকে বিষয় করিবে। বোধের ঘটাদি বিষয়ের সহিত 'বিষয়তা সম্বন্ধ' নৈয়ায়িকের ন্যায় এখানেও হইতে পারে। তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে—যদি 'অন্য বস্তুতে স্থিত বোধ' 'অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে' ত 'তাদাত্ম্য সম্বন্ধতে' ঘটস্থিত বোধ পটকে কেন প্রকাশ করিবে না? যেরূপ 'ইন্দ্রিয়স্থিত বোধের ঘটাদি বিষয়ের সহিত' 'বিষয়তা সম্বন্ধ' তুমি অঙ্গীকার কর সেইরূপ 'ঘটেস্থিত বোধের' পটাদির সহিত 'বিষয়তা সম্বন্ধও' কোন প্রকারে নিবারণ হইবে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বোধ নহে। কিম্বা চক্ষু ইন্দ্রিয়স্থিত বোধ দ্বারা ঘটাদির ভাণ অঙ্গীকার করিলে তাহা হইলে তোমার মতে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যেমন ঘটের' সহিত 'সংযোগ সম্বন্ধ' হয় আর 'ঘটস্থিত রূপের' সহিত 'সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ হয়', সেইরূপ 'ঘটস্থিত রসাদির' সহিত ও চক্ষের 'সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ হয়।' সুতরাং যেরূপ 'ঘটের রূপ' চক্ষু 'ইন্দ্রিয়স্থিত বোধে প্রতীত হয়', সেইরূপ 'ঘটেস্থিত রসাদির' 'চক্ষু ইন্দ্রিয় স্থিত বোধে কেন প্রতীত হয় না' ? কিন্তু প্রতীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমার মতে এই দোষ হয় না কারণ 'রূপাকার বৃত্তিতে আরূঢ় চৈতন্য-রূপ বোধের' 'তাদাত্ম্যরূপ বিষয়তা সম্বন্ধ রূপে হয়, রসে হয় না।' এই জন্য চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রসাদির প্রতীতি হয় না। ইহা বলিলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, 'অন্য পদার্থে স্থিত বোধ অন্য পদার্থকে প্রকাশ করে না।' যদি এইরূপ স্বীকার কর ত ঘটস্থিত বোধ পটকেও প্রকাশ করিবে। ইহাতে 'অতি প্রসঙ্গ দোষ হইবে।' সুতরাং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বোধ নহে।

"আত্মার ধর্ম্ম" বোধ—এই তৃতীয় পক্ষও হয় না। কারণ যদি আত্মার ধর্ম্ম বোধ হইত ত 'ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মী ভিন্ন হয়' বলিয়া 'বোধ

হইতে ভিন্ন আত্মার জড়তা প্রাপ্ত হইবে।' কিম্বা যেমন 'ঘটাদিকে বোধ প্রকাশ করে' সেইরূপ 'আমি আত্মাকে' 'বোধ প্রকাশ করে না।' কারণ 'ঘটাদি পদার্থ বোধে কল্পিত।' অতএব 'অধিষ্ঠান স্বরূপ বোধ' তাহাকে প্রকাশ করে। তাৎপর্য্য এই হয় যে—ঘট উপহিত জ্ঞানে ঘট কল্পিত। যখন অন্তঃকরণ বৃত্তি নেত্র দ্বারা বাহিরে আসিয়া ঘটাকার হয় তখন 'ঘট উপহিত চেতনের সহিত' 'বৃত্তি উপহিত চেতনরূপ বোধের অভেদ হয়।' কারণ চেতনে 'পরমার্থতঃ ভেদ' নাই কিন্তু 'উপাধিকৃত ভেদ' হয় 'সেই উপাধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেতনের ভেদ করে।' আর যখন 'উপাধিরা এক দেশস্থিত হয়', তখন 'উপাধিযুক্ত চেতনের ভেদ করে না'.কিন্তু তথায় চেতনের অভেদই হয়। যেমন মঠ হইতে ভিন্ন দেশে যখন ঘট তখন ঘটাকাশ আর মঠাকাশের ভেদ হয়। আর যখন মঠের ভিতর ঘট আনিলে তখন মঠাকাশের সহিত ঘটাকাশ অভেদ হয়। এই রীতিতে 'ঘট উপহিত চেতনের' সহিত অভেদ ভাবকে, প্রাপ্ত হইয়াছে যে 'ঘটাকার বৃত্তি-উপহিত চেতনরূপ বোধ', সেই বোধে ঘটাদি 'কল্পিত' হয়। সেই কল্পিত ঘটাদিকে 'অধিষ্ঠানরূপ বোধ' প্রকাশ করে। সেইরূপ 'আমি আত্মার' 'কোন অধিষ্ঠান নাই।' কিন্তু 'আমি নিজ মহিমায় স্থিত হইয়া' 'সর্ব্ব অনাত্মা বস্তুর অধিষ্ঠান হই।' আর 'বোধকে আমি আত্মার অধিষ্ঠান মানিলে', তাহা হইলে সেই 'বোধই আত্মাসিদ্ধ' হইয়া যাইবে। কারণ 'সকলের অধিষ্ঠান আত্মাই হন' আর 'আমি আত্মা হইতে ভিন্ন''বোধকে যদি প্রকাশ্য রূপ' মানিলে, সেই 'বোধের দ্বারা আমি আত্মার ভাণ' হইবে না। যেমন পুত্র পণ্ডিত হইলেও পিতা পণ্ডিত হন না। সুতরাং 'আত্মার ধর্ম্ম বোধ নহে' ইহা সিদ্ধ হইল।

আর 'বুদ্ধির ধর্ম্ম বোধ'—এই চতুর্থ পক্ষও হয় না। কারণ সেই বুদ্ধি বোধ হইতে ভিন্ন নহে। 'বোধের সহিত তাদাত্ম্য' ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধি জ্ঞান পদবী প্রাপ্ত হয়।' 'অন্তঃকরণের পরিণাম রূপ বুদ্ধির' 'স্বতঃ জ্ঞানরূপতা নাই।' যদি বোধকে বুদ্ধির ধর্ম্ম মানিলে তাহা হইলে 'বোধ হইতে ভিন্ন বুদ্ধি জ্ঞান পদবীতে রহিত হইবে।' কিম্বা যদি বুদ্ধির ধর্ম্ম বোধ হইলে তবে বোধ হইতে ভিন্ন বুদ্ধির কি স্বরূপ হয়? বোধ হইতে ভিন্ন হইলে 'বোধ স্বরূপতা' হইবে না। কিন্তু 'অবোধ স্বরূপ বুদ্ধির, অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর সেই 'অবোধ স্বরূপ বুদ্ধির' ঘটাদির ন্যায় 'আমি আত্মাতে কল্পিত হয়' বলিয়া 'আমি আত্মার অধীন, স্বতন্ত্র নহে।' সুতরাং বুদ্ধির ধর্ম্ম বোধ নহে।

এখন 'বোধ অনন্ত' হয়। বুদ্ধি ও বোধ স্বরূপ এই প্রকার বাদার শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য আর 'বোধ এক আত্মা স্বরূপ'ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য বোধ স্বরূপের অন্য বিচার করা যাইতেছে; সেই 'বোধ জগতে এক' অথবা 'অনেক হয়।' তথায় বোধ—'এক'—এই প্রথম পক্ষ হয় না। কারণ যদি 'এক বোধ হইত' 'তবে সংস্কার ভেদ, প্রমাণ-ভেদ, প্রমা জ্ঞান, স্মৃতি জ্ঞান ও অ-প্রমাজ্ঞান, ইহাদের পরস্পর ভেদ না হওয়া উচিত।' তাৎপর্য্য এই হয় যে—নাশ অবস্থাকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ 'জ্ঞাননাশ'হইলে জ্ঞান সংস্কার উৎপন্ন হয়। সেই 'সংস্কারের ভেদ জ্ঞানের ভেদ বিনা হয় না।' আর প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, এই ষট্ 'প্রমাণের ভেদও প্রমাজ্ঞানের ভেদ বিনা হয় না।' সুতরাং বোধ এক নহে। তথাপি 'সিদ্ধান্তে বোধের একতাই সিদ্ধ করিতে হইবে।' সুতরাং সেই একতাকে দৃঢ় করিবার জন্য একতা খণ্ডনের বিকল্প করা হইল। আর

বোধ—অনেক এই দ্বিতীয় পক্ষেও এই বিচার করা উচিত যেমন 'স্বরূপতঃ ঘটপটের ভেদ হয়', তেমন 'বোধের পরস্পর স্বরূপতঃ ভেদ' আছে ? অথবা ঘটাকাশ আর মঠাকাশের মহাকাশ হইতে ঘটমঠরূপ উপাধিকৃত ভেদ, সেইরূপ 'উপাধিকৃত বোধের পরস্পর ভেদ' অথবা 'স্বরূপতঃ বোধের ভেদ।' এই প্রথম পক্ষ হইতে পারে না। কারণ 'বোধ স্বরূপতা' 'সম্পূর্ণ বোধে সমান।' অতএব 'এক বোধে অন্য বোধের ভেদ হয় না।' যেমন ঘটের সহিত ঘটের ভেদ থাকে না, সুতরাং 'স্বরূপতঃ বোধের ভেদ নাই।' আর 'উপাধির ভেদেতে বোধের ভেদ'—এই দ্বিতীয় পক্ষ আমিও স্বীকার করি। কারণ, ঘট মঠের উপাধিকৃত ভেদে আকাশ নানা হয় না, কিন্তু ঘটমঠরূপ উপাধিতে স্থিত ভেদ, আকাশে 'আরোপ' করা হয়। সেইরূপ 'আরোপিত অন্তঃকরণ বৃত্তির ভেদ হইলেও সে ভেদ বোধে পরমার্থতঃ নাই।' যেমন 'কল্পিত মরুভূমির জলে' মাটি ভেজে না, আর যেমন 'কল্পিত সর্পের' দ্বারা রজ্জু বিষাক্ত হয় না সেইরূপ 'আরোপিত ভেদে' 'বোধ নানা হয় না।' কিম্বা বোধের যাহারা পরস্পর বাস্তব ভেদ মানেন তাহাদের এই জিজ্ঞাসা করি যে—সেই বোধ 'পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করে' অথবা 'পরস্পর অপেক্ষাতে রহিত ?' তথায় শেষ পক্ষ মানিলে বোধের ভেদ সিদ্ধ হয় না। 'কারণ অন্যবোধের অপেক্ষা রহিত এক বোধের দ্বারাই সর্ব্ববাবহারের সিদ্ধ হইতে পারে।' অনন্তবোধ মানিবার কিছু প্রয়োজন নাই। আর 'বোধ পরস্পর অপেক্ষা রাখে' এইরূপ প্রথম পক্ষও সম্ভব নহে। কারণ 'জ্ঞানের বিষয়তার অভাবের নাম—অজ্ঞাততা' হয়। সেই 'অজ্ঞাততা দুই প্রকারের' এক ত' স্বপ্রকাশরূপ' আর অন্য 'জড়ত্বধর্ম্ম বিশিষ্ট চেতনের

সম্বন্ধের অভাবরূপ হয়।' তথায় বোধ; 'স্বয়ং-প্রকাশতারূপ' প্রথম 'অজ্ঞাততাকে' সিদ্ধান্তরূপতা পরে বলিব। এখন অন্য অজ্ঞাততাকে খণ্ডন করা যাইতেছে যেমন 'ঘট অজ্ঞাত হইয়াও জলাধারতারূপ কার্য্যের কারণ হয়', সেইরূপ 'এইবোধ অজ্ঞাত হইয়া কোন কার্য্যের কারণ হয় না।' আর যে 'বোধকে অজ্ঞাত মানিলে তাহা হইলে বোধও জড় হইবে' তাহা হইলে 'বোধ বোধ রহিত' হইয়া ঘটাদিকের সমান হইবে। আর 'বোধ জ্ঞাত হইয়া ব্যবহারের কারণ হয়' এই দ্বিতীয় পক্ষও হয় না। কারণ 'জ্ঞানের বিষয় যে বস্তু হয়'—'তাহাকে জ্ঞাত' কহা হয়। যদি বোধকে বিষয় করা জন্য অন্য বোধ মানিলে. সেই বোধকে ঘটাদির ন্যায় 'অবোধরূপতা' এক দূষণ প্রাপ্ত হইবে, অন্য 'অনবস্থারূপ' দূষণ প্রাপ্ত হইবে। এরূপ এই 'বোধের অবোধরূপতা ও অনবস্থারূপ' দূষণ নিবারণের জন্য যদি বলা হয় যে বোধের সিদ্ধির জন্য অন্য কোনও বোধ নাই, তাহা হইলে বোধসাধক বোধ' না মানিলে—জগৎ অন্ধতা প্রাপ্তি হইবে। তাৎপর্য্য এই হয় যে—কোন বস্তুর সিদ্ধি হইবে না।

অতএব 'এই বোধ বোধ রহিত নহে।' 'বোধ জ্ঞাত হইলেও দোষ' 'অজ্ঞাত হইলেও দোষ' এই উভয় দোষ দেখান হইল। অতএব সেই 'দোষের নিবৃত্তির জন্য' 'বোধকে স্বয়ং প্রকাশতা' স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে 'স্বয়ং প্রকাশ বোধ রূপ আমি আত্মা হই'—'আমা হইতে ভিন্ন বোধ নাই।' 'বোধ আত্মস্বরূপ হইলে ভূমানন্দ লাভ হইবে।' সেই 'ভূমানন্দ রক্ষার চিন্তারও প্রয়োজন নাই', কারণ 'অনিত্যবস্তুর রক্ষা করিতে হয়'—'নিত্যবস্তুর রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।' আর 'সত্যস্বরূপ আমি আত্মার অনিত্যতা নাই।' অতএব 'আমি আত্মা

হইতে অভিন্ন ভূমানন্দেরও অনিত্যতা সম্ভব নাই।' ভূমা নাম ব্যাপকের হয়। যে হেতু 'আত্মার তিন পরিচ্ছেদ নাই' সেই হেতু 'আত্মা ভূমা।' 'সম্পূর্ণ দেশকালাদি কল্পিত বস্তুর' 'আমি আনন্দস্বরূপ আত্মা আধার হই।' 'আমি আত্মার আধার' কোন কল্পিত বস্তু নাই। অতএব আমি আনন্দস্বরূপ আত্মার কোনও প্রকারের অনিত্যতা নাই। আর 'আমি সর্ব্বাধিষ্ঠান আত্মা কোনও অনাত্মাবস্তুতে থাকি না কিন্তু নিজ মহিমাতে স্থিত হই' কিরূপ আমি আত্মা—'স্বয়ং প্রকাশ আর সুখস্বরূপ।' 'আমি আত্মাতে' 'লেশমাত্রও দুঃখ নাই।' যদি বল যে সম্পূর্ণ জগতের আত্মা আমি হই তাহা হইলে 'জগৎগত দুঃখের সহিত আমার সম্বন্ধ কেন হইবে না?' তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে—অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপের বিচার করিলে'—জগতে কখনও দুঃখ নাই, কারণ 'যে যে বস্তু উৎপন্ন হয় সেই সেই বস্তু জড় হয়।' 'দুঃখও উৎপন্ন হয় সুতরাং দুঃখও জড় হয়'—আর 'আমি চৈতন্য আত্মায় জড় বস্তু পরমার্থতঃ নাই।' অতএব 'জড় দুঃখস্বরূপ আমি নহি।' কিন্তু ইহাতে পুনরায় সন্দেহ হয় যে 'দুঃখের ন্যায় সুখও উৎপন্ন হয়' 'সুতরাং সুখও জড়।'

আর 'জড় বস্তু মাত্র পরমার্থতঃ থাকেনা অর্থাৎ কল্পিত।' অতএব 'সুখরূপতাও আত্মার হইবে না।' ইহার উত্তর এই যে—যেমন দুঃখ উৎপন্ন হয় সেইরূপ 'আত্মস্বরূপ বলিয়া সুখের উৎপত্তি বিবেকীপুরুষে অঙ্গীকার করেন না।' কিন্তু 'সুখকে নিত্য মানেন।' আর অজ্ঞানী 'আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে' 'সুখরূপ' মানিয়া তাহার উৎপত্তি নাশ অঙ্গীকার করেন। এখন যদি বল, 'অন্তঃকরণ বৃত্তিই' মুখ্য সুখ স্বরূপ কেন হইবে না? তাহার উত্তর এই

যে ঃ—'আন্তঃকরণ বৃত্তির সুখরূপতা মানিলে শ্রুতিযুক্তি বিরোধ হইবে।' কারণ 'শ্রুতি ব্যাপক আত্মাকেই সুখরূপ কহিয়াছেন।' আর 'পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সুখরূপতাকে খণ্ডন করিয়াছেন।' আর অনুমানরূপ যুক্তির দ্বারাও বৃত্তির সুখরূপতা সিদ্ধ হইবে না। কারণ 'যাহা যাহা উৎপত্তি-মান, তাহা সুখরূপ নহে।' যেমন 'দুঃখ উৎপন্ন হয় বলিয়া সুতরাং সুখরূপ নহে।' 'সেইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তিরও উৎপত্তি প্রসিদ্ধ, অতএব তাহা সুখস্বরূপ নহে।' অতএব এতাবৎ শ্রবণ মনন করিয়া এই সিদ্ধ হইল যে ঃ—'ভূমাই আত্মা।' যাহা 'ভূমা'—'ব্যাপক—নিরপেক্ষ' তাহাই 'সৎ, তাহাই চিৎ, তাহাই আনন্দ।' যিনি 'সর্ব্বব্যাপক বা নিরপেক্ষ ব্যাপক তিনি সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান' বলিয়া ঘটপটাদির ন্যায় তাঁহার সত্তা 'পরিচ্ছিন্ন বা সাপেক্ষ নহেন।' তিনি 'ভূমা আনন্দস্বরূপ বলিয়া,' 'বিষয়ানন্দ, বিদ্যানন্দ, যোগানন্দাদি' আনন্দের ন্যায় 'সাপেক্ষ' বা 'পরিচ্ছিন্ন নহেন—তিনি ব্রহ্ম।' সর্ব্বব্যাপক যিনি তাহার 'ভেদক' কেহ নাই, 'ভেদক থাকিলে—পরিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেন—তাহা হইলে তাহার সর্ব্বব্যাপকতার হানি হইত।' এইজন্য শাস্ত্রে—ভেদশূন্যত্বম্—সত্যত্বম্ ভেদশূন্যত্বম্—জ্ঞানত্বম্, ভেদশূন্যত্বম্—আনন্দত্বম্ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'ভেদশূন্য বলিয়া সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও আনন্দত্ব আর পৃথক হইতে পারিল না'—'এক হইল'—'ভূমাই হইল।' 'সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যিনি' তিনিই—'নিরপেক্ষ বৃহৎ'—'দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ তাহাপেক্ষা বৃহৎ' কেহ বা 'কিছু নাই বলিয়া—তিনিই ব্রহ্ম বা ভূমা।' পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে 'জ্ঞান'—'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতে ব্যাপক ও বৃহৎ।' "জ্ঞান ব্যতীত"—'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভিন্ন' অন্য কোন পদার্থ নাই এবং পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে সেই 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়' অপেক্ষা 'জ্ঞান ব্যাপক'

—সুতরাং 'জ্ঞানই সর্ব্বব্যাপক' ইহা নিশ্চয় হইল। এবং সেই জ্ঞান কাহারও অর্থাৎ 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অপেক্ষা' রাখে না বলিয়া 'নিরপেক্ষ' —কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞানের 'অপেক্ষা' রাখে বলিয়া 'সাপেক্ষ'— 'যাহা সাপেক্ষ তাহা'—"পরিচ্ছিন্ন বলিয়া জড়" এবং "জড় বলিয়া জ্ঞানে কল্পিত" এবং 'জ্ঞান নিরপেক্ষ বলিয়া পরিচ্ছিন্ন নহে'— সুতরাং 'জড়ও নহে' অতএব 'অকল্পিত সত্যস্বরূপ' 'ব্রহ্মরূপ।'

এখন 'শব্দ ও জ্ঞান' ('সাধারণ জ্ঞান' অর্থাৎ 'বৃত্তিজ্ঞান') 'অর্থে কল্পিত।' কারণ শব্দ জ্ঞান অর্থেরই হয়—সুতরাং অর্থ ব্যাপক— শব্দ, জ্ঞান ব্যাপ্য। শব্দ কল্পিত—কারণ 'শব্দ নানা বলিয়া' এবং 'শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হয় এবং বাক্যইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যক্ত হয় বলিয়া' 'পরিচ্ছিন্ন এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া জড় সুতরাং কল্পিত' এবং 'বিকল্প বৃত্তির' বিষয় হয় বলিয়াও শব্দ কল্পিত যেমন—বন্ধ্যা পুত্র নরসিংহ ইত্যাদি। আর বৃত্তিজ্ঞানও 'বৃত্তি অবিচ্ছিন্ন' বলিয়া এবং 'বৃত্তির নানাত্বের জন্য' 'পরিচ্ছিন্ন বলিয়া জড় সুতরাং অর্থের কল্পিত।' অতএব 'শব্দ ও জ্ঞান' 'ব্যাপ্য' বলিয়া 'পরিচ্ছিন্ন' এবং সেই জন্যই 'জড়' সুতরাং 'অর্থে কল্পিত।'

এখন 'অর্থ' বলিতে 'অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যকেই বা জ্ঞানকেই বুঝায়।' আর 'জ্ঞাতা' বলিতে 'বৃত্তি আরূঢ় চৈতন্যের—জীব চৈতন্যের সহিত অধিষ্ঠান ব্রহ্ম চৈতন্যের একী ভাবকেই বুঝায়,' আর 'জ্ঞেয়' বলিতে 'বৃত্তি আরূঢ় চৈতন্যের বা জীব চৈতন্যের' 'কর্ম্মভূত' উপাধিকেই বুঝায়।

এখন 'বৃত্তিজ্ঞান' ও 'অনুভব' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজনানুরোধে, তাহাই করা যাইতেছে। "যাহা প্রকাশ্য বস্তু",

"তাহা স্বপ্রকাশ" হইতে পারেনা। যেহেতু **'বৃত্তি প্রকাশ্য বস্তু' সুতরাং 'জড় স্বভাব বৃত্তি' 'স্বপ্রকাশ হইতে পারে না।'** আর আত্মার "স্বপ্রকাশত্ব" স্বীকার না করিলে **"জগদান্ধ্য প্রসঙ্গ"** হইবে তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। **অপরোক্ষৈক রস "ব্রহ্ম চৈতন্যই প্রত্যক্ষ।"** এজন্য "বৃত্তিজ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব"ও ঘটপটাদি "বিষয়ের প্রত্যক্ষ" একরূপ হইতে পারে না। "অপরোক্ষ চৈতন্যে"— "আরোপিত ঘটপটাদি বিষয়" "অভেদে অধ্যস্ত" হইলে "বিষয় প্রত্যক্ষ হয়", এই প্রত্যক্ষ "সকর্ম্মক" হইবার সম্ভাবনা নাই। "স্বপ্রকাশ চৈতন্য প্রত্যক্ষরূপ" বলিয়া **সকর্ম্মক নহে। চৈতন্য স্বপ্রকাশ বস্তু তাহা "অকর্ম্মক।"** এই চৈতন্যে "অভেদে অধ্যস্ত" ঘটপটাদি তাহাও "অকর্ম্মক" বলিয়া "কর্ম্ম আকাংক্ষা" হইতে পারেনা। চৈতন্য প্রকাশরূপ বলিয়া তাহাতে অভেদে অধ্যস্ত ঘটপটাদিও প্রকাশমান হইয়া থাকে। **এই "স্বতঃ প্রকাশমানত্বই" প্রত্যক্ষ "তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম চৈতন্যেই আছে।"** ঘটপটাদি "বিষয়ে যে প্রত্যক্ষত্ব" তাহা "সাক্ষাৎ নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যের অনুগ্রহবশতঃ" হইয়া থাকে। সুতরাং "বিষয় প্রত্যক্ষ" "সকর্ম্মক হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই"—এইজন্য "ঘটপ্রকাশতে" এইরূপ অভিলাপ (শব্দ প্রয়োগ) ঘটের প্রত্যক্ষত্ব দশাতে হইয়া থাকে।

এইরূপ "ঘটভাতি", "দীপ্যতে", "স্ফুরতি" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই **ব্রহ্ম চৈতন্যকেই 'অনুভব' স্বরূপ** বলা হয়। এই **অনুভবের অর্থ "প্রকাশ স্বরূপতা।"** সর্ব্বত্রই এই "প্রকাশ স্বরূপতাকে" 'অনুভব' বলা হইয়া থাকে। আপাততঃ আমরা যেমন মনে করি যে "অনুভব হইলেই" তাহার "অনুভাব্য থাকিবে" অনুভব

"সবিষয়ক" হয় অর্থাৎ "সকর্ম্মক" হয়, "অকর্ম্মক অনুভব" হইতে পারেনা, তাহা "ব্রহ্মস্বরূপ অনুভবের অপরিজ্ঞান" প্রযুক্ত হইয়া থাকে, "অজ্ঞানই" তাহার কারণ। "অনুভব" **শব্দের অর্থ" স্বতঃ প্রকাশ", "সাক্ষাৎ প্রকাশ", অন্যের "অনধীন প্রকাশ।"** এই প্রকাশে "অভেদে অধ্যস্ত" ঘটপটাদিও "প্রকাশ স্বরূপ" হইয়া থাকে। "ঘটাদির প্রকাশত্ব" তাহার "নিজস্ব নহে"। "অধিষ্ঠান চৈতন্যের প্রকাশত্ব লইয়াই" ঘট প্রকাশমান হয়। ইহাই "বিষয়ের প্রত্যক্ষ"। "পরোক্ষ বিষয়ে" "বিষয় প্রকাশতে" "স্ফুরতি' এইরূপ অভিলাপ হয় না। **'বৃত্তিজ্ঞানের প্রত্যক্ষতাতেই সকর্ম্মকত্বের প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে।' বৃত্তিজ্ঞান যখন "প্রত্যক্ষরূপ হইবে তখন তাহাই সকর্ম্মক হইবে।" এস্থলেও "অপরোক্ষানুভবরূপ চৈতন্যই প্রত্যক্ষ" বটে।** তবে যে "সকর্ম্মকত্বের" অনুসন্ধান হইতেছে তাহার কারণ "চৈতন্য নহে" চৈতন্য যে সকর্ম্মক নহে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "চৈতন্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ" তাহার "কর্ম্মাকাংক্ষা" কোথায়, "অজ্ঞান ও বৃত্তিজ্ঞান" এই উভয়েই "সবিষয়ক" বলিয়া **'বৃত্তিজ্ঞান উপরক্ত চৈতন্য' অর্থাৎ "প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকর্ম্মক" বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে।** অন্তঃকরণ বৃত্তি"সবিষয়ক" অর্থাৎ "সকর্ম্মক" বলিয়াই "বৃত্ত্যুপরক্ত চৈতন্যের" "সকর্ম্মকত্ব" প্রতিসন্ধান হয়। এই "বৃত্ত্যুপরক্ত চৈতন্যকে" আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার দশাতে "প্রত্যক্ষানুভব" বলিয়া মনে করি। আর বৃত্তির "সবিষয়ত্ব" অর্থৎ—সকর্ম্মকত্বানুরোধে" "বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও সকর্ম্মকত্ব প্রতীতি হয়" বলিয়া "সর্ব্বত্রই চৈতন্যকে সকর্ম্মক বলিয়া" "ভ্রান্তি" হইয়া থাকে। **বস্তুতঃ বৃত্তিস্থলেও**

সকর্ম্মকত্ব প্রতিসন্ধান "চৈতন্যানুগ্রহত্ব প্রযুক্ত" নহে। তাহা "বৃত্তিরই নিজস্ব।" বৃত্তি যদি বিষয়াকারে আকারিত হইয়া থাকে তাহাই বৃত্তির বিষয় বা কর্ম্ম বলিয়া ব্যবহৃত হয়, "অপ্রকাশমান বৃত্তির অর্থাৎ জড় স্বরূপ বৃত্তির" "প্রকাশ-রূপতা সম্পাদনই" "চৈতন্যের কার্য্য।" যেমন চৈতন্য "বিষয়ের প্রকাশমানত্ব" সম্পাদন করিয়া থাকে তদ্রূপ **বৃত্তিস্থলেও চৈতন্য বৃত্তির প্রকাশমানত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে।** এই 'বেদান্ত রহস্য' 'শ্রুত্যক্ষরানুগত' ও 'পরম গম্ভীর।' ইহার 'অপরিজ্ঞান' জন্য পূর্ব্ব পক্ষিগণের নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষ প্রসারলাভ করিয়াছে। এবং সাধারণ লোকের বেদান্ত সিদ্ধান্ত বুঝিতেও অসুবিধা হইয়াছে। 'বৃত্তিজ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্ব' ও 'বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব' এই জন্যই 'বিভিন্ন রূপে' শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। **"চৈতন্য ভিন্ন" অন্য কোন বস্তুই "প্রত্যক্ষ পদবাচ্য নহে।"** এই চৈতন্যে 'আরোপিত জড় বস্তু-ও প্রত্যক্ষরূপে ব্যবহৃত' হয় তাহা 'জড়বস্তুর নিজস্ব নহে।' এখন 'ঘটং জানামি' এইরূপ 'বৃত্তিজ্ঞানের সকর্ম্মকত্ব' প্রতীতি হয় এবং 'ঘট প্রকাশতে' এইরূপ 'প্রকাশের অকর্ম্মকত্ব প্রতীতি হয়।' **"অকর্ম্মক প্রকাশ" "চৈতন্য" এবং "সকর্ম্মক জ্ঞান" "বৃত্তিই।"** সকর্ম্মক জ্ঞানে 'প্রকাশমানত্ব' তাহা তাহার 'অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যের মাহাত্ম্য।' 'সকর্ম্মকরূপে অনুভূয়মান বৃত্তি' আর 'অকর্ম্মকরূপে প্রকাশমান চৈতন্য' 'কখনই এক হইতে পারে না।' 'ঘটং জানামি' এস্থলে 'সকর্ম্মকরূপে অনুভূয়মান বৃত্তি "ঘটঃ প্রকাশতে" এই স্থলে "অকর্ম্মকরূপে" প্রকাশমান চৈতন্য হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সুতরাং অনুভব হইতে বৃত্তিজ্ঞান অত্যন্ত ভিন্ন প্রতিপন্ন হওয়ায় অর্থাৎ "প্রকাশস্বরূপতা বা ব্রহ্মচৈতন্যরূপ অনুভব-রূপ' ধর্ম্মী হইতে "জড় প্রকাশ্যরূপ ধর্ম্ম বৃত্তিজ্ঞান" 'ভিন্ন' সুতরাং 'কল্পিত হওয়ারই অর্থ" "ধর্ম্মীরূপ অনুভব হইতে ধর্ম্মরূপ বৃত্তিজ্ঞান সরান।" "অনুভব হইতে বৃত্তিজ্ঞান সরানই" জ্ঞানীর 'শেষ সাধন'—তাহা 'সাক্ষীর স্মরণেই' হয়। সেই সাক্ষী ভাব—"আমি কর্ত্তা নহি" এইরূপ হয়। ইহারই স্মরণে কর্তৃভাব নাহি রয়।' স্থূল সূক্ষ্ম কারণ'—"ত্রিবিধ" দেহেতে সাক্ষী সদা "নির্লিপ্ত ভাবেতে" বিদ্যমান। "দেহত্রয় মিথ্যা" বলে সাক্ষীর সহিত 'নিশ্চিত' তাহাদের 'কোন সম্বন্ধ' থাকেনা। 'সাক্ষীতে সর্ব্বভাব জানিবে 'কল্পিত' সাক্ষীতেই তাহে সর্ব্ব জানিবে 'আশ্রিত!' সুতরাং "সর্ব্বকর্ম্ম কালে" "সাক্ষীর স্মরণ করিলে" কদাপি 'বন্ধন' ঘটিবে না।

আর যদি "সাক্ষীর স্মরণরূপ" "জ্ঞান নিষ্ঠা" হয়, তাহলে "সকল কর্ম্মে ব্রহ্ম দৃষ্টি রয়।" 'আমি জ্ঞান আদি' করে 'বৃত্তিজ্ঞান যত' 'সকলই কল্পিত' সেই সাক্ষীতে নিশ্চিত। তিনি 'শুদ্ধ স্বপ্রকাশ অখণ্ড অদ্বয়' 'এই জ্ঞান' সদা তার বিরাজিত রয়। তাহে তার 'কর্তৃবোধ' 'ছায়া সম রয়,' তাহাতে সেজন কভু লিপ্ত নাহি হয়। 'দেহাদিতে আমি বোধ' এতই রয়েছে, যে তাহার অনুভব কভু না হতেছে 'এই অনুভব' কিন্তু 'সর্ব্ব কার্য্যে রয়।' এবে 'এই অনুভব' "অনুভব করি" "যদি ভাব কোন কর্ম্ম আমি নাহি কার" যদি ভাব 'দৃশ্য মাত্র ব্রহ্মেতে কল্পিত,' যদি ভাব 'আমি ভাব' 'দৃশ্যই নিশ্চিত' তাতে 'জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা' "মায়ার কল্পনা",

'সে মায়াও মিথ্যা' বলে যদি হয় জানা, তাহা হ'লে "মুক্তি 'তব তখনই হয়।' ইহাতে কিছুমাত্র নাহিক সংশয়।

এখন এতাবৎ বিস্তারিত ভাবে যাহা বলা হইল তাহার অর্থ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে ঃ—'অহং অজ্ঞঃ' এরূপ অনুভবের বিষয় যে 'অজ্ঞানরূপ মায়া'—সেই অজ্ঞানরূপ মায়াকে বেদজ্ঞপুরুষ 'কারণ শরীর' এই নাম দিয়াছেন। সেই 'কারণ শরীর রূপ মায়া হইতে'— সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর ভেদে দুইপ্রকার 'দৃশ্য প্রপঞ্চ' উৎপন্ন হইয়াছে। সেই প্রপঞ্চ কিরূপ ? 'ভূতভৌতিকরূপ,' তথা 'অধিদেব. 'অধ্যাত্ম অধিভূত স্বরূপ' তথায় জাগ্রত প্রপঞ্চের নাম 'স্থূল'। আর স্বপ্ন-প্রপঞ্চের নাম 'সূক্ষ্ম'. আর মায়ারূপ অবিদ্যায় নাম 'সুষুপ্তি'। সেই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন শরীর অধিকারী পুরুষের পরিত্যাগ করিবার যোগ্য।

'স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিনের পর যে বস্তু' তাহাকে বেদজ্ঞ "তুরীয়" এই নাম দিয়াছেন। সেই তুরীয়ও 'ওত, অনুজ্ঞাতা, অনুজ্ঞা অবিকল্প' ভেদে চারিপ্রকার। 'অধিদেবরূপ সাক্ষী আত্মার' যে 'ওতাদি চার অবস্থা' সেই ওতাদি অবস্থাকে না পাওয়ার জন্য 'স্থূল সূক্ষ্ম কারণ' এই "তিন শরীরের অভিমানই প্রতিবন্ধক হয়।" সেই দেহাভিমানের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বানপুরুষ সমাধি ও ব্যুত্থানকালে বাহ্য অন্তর বিশ্বকে ব্রহ্মরূপ করিয়া অনুভব করেন। সেই "ব্যুত্থানকালে সর্ব্ববিশ্বকে প্রকাশ করে যে চৈতন্য", সেই চৈতন্যকে বেদজ্ঞপুরুষ 'ওত' এই নাম দিয়াছেন। আর সবিকল্প সমাধিকালীন যখন ধ্যাতা ধ্যান ধ্যেয় এই ত্রিপুটী করিয়া যুক্ত সেই "সবিকল্প সমাধিস্থিত যে বিদ্বান পুরুষ এই সর্ব্ববিশ্বকে ব্রহ্মরূপ" করিয়া দেখেন। সেই, 'সবিকল্প

সমাধিকালে যে চৈতন্য সর্ব্বাবিশ্বের সত্তাকে প্রাপ্তি করায়' সেই চৈতন্যকে বেদত্ত পুরুষ 'অনুজ্ঞাতা' এই নাম দিয়াছেন। আর যিনি "নির্বিকল্প সমাধিস্থিত" বিদ্বানপুরুষ ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ইত্যাদি সর্ব্ব ত্রিপুটিকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব জগতের সত্তাকে আকর্ষণ করেন যে চৈতন্যরূপ আত্মাকে অনুভব করেন সেই চৈতন্যরূপ আত্মাকে বেদজ্ঞ পুরুষ 'অনুজ্ঞা' এই নাম দিয়াছেন। আর যে কালে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা সংসাররূপ শূলের মূলীভূত অজ্ঞান নাশপ্রাপ্ত হইবে, তথা মনবাণীর অবিষয়রূপ যে স্বয়ংজ্যোতি আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে বিদ্বানপুরুষ অবিষয়তারূপ করিয়া দেখিলেও "বিষয়তারূপ করিয়া দেখেন না।" আর এই আমি হই, এই অন্য হয়—ইত্যাদি "ভেদকে দেখেন না।" তথা সেই ভেদের অভাবকেও দেখেন না। তথা "আমি জীবিত থাকি", আমি "আমিই হই ইত্যাদি" বিশেষকে ও দেখেন না। সেই কালেস্থিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে বেদজ্ঞপুরুষ "অবিকল্প" এই নাম দিয়াছেন।

যেরূপ জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা ভেদদোষ যুক্ত বলিয়া সেই জাগ্রদাদি অবস্থা পরিত্যাগ করিবার যোগ্য, সেইরূপ এই তুরীয় আত্মার 'ওত' 'অনুজ্ঞাতা', 'অনুজ্ঞা' এই তিনরূপও সেই ভেদরূপ দোষ করিয়া যুক্ত। সেইজন্য অধিকারী পুরুষের সেই ওতাদি তিনরূপও পরিত্যাগ করিবার যোগ্য। আর সেই তুরীয় আত্মার যে চতুর্থ অবিকল্প স্বরূপ তাহা মন বানীর অবিষয় তথা দ্বৈত প্রপঞ্চ রহিত আনন্দ স্বরূপ তথা শরীররূপ দ্বারকা পুরীতেস্থিত সর্ব্ব আশ্রয়তে রহিত তথা

সর্ব্ব ভেদতে রহিত মায়াতে রহিত স্বয়ং জ্যোতিরূপ। তথা সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়কমলে সর্ব্বদা সাক্ষীরূপ করিয়া ভাসমান। **এইরূপ অবিকল্প স্বরূপ আত্মাদেবকে অধিকারী পুরুষ ঘটাদি দৃশ্য পদার্থের ন্যায় ইদন্তারূপ করিয়া না দেখিলেও অহং অস্মি এই প্রকার প্রত্যকরূপ করিয়া দেখেন।** ইহাই পরম ফলরূপ জ্ঞানের স্বরূপ। আর অবিকল্পরূপ আত্মার জ্ঞানই শাস্ত্রের প্রয়োজন।

এখন এই অর্থকে স্পষ্ট করিবার জন্য প্রথম সেই অবিকল্প আত্মার জ্ঞানে অসম্ভবনার দৃষ্টান্তের দ্বারা নিবৃত্তি করা যাইতেছে। যেমন আকাশে গন্ধর্ব নগর কল্পিত হয়, সেইরূপ আনন্দস্বরূপ আত্মার এই মায়াদি দ্বৈত প্রপঞ্চও কল্পিত হয়। যেমন নিরবয়ব আকাশের কল্পিত কোন একদেশে সেই একদেশে আকাশের বাস্তব স্বরূপের অজ্ঞানে সেই গন্ধর্ব নগরের কল্পনা হয়। **সেইরূপ বাস্তবিক নিরবয়ব আত্মার কল্পিত কোন এক দেশে সেই এক দেশে সেই আত্মার বাস্তব স্বরূপের অজ্ঞানে সেই মায়াদি প্রপঞ্চের কল্পনা হইতেছে।** যেমন আকাশের বাস্তব স্বরূপের জ্ঞানে সেই গন্ধর্বনগর লয় ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মার বাস্তব স্বরূপের জ্ঞানে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ লয়ভাব প্রাপ্ত হয়। আর যেমন আকাশের জ্ঞানে কেবল গন্ধর্বনগরই নিবৃত্তি হয় না কিন্তু সেই গন্ধর্বনগরে কারণরূপ যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানও নিবৃত্তি হয়। **সেইরূপ এই আনন্দস্বরূপ আত্মজ্ঞানে কেবল এই কার্য্য প্রপঞ্চেরই নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু কায্য প্রপঞ্চের কারণরূপ যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয়।** আর অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তির জন্য অধিষ্ঠানের অপরোক্ষ জ্ঞানই অপোক্ষিত হয়। পরোক্ষজ্ঞানে অপরোক্ষ

ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। যেমন পূর্ব্বাদি দিকে পশ্চিমাদি দিকের ভ্রম হয়, সেই অপরোক্ষ ভ্রমের পূর্ব্বাদিদিকের পরোক্ষ জ্ঞানে নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু সেই পূর্ব্বাদিদিকের অপরোক্ষজ্ঞানেই সেই অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ এই **আত্মদেবের পরোক্ষজ্ঞানে এই অপরোক্ষরূপ সংসার ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না।** কিন্তু এই **আত্ম-দেবের অপরোক্ষজ্ঞানেই এই সংসারভ্রমের নিবৃত্তি হয়। যেমন একই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ নিদ্রাদোষের বশে অনেক প্রকার হইয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ** এই **একই আত্মদেব আপনার স্বরূপের অজ্ঞানে অনেক প্রকার প্রতীত হন।** এই খানে এই সংশয় হয় যে, যেমন মধ্যাহ্ন সূর্য্যে অন্ধকারের স্থিতি সম্ভব নহে, সেইরূপ ভাসমান স্বয়ং জ্যোতি আত্মায় এই অজ্ঞানের স্থিতি সম্ভব নহে। এই সংশয় ভঞ্জন এইরূপে হয়—যে, এই মায়া অত্যন্ত দুর্ঘট ও দুস্তর। তথা ইহা জীবকে অত্যন্ত দুঃখ দেয়, আর এই সংসার রূপ শূলের জননী এইরূপ মায়াকে শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ অঘটিত-ঘটনা-পটীয়সী এই নামে বলিয়াছেন। **সে আপনার স্বভাবের বলেই এই মায়া সেই স্বয়ংজ্যোতি আত্মাতে স্থিত হয়।** যেমন ইহলোকে বৃশ্চিক আপন গর্ভতেই নাশ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সর্বভেদ রহিত এই আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে বিষয় করে যে মহাবাক্য জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ জ্ঞান, সেই জ্ঞানরূপ গর্ভেই এই মায়ারূপ বৃশ্চিক নাশ প্রাপ্ত হয়। এই অবিদ্যারূপ মায়া আনন্দস্বরূপ সাক্ষী আত্মা হইতে কখনও ভয় পায় না। কিন্তু মহাবাক্যতে উৎপন্ন যে অন্তঃকরণ বৃত্তি, সেই **বৃত্তিতে স্থিত সেই সাক্ষী আত্মার প্রতিবিম্বকে এই মায়া সর্ব্বদা ভয় প্রাপ্ত হয়।** তাৎপর্য্য এই

হয়ঃ—যেমন কাষ্ঠকে প্রকাশ করিলেও অগ্নি কুঠারাদিরূপ লৌহে স্থিত হইয়াই সেই কাষ্ঠকে ভেদ করে সেইরূপ এই আত্মদেব আপন সাক্ষীরূপ করিয়াই মায়ার সাধক হইয়াও মহাবাক্য জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তিতে স্থিত হইয়া সেই মায়ার বাধক হন। এই জন্যই বেদবেত্তা পুরুষ এই অনাদি মায়াকে নাশ করিবার জন্য এক মহা-বাক্য জন্য আত্মজ্ঞানরূপ উপায়ই বলিয়াছেন। সেই আত্মজ্ঞান বিনা অন্য কোন উপায় নাই। যেরূপ ইহলোকে মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া অনেক প্রকার দুঃখদায়ক যে কোন পিশাচ কোন মহামন্ত্র করিয়াই নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ এই জীবের জন্মমরণাদি অনেক দুঃখ প্রাপ্তি করে যে এই "মায়ারূপ পিশাচী" হয়, সেই মায়ারূপ পিশাচী ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানরূপ মহামন্ত্র করিয়াই নাশ প্রাপ্ত হইবে। সেই আত্মজ্ঞান বিনা অন্য কোনও উপায় দ্বারা এই মায়ারূপ পিশাচী নাশ প্রাপ্ত হইবে না। সেইজন্য যে মুমুক্ষুজন শান্তি আদি গুণ যুক্ত তথা চিত্তের একাগ্রতা-যুক্ত, তথা মায়ারূপ পিশাচীকে ভয় করে, সেই মুমুক্ষুজন ব্রহ্মবেত্তা গুরুর নিকটে গিয়া এই আত্মজ্ঞানরূপ মন্ত্র সম্পাদন করে। এই "আত্ম-জ্ঞানই" বেদান্ত শাস্ত্রে প্রয়োজন। সেই মুমুক্ষুজন এই আত্মজ্ঞান অবশ্য করিয়া সম্পাদন করিবার যোগ্য। এই আত্মজ্ঞান হইতে ভিন্ন উপায় গ্রহণ করিলে সেই পুরুষ পুনঃপুনঃ সংসারকেই প্রাপ্ত হইবে। সেইজন্য আত্মজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোনও উপায় এই অধিকারী পুরুষের করিবার যোগ্য নয়। এখন এই আত্মজ্ঞানের জন্য "সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান" প্রয়োজন অর্থাৎ "সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞানবানই তত্ত্বজ্ঞানী"। সেই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞানই প্রয়োজন। কারণ জ্ঞাতব্য যাহারা জানেন দর্শন শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বলে।

সৃষ্টিতত্ত্বই তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য।

সৃষ্টিতত্ত্ব দুই প্রকার "বাহ্য জগৎ" বা "বিরাট দেহ" "অন্তর্জগৎ বা মানব দেহ"। "জগৎ কি? আমি কি"? এই দুইটী তত্ত্ব জানিলেই সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝা হয়। কস্মাৎ কোঽহং কিমপি চ ভবান্ কোঽয়মন্য প্রপঞ্চ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্ঞাতব্য যে কি তাহা অনেক স্থলে তত্ত্বজ্ঞানিগণ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ "বাহ্য জগৎ" কি, তৎসম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে। আর্য্যদিগের দর্শনশাস্ত্র সমূহে একই মত ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। "দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া" দ্বারাই যে সমুদয় সৃষ্টি ইহা সকলে স্বীকার করেন, এবং তত্ত্বজ্ঞানী যোগীদেরও এইরূপ উপদেশ।

ইহাদের মধ্যে "দ্রব্যতত্ত্ব নিত্য", অর্থাৎ 'যাহার কখন অভাব হয় না তাহাই দ্রব্য'। 'গুণ' সেই "দ্রব্যে লীন" হইয়া থাকে যখন তাহা দ্রব্য হইতে প্রকাশ পায় তখনই তাহাতে "ক্রিয়া শক্তির" আবির্ভাব হয়। "দ্রব্য একমাত্র, বুদ্ধির অতীত অনন্ত অবকাশ মধ্যে অপরিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত।" গুণ তিন প্রকার—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। ইহাদের দ্বারা "শক্তি" চালিত হয়। শক্তির দুই প্রকার গতি—"প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।" গুণশক্তির প্রভাবে প্রবৃত্তিবেগ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, "আবরণ—বিক্ষেপ" এই দুই প্রকার ক্রিয়াশক্তি সমুদ্ভূত হয়। গুণশক্তি দ্রব্যের নিত্য সত্তায় সত্তবতী হইয়া এবং আভ্যন্তরিক গুণের দ্বারা চালিত হইয়া এই দুই ক্রিয়াশক্তি সহকারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদনেই বহুবিধ আকারে পরিণত হইয়াছে। সেই সকল শক্তির দ্বারা স্থুল, সূক্ষ্ম, অনন্ত আকার বিশিষ্ট এই বিশ্ব সংসার সৃজন পোষণ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। শক্তির বেগ প্রভাবে নিঃসৃত পরমাণু

সকল একদিকে "আবরণ শক্তির" দ্বারা সংশ্লিষ্ট হইয়া "রূপ বা আকার" ধারণ করিতেছে। অপরদিকে "বিক্ষেপ শক্তির" প্রভাবে পরমাণু সকল "বিশ্লিষ্ট হইয়া রূপান্তরে পরিণত হইতেছে।" তাহারা পুনর্ব্বার নূতন ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া অন্য পদার্থের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং এই **ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমরা যাহা কিছু পদার্থ বলিয়া দেখিতেছি তাহা কেবল "গুণ ও শক্তির" রচিত আকার মাত্র।** কিন্তু এইরূপ গুণ শক্তির প্রভাবে যে দ্রব্য নিয়তই রূপ হইতে রূপান্তরে প্রতিভাত হইতেছে, সেই দ্রব্যের স্বরূপ কি—তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। **গুণশক্তির প্রভাবে দ্রব্যের প্রকৃত ভাব সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে।** তাহার (দ্রব্যের) **বিকৃত ভাবই কেবল আমাদের উপলব্ধি হইতেছে।** অতএব তত্ত্বজ্ঞানিগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে **গুণশক্তি নিঃশেষে বিরাম হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই নিত্যবস্তু।** যদি এইরূপ অনুমান করা যায় যে গুণশক্তির নিঃশেষে বিরাম হইলে পরমাণু মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইটী বিজ্ঞান-সঙ্গত হয় না। কারণ পরমাণু সকল পরস্পরের আকর্ষণে অবস্থিত সুতরাং সে অবস্থায়ও ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান থাকে। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানিগণ বলেন যে গুণশক্তির বিরামে পরমাণু পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া অবশেষে **গুণশক্তির অতীত অথচ গুণশক্তির আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র নিত্য বস্তু অপরিচ্ছিন্ন ভাবে অবশিষ্ট থাকেন,** তাহা **"ব্রহ্মনামে" অভিহিত।** বাহ্যজগতের বিচার করিয়া সেই নিত্য বস্তুর কেবল "পরোক্ষ জ্ঞানই" লাভ করা যায়—"অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ" জ্ঞান লাভ করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ "অন্তর্জগৎ বা আমি কি"—তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা

যাইতেছে। মানবদেহ একটি যন্ত্র মাত্র। ভৌতিকতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব এই তিন প্রকারতত্ত্বে নির্ম্মিত। "ক্রিয়াশক্তি-প্রধান" অবয়ব বিশিষ্ট স্থূলদেহ "ভৌতিকতত্ত্বে নির্ম্মিত"। "ইচ্ছাশক্তি প্রধান" সূক্ষ্মদেহ "শক্তিতত্ত্বে নির্ম্মিত।" এবং "জ্ঞানশক্তি প্রধান" সংস্কারের আধার স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় শরীরের বীজ কারণদেহ "জ্ঞানতত্ত্বে নির্ম্মিত।" আত্মতত্ত্বজ্ঞানী যোগিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, যে কিছু শক্তি বা গুণ ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সেই সমস্তই মানব শরীরে নিহিত হইয়াছে। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সর্ব্বে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ" এইরূপ বাক্য আর্য্যশাস্ত্রে অনেক স্থানে দেখা যায়। আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে অনেকেই বলেন Internal is the typical of the External" অর্থাৎ অন্তর্জগৎ বাহ্যজগতের অনুকরণ, যুক্তিও ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। অন্নরূপ জগৎ পদার্থ হইতে শুক্র শোণিতের উৎপত্তি। শুক্রশোণিত হইতেই দেহ। আহার জাত রসের স্বরূপ জগৎ পদার্থের দ্বারাই মানব যন্ত্রের স্থূলদেহ ও ক্রিয়াশক্তি সকলের পোষণ হইতেছে। জগতের নিয়মের অধীনই এই দেহের স্থিতি। ইহার জ্ঞানশক্তি সমস্ত অন্তরে আছে এইমাত্র, দেহের অভ্যন্তরের তাহারা কিছুই জানেনা, জগৎ পদার্থেই তাহারা একান্ত গ্রথিত। অর্থাৎ জগৎ পদার্থের জ্ঞানেই জ্ঞানশক্তিরও পোষণ হইতেছে। ধ্বংস হইলে দেহ পদার্থ সমূহ জগতেই মিলিত হয়। **অতএব এই জগতই দেহের জনক পালক এবং আশ্রয়।** আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সমস্তই জগতে আছে। যাহা জগতে নাই এমন অভাব আমাদের কখন অনুভব হয় না। "জনকের গুণ জন্য পদার্থে বর্ত্তমান" যদি প্রকৃতির নিয়ম থাকে, তবে এই দেহ যন্ত্র অবশ্যই বাহ্যজগতের অনুকরণ

বলিতে হইবে। তবে উভয়ের গুণ ও শক্তি সকল আমরা যদি ঐক্য করিয়া বুঝিতে না পারি তাহা আমাদের বুদ্ধির দোষ। এই নিমিত্ত আর্য্যজ্ঞানিগণ এই "দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই নিমিত্তই দেহযন্ত্রকে অন্তর্জগৎ বলা যায়।

এই দেহ যন্ত্রের স্থূলভাগ ও সূক্ষ্মভাগ অর্থাৎ **স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে "জ্ঞান একমাত্র অধিষ্ঠাতা।"** "আমি" একটি ভাব মাত্র জ্ঞানে প্রকাশ পায়। দেহের জাগ্রদবস্থায় "কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত" জ্ঞান শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইকালে "অহংভাবও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে।" স্বপ্নাবস্থায় যখন জ্ঞান স্থূল-দেহ হইতে আকৃষ্ট হইয়া ইচ্ছাশক্তিময় ও জ্ঞান শক্তিময় সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিতি করে তৎকালে সেই মনোময় সূক্ষ্ম শরীরে অহংভাব প্রবল হইয়া থাকে। গভীর "নিঃস্বপ্ন নিদ্রাকালে" যৎকালে জ্ঞান স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করিয়া "নিশ্চেষ্ট ভাবে কারণশরীরে অবস্থিতি" করে তৎকালে অহংভাবও এককালে ক্ষীণ হইয়া জ্ঞানেই লীন হইয়া থাকে। কারণ জাগ্রত হইয়া উঠিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইতেছে যে আমি ঘোরতর নিঃস্বপ্নে নিদ্রিত ছিলাম। এই অবস্থা স্মরণ হওয়াতে স্মৃতির নিয়মানুসারে সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই **নিঃস্বপ্ন অবস্থা জ্ঞানের দ্বারা তৎকালে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল বলিয়া পরে স্মরণ হইতেছে।** এইরূপে **জ্ঞান তিন দেহে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে।**

বুদ্ধি, স্মৃতি, অহং জ্ঞান ইহাদিগের সমষ্টিকে অন্তঃকরণ যন্ত্র বলা যায়। এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় যন্ত্র বলে। জ্ঞান যখন অন্তঃকরণ যন্ত্রে অবস্থিত

হইয়া একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে থাকে, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় যন্ত্র সত্ত্বেও বাহ্য পদার্থ জ্ঞানে প্রকাশ পায় না অথবা প্রকাশ ভাবের হ্রাস হয়। যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় যন্ত্রের দ্বারা বাহ্য জগতে একাগ্রভাবে সংযোজিত হয় তখন অন্তঃকরণ যন্ত্রের ক্রিয়া প্রকাশ পায়না ; অথবা তাহার ক্রিয়া-শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। **অতএব জ্ঞান অন্তঃকরণ যন্ত্রের, বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রিত বা বদ্ধ থাকিয়া আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে।** ক্রিয়া পুনঃপুনঃ করিলে অভ্যাসজনিত একটি সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কার সঞ্চিত ব্যাপারই স্মৃতি পথে অধিকাংশ সময়ে উদয় হয়, সেই ব্যাপার ঘটিত পদার্থও ক্রিয়া সমূহই চিন্তারূপে জ্ঞানে প্রকাশ পায় সুতরাং **জ্ঞান প্রকৃতি যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে বলিয়া "জ্ঞানকে দ্রব্য" বলা হয়।** জ্ঞানেন্দ্রিয় যন্ত্রগণ "জ্ঞানের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে" বাহ্য জগৎ প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান, ইন্দ্রিয় যন্ত্রের সহায়তা ব্যতিরেকেও শ্রবণ, স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ও তাহার ব্যাপ্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধস্বরূপ জগৎ পদার্থ, উভয়কেই প্রকাশ করিতেছে। জগৎপদার্থ যদি সৃষ্টির বিষয় হয়, তাহা হইলে 'যেন দেখিতেছি' অর্থাৎ "দর্শন ক্রিয়া ও দৃশ্যবস্তু উভয়ভাব প্রকাশ পায়।" এইস্থানে জ্ঞান শ্রবণ ক্রিয়ার ভাব ধারণ করিলে তাহাতে দর্শন ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ পায় না, এবং অন্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। **অতএব জ্ঞান ইন্দ্রিয় যন্ত্রে যন্ত্রিত।** "ক্রিয়ার ভাব ও ক্রিয়ার ব্যাপ্য বিষয় অর্থাৎ কর্ম্ম" এই উভয়ভাব জ্ঞানে প্রকাশ পাইলে প্রকৃতির নিয়মানুসারে এই প্রকাশ করা ক্রিয়াতে "কৃতভাব" প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন হইতেছে। তাহাতে ঐ উভয়ের প্রকাশক জ্ঞান স্বয়ং কর্ত্তারূপে প্রকাশ পাইল। ঐস্থলে

যন্ত্রিত জ্ঞানের দুই শক্তি প্রকাশ পাইতেছে—"প্রকাশ করা ও স্বয়ং প্রকাশ হওয়া।" রাগ, দ্বেষ, ভয়, লজ্জা, শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, ভক্তি ও প্রেম **এই সকল "ভাব দ্বারা" অন্তঃকরণ চালিত হয়।** এই সকল ভাব বাহ্যকরণের সংযোগ না থাকিলেও জ্ঞানে প্রকাশ পায়, এবং "সকল ভাব এককালে প্রকাশ পায় না।" **সেই সকল "ভাব গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া" অন্তঃকরণে উদয় হয়,** গুণ তিন প্রকার—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যখন যে ভাব প্রকাশ হয় সেইমত ভাব অন্তরে উদয় হয়। এই **তিন গুণের দ্বারা জ্ঞান যন্ত্রিত।** সুতরাং জ্ঞানে গুণ ও শক্তি উভয়ের ভাব লক্ষিত হয়। সেই সকল "গুণ ও শক্তি" দেহ যন্ত্রের প্রকৃতিগত। দেহ যন্ত্রের প্রকৃতি অনুসারে "গুণ ও শক্তি" সমূহের ভেদ দেখা যায়। সেই সকল প্রকৃতি-গত গুণশক্তি দ্বারা দেহ যন্ত্রে যন্ত্রিত হইলে, "জ্ঞান সংযত ও সঙ্কুচিত" হইয়া "অহংভাবে প্রকাশ" পায়। প্রত্যেক দেহ যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন গুণ শক্তির দ্বারা যন্ত্রিত বলিয়া একমাত্র "অহংভাব" প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং "দেহ ব্যতিরিক্ত পদার্থে ভিন্ন বা পরভাব" এবং "দেহে আত্মভাব" জন্মাইতেছে। এই জন্যই সিদ্ধান্ত করা হয় যে "আমি" বলিলে কোন "বিশেষ পদার্থ" লক্ষিত হয় না।

এটী **একটী ভাব মাত্র।** গুণ শক্তি দ্বারা জ্ঞান এই দেহ যন্ত্রে যন্ত্রিত হইলেই—এই ভাব প্রকাশ পায় এবং জ্ঞানের সঙ্গে অবস্থান্তরিত হয়। সুতরাং **"গুণশক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানই" দেহের অধিষ্ঠাতা, তাহাকেই উক্ত জ্ঞানিগণ "জীব বা আত্মা" বলিয়া বর্ণনা** করিয়াছেন। এই **"জ্ঞানই প্রকৃত অহংভাব বা আমি।"**

জগৎ পদার্থ বা জীবদেহ, গুণ শক্তির প্রকাশিত বিকার মাত্র ইহা পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি সমস্তই বিকৃত ভাব। জগতের প্রকৃত অবস্থা বা ভাব কি তাহা গুণশক্তির বিরাম না হইলে জানা যায় না। জানিবার উপায় জ্ঞান। সেই জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ্য এবং অন্যের প্রকাশক হইয়াও গুণশক্তির দ্বারা এরূপ যন্ত্রিত যে, বাহ্য জগতের গুণশক্তিময় বিকৃত আকার ধরিয়াই ইহা নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছে। জগৎ আকার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ংপ্রকাশভাবে কখনই অবস্থিতি করিতে পারে না। জ্ঞানের সংযোগ ব্যতিরেকে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় গৃহীত বিষয় সকল, ইন্দ্রিয় মনের সংযোগ ব্যতিরেকেও "জ্ঞান আপনাতে প্রকাশ করিতে সমর্থ।" স্নুতরাং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় প্রকাশ করিবার শক্তি জ্ঞানেতে নিহিত। এই প্রকার শক্তি সত্ত্বেও ইহা (জ্ঞান) আভ্যন্তরিক বিষয় বা অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা গুণশক্তির দ্বারা এইরূপ যন্ত্রিত যে দেহের অভ্যন্তরে থাকিয়াও জগচ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও অভ্যন্তরে স্থির থাকিতে পারে না। স্নুতরাং আভ্যন্তরিক প্রকৃতভাব প্রকাশ করিতেও সমর্থ হয় না।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণ করিয়াই "জ্ঞান" জগৎ পদার্থ সমস্ত অবগত হইতেছে! পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান এই পাঁচটীর অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিন্তু এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় গুণশক্তির দ্বারা রচিত। জ্ঞানও স্বয়ং গুণশক্তির দ্বারা যন্ত্রিত; গুণশক্তির রচিত বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে। গুণশক্তির বিরাম হইলে পদার্থের যে প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায়, তাহা গুণশক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানের ধারণ করিবার ক্ষমতা

নাই। গুণশক্তি যুক্ত অবস্থার জ্ঞান, গুণশক্তি বিরামের অবস্থাপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতভাব অনুভব করিতে পারিবে না। জ্ঞানীর মন যেরূপ-ভাবে ভাবিত হইয়া বা যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া আহারাদি রূপ ব্যাপার বিস্মৃত হয় আহারলোলুপ ভোগমাত্র অভিলাষী চিন্তাহীন অজ্ঞানী ব্যক্তির মনে তাহার অনুস্মৃতি হওয়া কখনই সম্ভব নহে। সেইভাব বা অবস্থা অনুভব করা কেবল সেইরূপ অবস্থাপন্ন চিত্তেরই সম্ভব। অতএব গুণশক্তি বিরামে যে দ্রব্য ভাব বা অবস্থা প্রকাশ পায়, তাহা গুণশক্তি যুক্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ পাইতে পারে না। তাহা জানিতে হইলে জ্ঞানের গুণশক্তি বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞানের শক্তি—"চিন্তা"। চিত্তবৃত্তিকেও চিন্তা বলে, "চিত্ত" জ্ঞানের একটী অবস্থা বিশেষ। সুতরাং চিন্তা বা চিত্তবৃত্তিকে নিঃশেষে বর্জ্জিত করিতে পারিলেই জ্ঞান, শক্তিবর্জ্জিত হয়। এই "চিন্তা বা বৃত্তির বর্জ্জনকেই" তত্ত্বজ্ঞানীরা "যোগ" বলেন। "সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ নিশ্চিন্তোযোগ উচ্যতে।" প্রমান্তরে "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ক্রোধ, মোহ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি "অন্তঃকরণের ভাব" সমস্ত "জ্ঞান শক্তির বা চিন্তার পরিচালক" এবং "ভাবসমূহের পরিচালক" "গুণ"। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এই কয়েকটী যোগাঙ্গ অভ্যাসেই "অন্তঃকরণের ভাব" সমূহ তিরোহিত হয়। ভাব সমস্ত তিরোহিত হইলে, অভ্যাসের বলে গুণেরও প্রভাব তিরোহিত হইয়া যায়। গুণশক্তির প্রভাব রহিতের কৌশল রাজযোগে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই যোগাভ্যাসের চরম ফল সমাধি যোগ অভ্যস্ত হইলে, গুণশক্তির নিঃশেষে বিরামাবস্থায় যে "কেবলমাত্র চেতনময়দ্রব্য, অবস্থা বা ভাব অবশিষ্ট থাকে," জ্ঞান সেই আকারে আকারিত হয়। ইহাই

বৌদ্ধদিগের "শূন্য।" জড়শক্তিবাদীদিগের "দ্রব্য ও শক্তির" মিলিত অবস্থা। ইহা যন্ত্রিত জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত, ও তত্ত্বজ্ঞানী যোগিগণ মধ্যে "পরমাত্মা" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। তৎকালে সেই জ্ঞান আর দেহমধ্যে অহংভাবে যন্ত্রিত থাকে না, অনন্ত বিষয় পদার্থের অন্তরে ও বাহ্যে অপরিচ্ছিন্ন স্বয়ং প্রকাশ ভাবে ব্যাপ্ত হয়। সেই অবস্থা, এইরূপ অহংভাব যুক্ত জীব অবস্থায় থাকিয়া অনুভব করা যায় না। মানব যন্ত্রের উচ্চতম জ্ঞান ও বুদ্ধির এই চরম সীমা।

এখন সমাধি সম্বন্ধে পুনরায় কিছু বলার প্রয়োজন। "সমাধির উদ্দেশ্য—আনন্দই"। সেই সমাধি দুইপ্রকারে করা যায়—"ধ্যানধারণা ও অন্যান্য যোগাঙ্গ দ্বারা" এবং "মহাবাক্য বিচার দ্বারা"। যোগাঙ্গ দ্বারা যে সমাধি লাভ করা যায় তাহা "পরিচ্ছন্ন আনন্দ"। এবং "মহাবাক্য বিচার দ্বারা যে সমাধি উপস্থিত বা উদ্‌ভাসিত হয় তাহা অসীম অপরিচ্ছন্ন আনন্দ।"

প্রতিনিয়ত প্রতিকর্ম্মে জীবগণ যে অজ্ঞাতপূর্ব্বক যোগাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করে, উহা বিষয়-ইন্দ্রিয় সংযোগ জন্য পরিচ্ছিন্ন আনন্দের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পরিচ্ছন্ন আনন্দ সমাধিলভ্য আনন্দ সিন্ধুর বিন্দুমাত্র। ব্রহ্মাবধি পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই আনন্দের অন্বেষী। জীবের ক্রিয়ামাত্রই আনন্দ পাইবার জন্য। অন্ধের মত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া জীব ছুটিতেছে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য একটু আনন্দ। জীবের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও অধর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ের মূল আনন্দ পাইবার জন্য, আনন্দাংশে উভয়েই তুল্য; কারণ "আনন্দ ব্রহ্ম" আনন্দই ব্রহ্ম-আনন্দই আত্-মা বা মা। সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের বা আত্মার সৎ-স্বরূপটী বিশিষ্টভাবে জড়পদার্থে প্রতিভাত।

মা বা আত্মা যে "সৎস্বরূপ অর্থাৎ আছেন" তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য, এ পরিদৃশ্যমান জড়পদার্থরূপে তিনি সতত প্রকটিত অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থ "আছে" অস্তিরূপে ভাসিত হইতেছে। মা বা আত্মা যে চিন্ময়ী তাহা বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য তিনি প্রাণীরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, প্রাণীতেই চৈতন্যসত্তার বিশিষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দ বিশেষ ভাবে কেবল আত্মাতেই বিদ্যমান। আনন্দ আর কোথাও নাই। প্রতিজীবে যে বিষয় ভোগজনিত আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায় উহা সেই—আনন্দ সমুদ্রেরই এক একটী বিশিষ্ট বুদ্‌বুদ্ মাত্র। অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহের জন্য প্রাণীর যে চেষ্টা, তখন তাহার ইন্দ্রিয় ও মন তদুদ্দেশ্যে অভীষ্ট বস্তু উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। বুদ্ধিও তখন আনন্দ সমুদ্র হইতে যেন বিচ্যুত হইয়া বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে। তাহার পর অভীষ্টবস্তু লাভ হয় তখন ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়। তখনই আনন্দের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। তাহাই আনন্দলাভ। কিন্তু জীব মনে করে যে অভীষ্টবস্তুই আনন্দ প্রদান করে। "ইহাই অজ্ঞান।" বিষয়ে' আনন্দ নাই. আনন্দ 'বুদ্ধিতে নিয়ত প্রতিবিম্বিত।" "যখন বুদ্ধি সে প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তখনই জীব আনন্দচ্যুত বা নিরানন্দ হইয়া পড়ে"; আবার বুদ্ধির স্থৈর্য্যে সে আনন্দ উপলব্ধি যোগ্য হয়।

এখন আনন্দ এক অখণ্ডস্বরূপ বা বিভিন্ন এইরূপ সংশয় শাস্ত্রানভিজ্ঞের হয়। কাঞ্চনলাভে যেরূপ আনন্দের অনুভূতি হয়, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় তদপেক্ষা ভিন্নপ্রকার আনন্দের উপলব্ধি হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, **আনন্দ বস্তু এক এবং অখণ্ড হইলেও**

বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বৈচিত্র্যবশতঃ উহা আমাদের নিকট বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আমাদের যে ইন্দ্রিয় যখন যেরূপ (বিশেষ) ভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেই ইন্দ্রিয়ের "তৃপ্তিগত বিভিন্নতাই" আনন্দগত বিভিন্নতার প্রতীতির হেতু।

আনন্দের অভাব কোথাও নাই। এ জগৎ আনন্দে ভরা। শোকার্ত্তের করুণ ক্রন্দন, রোগার্ত্তের হতাশব্যঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাস, ক্ষুধার্ত্তের কাতর চিৎকার, ঐ সকলই আনন্দের অভিব্যঞ্জক। মানুষ ঐরূপ কাঁদিয়া, হাহাকার করিয়া, আনন্দের সন্ধান পায়; তাই ঐরূপ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি এই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তর্নিহিত আনন্দরসপ্রবাহের সন্ধান পান, তিনি জগতে যাবতীয় দুঃখ শোক সন্তাপ যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করিয়াও নিত্য নিত্যানন্দ সম্ভোগে কৃতার্থ হন। সাধক এই অখণ্ড আনন্দসমুদ্রের অন্বেষী; কিন্তু ধ্যান ধারণাদি বিষয়ানন্দে মগ্ন। আনন্দময় আত্মা নিজস্বরূপ লুকায়িত রাখিয়া লীলার ছলে যেন বিষয়ের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া বিন্দু বিন্দু আনন্দ দান করিতেছেন, যোগাঙ্গসমূহ তাহারই প্রয়াসী। বিষয়সংস্পর্শজনিত আনন্দকণা, তাহাও সমাধি হইতে লভ্য। অন্যান্য যোগাঙ্গ ত সে আনন্দের নিকট যাইতে পারে না। যাহারা কেবল বিষয়ের ধ্যান করে তাহারা ত' আনন্দকে খণ্ড খণ্ড করেই, তদভিন্ন যাহারা কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি কিংবা জ্যোতি অথবা কোন বিশিষ্টভাবের ধ্যান করেন তাঁহারাও সমাধিলভ্য অখণ্ড আনন্দকে খণ্ডিত করিয়া ফেলেন। এইরূপে ধারণাদি প্রত্যেক যোগাঙ্গই "পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ।" যোগাঙ্গের এই পরিচ্ছিন্নমুগ্ধতা নিয়ত অনুষ্ঠিত প্রতি কর্ম্মে, অথবা যোগাশাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বারা ভগবৎ-সাধনায়, উভয়েই প্রায় তুল্য। যে

মাত্র যোগাঙ্গের সাহায্যে অখণ্ড আনন্দেরস্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, ততদিন বুঝিতে হইবে—সে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পায় নাই। সে আনন্দ সর্ব্বত্র সুপ্রকট—ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার দর্শন হয়—সেই মুহূর্ত্তেই ত সমাধি সিদ্ধ হয়। সমাধি সিদ্ধ হইলে যোগাঙ্গগুলি আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া যায়।

সাধক যখন প্রথম সমাধির সাক্ষাৎ পায়, তখন সমাধি আত্মপরিচয় প্রদানকালে আপনাকে "সোঽহং" বলিয়াই পরিজ্ঞাপিত করে। **"সোঽহং" জ্ঞানের নামই সমাধি 'সেই পরমাত্মাই আমি" এইরূপ প্রজ্ঞার নাম সমাধি।** আত্—মা যে **আমিরূপে বিরাজ করিতেছেন, যে মুহূর্ত্তে উহার উপলব্ধি হয়, সেই "মুহূর্ত্তই সমাধি।"** তখন কি অবস্থা হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সে যে "মুকাস্বাদনবৎ স্বসংবেদ্যমাত্র।" তখন কি হয়—ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, মনের কার্য্য বুদ্ধির কার্য্য, থাকে না, জগতের বিভিন্ননামরূপ আর থাকে না। এককথায় দেহবোধ কিম্বা জগৎবোধ একেবারে বিলুপ্ত হয়। থাকে কেবল "অনন্ত আনন্দময় চিৎসমুদ্র।" প্রথম প্রথম "ঐ যে তিনি আমার পরমাত্মা, উনিই ত' আমি" এইরূপ বোধ প্রবাহ চলিতে থাকে। উহাই "সোঽহং" ভাবে সমাধি। এইরূপ সমাধিতে কিছুদিন অভ্যস্ত হইলে, আর সে, আমি, তুমি কিছুই থাকে না। **তখন কি থাকে, তাহা বলা যায় না, ভাবা যায় না,** তবে "যাহা থাকে, তাহাই, যে মহতী সত্তা, মহান চৈতন্য এবং অসীম আনন্দ," তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। না—তাহাকে 'মহানও' বলা যায় না 'অণুও বলা যায় না, কারণ, তখন "পরিমাণ বলিয়া কোন বোধ ত' "ফোটে" না। কিরূপে বলিব অণু কি মহান!

তবে একটা বিশেষত্ব আছে—'যাহা বলিব, তাহাই সেখানে দেখিতে পাইব।' **এমন কোন সঙ্কল্প নাই যে, সেখানে অপূর্ণ থাকিতে পারে তবে সমস্যার কথা এই যে, সেখানে গিয়া সঙ্কল্প ফোটান বড় কঠিন।** কারণ **সঙ্কল্প যে করে, সে "মনটী" ত' আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!** যেখানে সঙ্কল্প ফোটে, সেটা ঠিক সে জায়গা নয়, সেস্থান তাহার অনেক নিম্নে। "কি সুখময়, কি আনন্দময় ধাম আমার যথার্থস্বরূপ।"

জীব যখন "সোঽহং" বোধে উপনীত, "জীবব্রহ্মের একত্ব যখন জীব বুঝিতে পারে" "তখনই ধীরে ধীরে তাহার জীবত্ববন্ধন, কর্ম্ম-সংস্কার, দেহাত্মবোধ প্রভৃতি স্খলিত হইতে আরম্ভ হয়।" যতদিন পরিপক্কাবস্থায়' উপস্থিত না হয় অর্থাৎ 'জ্ঞান যতদিন সংশয় রহিত ও বিপর্য্যয়-রহিত না হয়,' ততদিন সংসার সংস্কারশ্রেণীর আধিপত্য বিদূরিত হয় না।' সাধক যতক্ষণ "সোঽহং" ভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ সব ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সে কতক্ষণ? আবার ব্যুত্থিত হয়।

ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—**আমরা যে যাহাই বুঝি উহা নিজ নিজ "বুদ্ধি গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত।" ভগবত্তত্ত্ব কিন্তু বুদ্ধির অনেক বাহিরে অবস্থিত,** সুতরাং তাঁহাকে সম্যক্ জানিতে কেহ কখনও পারিয়াছেন কিম্বা পারিবেন কিনা সন্দেহ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ধ্যানের অগম্য মানব-বুদ্ধি গম্য কিরূপে হইবেন? তবে একবিন্দু বুঝিতে পারিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

"সোঽহং" শব্দের অর্থ "সেই আমি। এই আমি নহে সেই আমি।" 'আমির তিনটী স্বরূপ বা অবস্থা আছে'। 'একটী

জীব আমি', 'একটী ঈশ্বর আমি ও অপরটী সেই বা পরম আমি।' "সেইটিই" হইল আমির পরমভাব বা শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। 'উহা বাক্য মন এবং বুদ্ধির অতীতস্বরূপ বলিয়া 'জীবভাবের পক্ষে নিয়ত অপ্রত্যক্ষ।' তাই "নামপুরুষ বা সঃ শব্দের" প্রয়োগ হইয়া থাকে। ব্যাকরণের অনুশাসন অনুসারে অপ্রত্যক্ষ বিষয়েই তৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য সঃ শব্দে পরমাত্মাকেই বলা যায়। আমি এবং আত্মা একই কথা। 'জীবাত্মা ও পরমাত্মা 'বস্তুতঃ' দুইটি বিভিন্ন পদার্থ নহে। আত্মার যে কল্পিত অংশে জীবভাব বিকশিত হয়, তাহারই নাম "জীবাত্মা" এবং যে কল্পিত অংশে কোনও ভাবের বিকাশ নাই, তাহাই "পরমাত্মা"। আত্মার এই 'পরম ভাবটি কি' তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। যে ভাবে আত্মামাত্র 'সৎ চিৎ ও আনন্দরূপে প্রতিভাত' হন অথবা 'যেখানে অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ' বলিয়া কোন কিছুর উপলব্ধি হয় না, তাহাই "পরমভাব।" তাঁহাকে ভাষার মধ্যে আনিলেই "ভাব, অবস্থা, স্বরূপ প্রভৃতি শব্দ তাহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে।" যদিও বুঝা যায় যে "এ সকল শব্দও তাহাতে প্রযুজ্য নহে," কারণ "ভাব, অবস্থা স্বরূপ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই হইয়া থাকে"। মোটামোটি মনে করিতে হইবে যে—"এমন একটি অবস্থা আছে, যেখানে অসৎ বলিয়া কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অচিৎ কিম্বা জড় বলিয়া কিছুই নাই এবং নিরানন্দের লেশমাত্র সেখানে অনুভব করা যায় না।" কোনরূপ পরিচ্ছিন্নতা নাই, রূপরসাদি বিষয় নাই, সুতরাং "ভাব ও অভাব" উভয়েই সেখানে প্রতীতিযোগ্য নহে—'সে এমনই একটি অবস্থা। প্রতিনিয়ত যে চৈতন্য সত্তার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, যদি একবার দেহ মন

ইত্যাদি ভুলিয়া ঐ চৈতন্য-সত্তাটিমাত্র তোমার বোধের সমীপস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে, তাহা হইলে এই পরমাত্মভাবের আভাস পাওয়া যাইবে।' সেখানে কিন্তু আমি, তুমি, সে প্রভৃতি বোধ নাই। তাঁহাকে "বিজ্ঞাতা কিংবা দ্রষ্টাও" বলা যায় না, কারণ সে অবস্থায় জ্ঞেয়ের বা দৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব থাকে। "এই অবস্থাটির নাম পরমাত্মা বা আত্মার পরমভাব।"

এই পরমভাব হইতে "অহং এর স্ফুর্তি" কি করিয়া হয় তাহার আলোচনা করা যাইতেছে ঃ—সেই পরম ভাবের কাল্পনিক এক অংশে "স্বভাবতঃ লীলাকৈবল্য বশতঃ" একটা "অহং বোধ" ফুটিয়া উঠে। [কেন এবং কিরূপে উঠে এরূপ প্রশ্ন না করিয়া বহির্মুখ না হইয়া—অন্তর মুখ হইয়া বুঝিবার চেষ্টা কর]। "অহংবোধটি" ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ তাহা "অবাঙ্মনসোগোচর।" যেই "অহং-বোধ" জাগিল, অমনি অঘটনঘটন-পটীয়সী মহামায়া প্রকাশ পাইল। সেই "প্রথম অহং বোধের" উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পঞ্চভূত ও ভৌতিক পদার্থ পর্য্যন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডরূপে "মহামায়ার প্রকাশ।" অজ্ঞানের "বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য।" এই মহামায়াই যতক্ষণ 'স্থির' অর্থাৎ 'ক্রিয়াশক্তি বিহীন' ছিলেন ততক্ষণ "পরমাত্মা" 'ব্রহ্ম' 'নিরঞ্জন' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইতেন। যখন শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাঁহার নাম হইল "মহামায়া।" সেই প্রথম যে অহংবোধ ফুটিয়া উঠিল, "ঐ আমিটি" "মহান্ ও এক।" আর "দ্বিতীয় একটা আমি" তখন ছিল না। উহার—সেই "এক আমির" ইচ্ছা হইল—বহুভাবে প্রকাশ হইব, বহুত্বের খেলা খেলিব। "আনন্দই তাঁহার স্বরূপ" তাই এই বহুত্বের লীলার ভিতরেও "অখণ্ড আনন্দ"

'অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিত।' যেখানে 'এই বহুত্বের ইচ্ছাটি' ফুটিয়া উঠিল, সেটি কিন্তু "মন" "মন ব্যতীত সঙ্কল্প" হইতে পারে না। এই "মনোময়ী মা" পূর্ব্ব পুর্ব্ব কল্পের সৃষ্টির বীজগুলি এতদিন গর্ভে অব্যক্ত ভাবে ধারণ করিয়াছিলেন, এখন আবার প্রসব করিলেন। এই বহুত্ব সৃষ্টির "নিমিত্ত এবং উপাদান" উভয়ই 'তিনি'—ঐ 'আমি'—'**মা**' তিনি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাকারে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এক কথায় তিনি 'সব' হইলেন। সব হইতে গিয়া তাঁহাকে "শব" পর্য্যন্ত হইতে হইল।' **চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ,** তথাপি 'আনন্দের প্রেরণায়' স্নেহের উচ্ছ্বাসে তাঁহাকে জড় পর্য্যন্ত হইতে হইল, '**তিনি নিজে**' '**আমি**', তাই তাঁর **কল্পিত অণুপরমাণু** পর্য্যন্ত "**আমি-বোধে সংবুদ্ধ** হইল।" "তিনি সমুদ্রবৎ অবস্থিত আমি" আর জীবজগৎ তাঁহার "তরঙ্গবৎ আমি।"

দৃষ্টান্ত :—সাতরঙ্গের কাঁচদ্বারা গঠিত এক লণ্ঠনের মধ্যে একটী আলো জ্বলিতেছে। সাত খানি কাঁচের মধ্য দিয়া, ঐ একটা আলোই সাতরকমে প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে একটা 'আমি বোধ' রহিয়াছে, উহাও ঠিক সেইরূপ। বস্তুতঃ 'তিনি এক আমি' হইলেও বহুজীবের ভিতর দিয়া 'আমিরূপে' প্রকাশ পাইতেছেন। ঐ যে বহু ভাবে প্রকাশিত "এক আমি" উহাদের নাম দাও ব্যষ্টি-আমি বা "জীব"। আর ঐ যে "এক-আমি" উহার নাম দাও "সমষ্টি-আমি" বা 'ঈশ্বর'। কারণ বহুত্বের সৃষ্টি ও তাহার ধারণ 'ঐ আমিতেই' হইতেছে ; আবার যখন তিনি ইচ্ছা করিবেন যে, আর আমি বহুভাবে প্রকাশিত হইব না তখনই সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইবে—প্রলয় হইবে। সুতরাং "তিনিই" "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা

ঈশ্বর।" এই অংশটিকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে 'পরমাত্মাস্বরূপেরই শক্তিরূপে বিকাশ বলা যায়। সেই পরম কারণ অংশের নাম 'শক্তিমান' এবং অহং-বোধ হইতে আরম্ভ করিয়া "বহুভাবে প্রকাশ, তাহার ধারণ ও প্রলয়াদি কার্য্য" অংশটির নাম—'শক্তি'। সূর্য্যের 'প্রকাশ শক্তি' মুখে বলা যায় মাত্র, উক্তরূপ ভেদ কখনও অনুভূতি যোগ্য হয় না, সেইরূপ 'শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ' মাত্র 'মৌখিক বিচারে প্রযুজ্য।' যেরূপ 'রাহুর শির' বলিলে, রাহু ও শির অভিন্নভাবে প্রতীত হয় সেইরূপ 'পরমাত্মা ও শক্তি, অভিন্নভাবে প্রতীতি যোগ্য।' শক্তি ও শক্তিমান 'বস্তুতঃ' ভিন্ন নহে কিন্তু 'ধর্ম্মতঃ' ভিন্ন।

এইরূপে কোনরকমে 'সোহহং' কথাটি বুঝা গেল, তাহাও বাস্তবিক কিছুই নয়; কারণ লণ্ঠনের দৃষ্টান্তে বুঝিয়াছি "আমি" একজন মাত্র। "আমি" যদি বলিতেই হয় ত "ঈশ্বরকেই বলা উচিত। 'দেহাত্মবিশিষ্ট জীবের" 'পৃথক আমিত্ব'—'অজ্ঞান' মাত্র। কার্য্যতঃ তাহাই বটে। 'সঃ' এর সহিত যে "অহং" এর মিলন তাহা "পরমের সহিত ঈশ্বরের মিলন বলিলেই ঠিক হয়।" মিলন বলিলে বুঝা উচিত নহে যে, দুইটি বিভিন্ন বস্তু একত্রিত হইল, "জীবভাবে প্রকাশিত আমি" "ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত যথার্থ আমির সন্ধান পাইলেই, জীব ও ঈশ্বরের মিলন সংঘটিত হয়।" আবার 'ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত আমি' 'পরম ভাবে' উপনীত হইলেই, ঈশ্বর পরমভাবে উপনীত হইবেন; 'ইহাই মুক্তি', ইহাই "মূলতত্ত্ব"।

সুতরাং 'জীবের সাধ্য' 'ঈশ্বর' পরম ভাব সাধ্য নহে। 'পরমভাব সাধ্য সাধনাদি সর্ব্ববিধ অবস্থার অতীত' সুতরাং উপাসনা, সাধনা, ইত্যাদি যাহা কিছু তাহা মধ্যবর্ত্তী অবস্থাটি লইয়াই নিষ্পন্ন হইয়া

থাকে। জীব যদি কোনরূপে 'ঈশ্বর-স্বরূপে' সংবুদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলেই 'প্রকৃত আমি' জিনিষটির সন্ধান পায়। যে বিরাট মহান 'আমি-সমুদ্র' হইতে এই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌ ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'সেই আমির সন্ধান করার নাম'—'সাধনা'। সেই 'আমিকে ভাল-বাসার নাম ভক্তি' বা 'প্রেম'। 'সেই আমিকে জানার নাম'—'জ্ঞান' সদাই মনে রাখিতে হইবে—'আমি'—'এক ব্যতীত দুই নহি' সর্ব্ব শরীরের ভিতরে 'একই আমির প্রতিধ্বনি' হইতেছে। 'একই আমি দেবমনুষ্যতির্য্যক ইত্যাদি আকারে প্রকাশ পাইতেছে।' উহার ঐ 'একোঽহং' এর শরণাগত হও—'সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য' 'মামেকং' 'শরণং ব্রজ'। 'সর্ব্বরূপে যে আমির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও' ঐ—'প্রতিবিম্বকে পরিত্যাগ করিয়া' 'সর্ব্বের ভিতর যাহা অনুস্যূত, সেই "বিম্ব আমির" আশ্রয় গ্রহণ কর। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ। আমি তোমাকে সর্ব্বরূপ পাপ বা সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিব—'শান্তিময় উদার মুক্তিক্ষেত্রে—সোঽহং রূপে উপনীত করিব, তুমি দুঃখ করিওনা বৎস।' গীতার এই—"চরম ও পরম বাণীটি" প্রাণে সংবেদন করিয়া—যে সত্য সত্যই এই ভাবে "আমাকে, আত্মাকে—গুরুরূপে পাইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণের জন্য যথাশক্তি পুরুষকার প্রয়োগ করিলে মুক্তি সুনিশ্চিত।"

সাধকের প্রথম ও প্রধান সাধন—নিত্য কি, অনিত্য কি, ইহার বিচার করা অর্থাৎ 'কোন বস্তুর বাধ হয় আর কোন বস্তুর বাধ' হয় না বা অবাধ্য তাহা বিচারে নিঃসন্দেহ ভাবে জানা। এই পুস্তকে তাহারই বিচার করা হইয়াছে। "ধর্ম্মীই" নিত্য বা সত্য আর "ধর্ম্ম" অনিত্য বা অসত্য তাহা বহু প্রকারে নির্ণয় করা হইয়াছে। এখন

গ্রন্থোক্ত সর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়ায় সার হৃদয়ঙ্গম করিবার বা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করা যাইতেছে :—

এখন "প্রকাশ" ও "অন্ধকার" এর বিচার করা যাইতেছে। ঘোর অমাবস্যারাত্রে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা অন্ধকার দেখি, সেইরূপ দিবালোকে চক্ষু মুদিত করিলে সেই অন্ধকারকেই দেখি—অন্য কিছু দেখি না। এখন এই উভয়াবস্থার অন্ধকার যে একইরূপ অর্থাৎ "অপ্রকাশ স্বরূপ" সে সম্বন্ধে বিচার নিষ্প্রয়োজন। 'স্থুল চক্ষু' উন্মীলিত করিয়া যে অন্ধকার দেখা যায়—তাহারই বিচার প্রথম করা যাইতেছে। এই অন্ধকার কি সম্পূর্ণ সর্ব্বপ্রকাশ নিরপেক্ষ অথবা কোন না কোন এক প্রকাশ সাপেক্ষ বস্তু? সম্পূর্ণ প্রকাশ নিরপেক্ষ হইলে "অন্ধকার" আর দৃষ্টিগোচর হইত না, কিন্তু তাহা দৃষ্টিগোচর হয় সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ নিরপেক্ষ নহে, কোনও না কোন প্রকাশ সাপেক্ষ, ইহা প্রমাণিত হইল। ইহা ভিন্ন আলোর উজ্জ্বলতার তারতম্যে অন্ধকারের ও তারতম্য হয়। দীপকের অভাব অন্ধকার, শত দীপকের নিকট একটি দীপকও অন্ধকার। অধিক প্রকাশে কম প্রকাশের বস্তুগুলি দেখা যায়। এইরূপ দিবালোকে চক্ষু মুদিত করিলে যে অন্ধকার 'মনশ্চক্ষুতে' দেখা যায়—তাহাও নিরপেক্ষ নহে, তাহাও সাপেক্ষ। প্রকাশ শূন্য কিছু নাই। তবে কি প্রকাশ ও অন্ধকার দুই বস্তু হয়? এক অন্যের অপেক্ষাতে হয়, একের সহিত অপর বস্তুটি কি অনুস্যুত?

বিচার করিতে হইবে—কোনটি নিত্য ও কোনটি অনিত্য। কাহার বাধ করা যায় আর কোনটি বা অবাধ্য। কল্পনা করা যাক্ যে প্রকাশ নাই। কিন্তু এই 'প্রকাশের অভাব' কে প্রকাশিত করিতেছে?

উহাও ত এক প্রকাশই হয়। আচ্ছা প্রকাশ আছে, অন্ধকার নাই। তাহা হইলে প্রকাশকে প্রকাশই কিরূপে বলা যাইতে পারে? ঠিক হয়, প্রকাশকে প্রকাশ বলা যাইতে পারে না। বিনা অপেক্ষায় শব্দের প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু কেবল ইহার দ্বারা অর্থাৎ আপেক্ষিপ বলিয়াই প্রকাশ বস্তুর অভাব সিদ্ধ হয় না। "আছে ও নাই" এই শব্দ অনির্ব্বচনীয় হইলেও বস্তুর সত্তার নিষেধ হয় না। নিষেধ যে করে তাহাকে কে অর্থাৎ "নিষেধককে" ভাল কে নিষেধ করিতে পারে?

প্রতীতি অথবা ভাণ প্রকাশেরই হইতে পারে। অন্ধকারের উহা হইতে পারে না। "আমি আছি কিম্বা নাই", "ইহা আছে অথবা নাই" অর্থাৎ "অহং বৃত্তি ও ইদং বৃত্তি" দুই প্রকাশের হয়, প্রকাশেতে হয়। সেই অন্ধকারকে "ইদম্" বোঝে আর প্রকাশকে "অহম্"। অহম্ বিনা ইদম্ বৃত্তি থাকিতে পারে না। উহা অহমের আধারেই টিকিয়া থাকে। কিন্তু ইদম্ বৃত্তি বিনাও অহম্‌বৃত্তি থাকিতে পারে, থাকেও। "অহম্" অবাধ, "ইদম্" বাধিত হয়। অহং নিত্য আর ইদং অনিত্য, অহম্ সত্য আর ইদম্ মিথ্যা। কিন্তু অহম্ সত্য এই কথা বলে কে? বোঝে কে? আপনি আপনাকে, আপনি আপনাতে বিজ্ঞাপনই কে করে?

রূপ শব্দাদি 'তন্মাত্রার', ভাব আর অভাবকে প্রকাশিত করে চক্ষু ও শ্রোত্র 'ইন্দ্রিয়'। সারা স্থূল সৃষ্টির এই ইন্দ্রিয়ের প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্বতে এই ইন্দ্রিয়ই প্রমাণ। কিন্তু ইন্দ্রিয় যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করে তাহা যে যথার্থ নহে তাহা সামান্য বিচারে নির্ণীত হয়। যথা পূর্ব্বে যে চক্ষু "যেরূপভাবে" রূপ দেখিয়াছিল এবং যে শ্রোত্র "যেরূপ শব্দ" শুনিয়াছিল সেই ইন্দ্রিয়ই

যখন পরে ন্যাবা ও কালা হইয়া সব রূপকে হল্‌দে দেখে ও পূর্ব্বোক্ত শব্দ কম শুনে, তখন বোঝা যায় যে উহার রোগ হইয়াছে। পরে আবার সে স্বস্থ হয়। কিন্তু ইহার কি প্রমাণ? মন বলে যে আমি স্বস্থ। মন কি এত স্থির যে উহার কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইব! সম্ভব কিছুদিন বাদে ঐ মনই বলিবে যে সেইদিনে অস্বস্থ ছিলে। তাহা হইলে আজকের কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। সুতরাং "মনের কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে"। তাহা হইলে কি বুদ্ধির নির্ণয় স্বীকার করিয়া লইব? না, তাহাও করা যায় না কারণ বুদ্ধিও দূষিত হয়—"বুদ্ধি কখন কিছু নিশ্চয় করিতে পারে, আর কখন কখন তাহাও পারে না। কখন বুদ্ধি জাগিয়া থাকে কখন ঘুমায়"। সুতরাং দেখা গেল যে "ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য নহে।" ইহা ভিন্ন এক আমিই, অহং, আত্মাই আছি "যিনি বুদ্ধির সব অবস্থাকে দেখেন।" উহা কখন দেখা যায় না। "উহা প্রকাশ্য নহে, প্রকাশক হয়।" "বুদ্ধিও উহার সৃষ্ট পদার্থ অহমের দ্বারা প্রকাশিত হয়।" আর সব অন্ধকার। অহং প্রকাশ হয়। তবে কি এইসব অহং হইতে ভিন্ন? 'বুদ্ধি হইতে মন, ইন্দ্রিয় আর বিষয় পৃথক নহে, বুদ্ধিরই পরিণাম।' সূক্ষ্ম তন্মাত্রা স্থূল পদার্থকে দেখে। "বিষয়ের সাত্ত্বিক তন্মাত্রা মন" এই ইন্দ্রিয়কে দেখে। 'সব আপনাকেই দেখে।' সুতরাং অহং ও আপনাকে দেখে। সব অহংএরই বিস্তার। "অহং বস্তুই" দ্রষ্টা, দর্শন, আর দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তবে কি অহং পরিণামী? না তাহা নহে কারণ অহং একদেশী নহে—অহম্ বিভু। উহা দেশকে, দেশের অবান্তর ভেদকে আর উহার অভাবকে দেখে। "অহংই বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা দেশের সৃষ্টি করিয়াছে। একদেশ আর সবদেশ উহার উদ্ভাবনা।" বৃত্তিরই

অন্তর্ভূর্ত হয়। সুতরাং "অহংকে দেশ কিম্বা বিভিন্নবস্তু পরিমিত করিতে পারে না। কালের দ্বারাও উহার পরিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই।" স্বয়ং 'কালও বুদ্ধির সৃষ্ট হয়।' উহা অনন্তচিতে আরোপিত, যেমন অনন্তের একাংশ অসম্ভব সেইরূপ কালের অবয়ব ও নির্বচনও অসম্ভব। দেশ, কাল, বস্তু সব উহাতেই হয়, সব উহাই। "অহংই সব হয়, অহংএর দৃষ্টিতে এইসব প্রপঞ্চ কিছু নয়, অহংই সব।" যদি সবেরও কিছুই সীমা হয় ত উহারও পরে অহং থাকে। উহার পরিণাম হইবার জন্য না আছে অবকাশ, না আছে খালি স্থান আর না আছে উহার বাহিরে কোন স্থান। উহার পরিণাম কখন কোনরূপে হইতে পারে না। সব উহাতে প্রতীত হইতেছে। আমাদের অহংও উহারই আভাস হয়। আমাদের বাস্তব অহং ত উহাই হয়। অহং ব্রহ্মাস্মি—ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই কল্পিত উপাধি হয়—দুয়েতে স্ফুরিত শুদ্ধচৈতন্য এক হয়।

এইরূপ বিচারে "অন্ধকার ও প্রকাশের" তথ্য অনুভূত হইল যে উহা "একই তত্ত্ব" হয়। উহা প্রথমপুরুষ "ইদং", উত্তমপুরুষ "অহং" এবং মধ্যম পুরুষ "ত্বম্" দ্বারাও বর্ণনা করা যায়। উহাতে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ বা ভেদের নিষেধও নাই। সত্যং শিবং সুন্দরং উহাতে তন্ময় হওয়া যায়। তন্ময় অতন্ময়ের পারেও যাওয়া যায়। ঐপ্রকারই ছিলাম এইরূপ জানা যায়। না, না কিছুই জানা যায় না। যাহা জানা গিয়াছিল উহা তাহা নয়। "তুর মথো বিদিতাদবিদিতাদধি।"

সম্পূর্ণ সাধনার সূক্ষ্মরূপ—"পবিত্রতা, শান্তি আর আনন্দ।" যেখানে 'পাপোঽহং'এর ভাবনা সেখানেও অন্তঃস্থলে পবিত্রতার স্রোত বহিতেছে। উহা আজ কিম্বা কাল ফুটিয়া বাহির হইবে। আর সারা প্রকৃতির অণুপরমাণুকে পবিত্রতাময় করিয়া দিবে। কেবল

"গুপ্ত, মূর্চ্ছিত, সুপ্ত পবিত্রতাকে" খুঁজিয়া বাহির কর, জাগাও। তাহা যেরূপেই হউক—জপে, তপে, প্রার্থনায়, ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে, পাপোঽহংতে, শিবোঽহংতে। রাগ ও বিরাগ উভয়েই পবিত্রতার সাধন। পবিত্রতাই শান্তির জননী, শান্তিতেই আনন্দ। অপবিত্র ত শান্ত হইতে পারে না, অশান্ত সুখী হইতে পারে না। "পবিত্রতা, শান্তি আর আনন্দই—পরমার্থে মূলস্বরূপ।"

বাস্তবিক আমি অমৃততে আছি, কিন্তু আমার মন বিষে আছে। আমি বর্ত্তমানে, সে ভূত ও ভবিষ্যতে। আমা হইতে দুইচার হাত দূরে থাকাই উহার স্বভাব। অপবিত্রতা, অশান্তি আর দুঃখের উহাই কারণ। উহাকে গুটাইয়া লও, আপনার নিকট ডাকিয়া লও। যেখানে আমি থাকি, সেখানে মন থাকে, আমার সেবক, আমার যন্ত্র, আমার অধীন, আমার বশে রয়, তাহা হইলেই আমার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। "ইহাই পবিত্রতার সাধনা।" ইহা এখনই পূর্ণ করিয়া লও। হাঁ, এখনই। যদি বিলম্ব কর ত বিলম্বে সৃষ্টি করিয়া দিবে।

মন দূরে কেন যায়? কিসের অপেক্ষায়? উপেক্ষা কেন করিতেছ না? অপেক্ষা—অপ+ইক্ষা অর্থাৎ অন্ধতা। উপেক্ষা—উপ+ইক্ষা অর্থাৎ তটস্থ দৃষ্টি। ঐ মন কোন বস্তুর তটস্থ থাকিয়া দেখে না। উহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া যায়, অভিনিবিষ্ট হইয়া যায়। এই অপেক্ষা, অন্ধতা অর্থাৎ অজ্ঞানই উহাকে অন্যত্র লইয়া যায়। অপেক্ষা অন্ধ হয়, উপেক্ষা সমদৃষ্টি হয়। "এই দৃষ্টিই জ্ঞানের স্বরূপ হয়।" প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুয়েতে, দুই হইতে তটস্থ থাকিলে 'অপেক্ষা' হইবে না। "তবেই মন আপনা হইতে দূরে যায় না; আপনার নিকট থাকে, আপনারই রস, আপনারই আনন্দ ভোগ করে।"

"সঙ্কল্পই সারা প্রপঞ্চের মূল।" সঙ্কল্প না করা, সঙ্কল্প না করিবারও সঙ্কল্প না করা। তটস্থ দৃষ্টিরও অপেক্ষা না থাকে। যাহা হইতেছে—হইতে দাও, যাহা হইয়া গিয়াছে—তাহার চিন্তা করিও না। তুমি "নিঃসঙ্কল্প থাক।" "আপনাতে আপনি থাক। ভগবানে থাক।" "সঙ্কল্প ত্যাগ" হইলেই "নিষ্কামকর্ম্ম" হইতে থাকিবে। "সঙ্কল্প ত্যাগ" হইলেই "আত্ম সাক্ষাৎকার" হইয়া যাইবে। আপনার অতিরিক্ত সঙ্কল্পই "অপেক্ষারও অজ্ঞানের" জনক হয়। আপনার সঙ্কল্প করিলেই কি হয়? কেবল আত্মা আছে, ভগবান আছে, জ্ঞান আছে, আনন্দ আছে। "সঙ্কল্পরহিত অদ্বৈতই আছে।" বিনা দুইয়ে "এক" আছে। শান্তি আছে, আনন্দ আছে। সর্ব—অসর্ব "একই" আছে।

কর্ম্মী "সঙ্কল্প হীনতার অভ্যাসে" নিষ্কামভাবে শান্ত হয়। ভক্ত, "বাহ্যবস্তুর সঙ্কল্প ত্যাগাভ্যাসে" ভগবান ও ভগবানের লীলা দেখে। জ্ঞানী "সঙ্কল্প ও তাহার অভাবের সাক্ষী হইয়া, সাক্ষী ও সাক্ষ্যের ভেদভাব তাঁহাতে নাই বুঝেন।" তিনি আছেন, তিনিই আছেন, তত্ত্বমসি, ইহাও বলা যায় না। না তাঁহাতে পরম সুখের অপেক্ষা আছে, না ত পরমজ্ঞানের। পূর্ণই পূর্ণ আছে। পরমার্থই পরমার্থ।

যাহারা "পরাগদর্শী বা বাহ্যপ্রবণ" 'পুরুষসুক্ত' বর্ণিত "জগৎ প্রপঞ্চ বিক্ষেপকের ধ্যানে" অর্থাৎ বাহ্য প্রপঞ্চ হইতে নামরূপ পরিত্যাগ করিয়াই সচ্চিদানন্দের সন্ধানে তন্ময় হইলেই "ব্রাহ্মীস্থিতি" লাভ করিবেন। আর যাঁহার চিত্ত "প্রত্যক প্রবণ" বা অন্তর্মুখ, তাঁহার 'কেনোপনিষদ্বর্ণিত' "প্রেরকের বা অন্তর্যামির" অনুসন্ধানে অচিরে আত্মনিষ্ঠ হইবেন। আর "যাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ অন্তঃপ্রবহণও

নহে বা বাহ্য প্রবহণও নহে," তাঁহারাও মাণ্ডুকোপনিষদে উপদিষ্ট "সাক্ষী ধ্যানেই মুক্ত" হইবেন কারণ "মুক্তিকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে" "এক মাণ্ডুকোপনিষদই মুমুক্ষু দিগের মুক্তি লাভের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।"

বশিষ্ঠদেব মুক্তির উপায় নির্দ্দেশে এইরূপ বলিয়াছেন :—

স্বকর্ত্তৃ কর্ম্মকরণানাং স্বাস্পর্শানন্তরাস্পৃশন্।
নির্ব্বিকল্প নিরালম্ব স্বচিন্মাত্র পরোভব ॥
জাগ্রত্যেব হি সুষুপ্তাং ভাবয়ন্ সুস্থিরাং স্থিতিম্।
সর্ব্বসস্মীতি সঞ্চিন্ত্য সত্তৈকাত্মবপূর্ভব ॥

অর্থাৎ "বিজ্ঞানময় কর্ত্তা" "বাহ্য বিষয় কর্ম্ম" ও "ইন্দ্রিয় করণ" মণ্ডিত অথচ মণিমধ্যগত প্রতিবিম্বের মত আত্মাতে নির্লিপ্ত, এবম্বিধ সংসারকে স্পর্শ না করিয়া নির্ব্বিকল্প ও নিরালম্ব হইয়া নিজ চৈতন্য মাত্রের সন্ধানে তৎপর থাক। জাগ্রদবস্থাতেই আপনার স্থিতিকে সুষুপ্তির ন্যায় নির্ব্বিকল্পরূপে ভাবনা পূর্ব্বক "আমিত্ব" ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই, এইরূপ চিন্তা করিয়া সৎঈশ্বরস্বরূপ হইয়া অবস্থান কর।

সর্ব্বশেষ ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করা হইতেছে। কোন ব্যক্তি যখন হস্তে দর্পণ লইয়া স্বীয় চক্ষু দেখিতে থাকে, তখন সে তাহার আসল চক্ষু দেখে না; দর্পণে প্রতিবিম্বিত মিথ্যা চক্ষু দেখিতে থাকে মাত্র। তাহার "সত্যচক্ষু" ঐ প্রতি-বিম্বিত মিথ্যা চক্ষু দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহার "মিথ্যা চক্ষু," অর্থাৎ দর্পণে "প্রতিবিম্বিত চক্ষু," সত্য চক্ষুর মত গঠন-প্রণালী-যুক্ত এবং আপাততঃ দৃষ্টিতে দর্শন শক্তিযুক্ত মনে হইলেও ঐ "মিথ্যাচক্ষু যেমন সত্যচক্ষুকে দর্শন করিবার শক্তি রাখে না," তদ্রূপ ব্রহ্মই তদীয় প্রতিবিম্বস্বরূপ

জগদ্দর্শন করিতেছে, কিন্তু "ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব, অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়ারূপী যে জগৎ বা জগজ্জীবগণ তাহার ব্রহ্মদর্শনের শক্তি রাখে না। এজন্য ব্রহ্মদর্শন করা মানবের পক্ষে অসম্ভব।" প্রতিবিম্ব কিরূপে "সে যাহার প্রতিবিম্ব" তাহাকে অর্থাৎ "বিম্বকে" দর্শন করার শক্তি রাখিতে পারে এক্ষণে দেখ, প্রতিবিম্বিত চক্ষু কিরূপে আসল চক্ষুকে দর্শন করিতে পারে ? এক কথায় যে দেখিতেছে, তাহাকে কিরূপে দেখিবে ? "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—যিনি বিজ্ঞাতা তাহাকে আর কে জানিবে ? ব্রহ্মদর্শনের বা ব্রহ্মজ্ঞানের "অহম্‌ব্রহ্মাস্মি"—"আমিই ব্রহ্ম" এরূপ জ্ঞান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

"জড় প্রতিবিম্ব" হইতে "অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্বজগতের পার্থক্য আছে।" "জড়ের অর্থ" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নিজেকে নিজে জানে না অর্থাৎ "আমি আছি" এরূপ জ্ঞান যাহার নাই তাহাকে জড় বলে ; আর "চিৎ অর্থ" যে নিজেকে নিজে জানে, অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞান যাহার আছে তাহাকে চিৎ বা চৈতন্য বলে। এখন চক্ষু জড় কিনা, তাহার বিচার করা যাক। চক্ষু যে দেখিতেছে, সে তাহা জানে না : যদি চক্ষুর পশ্চাতে "আমি" রূপ জ্ঞানশক্তি বা চৈতন্যশক্তি না থাকিত, তবে চক্ষু দেখিতে পাইত না। শবদেহস্থ চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, চক্ষু কদাপি দর্শন ক্রিয়ার "কর্ত্তা নহে, উহা করণ মাত্র।" চক্ষু "আমি" যন্ত্রীর যন্ত্ররূপে দর্শন বিষয়ে নিয়োজিত হয় মাত্র। জড়চক্ষু দেখিতেছে এই যে ভ্রান্ত ধারণা এবং "ঐ দর্শনের মূলীভূত কারণরূপে যে "আমি" রূপ জ্ঞানশক্তি আছে তাহার যে সদা বিস্মৃতি, ইহাই হইল মায়ার বা মনের বা অবিদ্যার কার্য্য।" এই "মায়ার দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইয়াই" মানব "নিজে

যে প্রতিবিম্বিত মিথ্যা পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে না।" যখন এক ব্যক্তি কোন একটি অপূর্ব্ব দৃশ্যের দিকে চাহিয়া থাকে, তখন যেন "আমি দেখিতেছি" এই জ্ঞান তাহার থাকে না, চক্ষু দেখিতেছে এই জ্ঞানটি মাত্র থাকে। অর্থাৎ "কর্ত্তারূপে" আসল দ্রষ্টা যে "আমি" তাহা বিস্মৃত হইয়া, "করণরূপে, বা গবাক্ষরূপে" যে চক্ষু তাহাকে কর্ত্তা ও দ্রষ্টা মনে করে। প্রতি পদে পদে, আত্ম বিস্মৃতি মানবের মস্তিষ্ক বা মনোরাজ্যে উদিত হইয়া মানবমণ্ডলীকে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ভ্রান্তিচক্রে আরূঢ় করাইয়া জন্ম মৃত্যু প্রবাহরূপ সংসার চক্রে বা মনোরাজ্যে সদা বিঘূর্ণিত করিতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মানব যদি প্রতিবিম্ব পদার্থ হইবেক, তবে তাহার এত বুদ্ধিশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আসে কোথা হইতে? মিথ্যা পদার্থ কিরূপে ঐ ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেক? দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু কখনও কি কোন ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে? তাহা পারে না। কিন্তু দর্পণে প্রতিবিম্বিত চক্ষু আর অন্তঃকরণে বা মনে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্বিত দুই সমান নয়; জড়ের প্রতিবিম্ব জড়ই থাকে এবং চিতির প্রতিবিম্ব চৈতন্যশক্তি প্রকাশ করিবেই। দৃষ্টান্ত যেমনঃ—যখন জড়স্তম্ভের প্রতিবিম্ব হয়, তখন উহার কোনরূপ ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু সূর্য্যকিরণ যখন উহাতে প্রতিফলিত হয় তখন সেই প্রতিফলন তেজের শক্তিত্রয়ী প্রকাশে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়, অর্থাৎ দাহিকাশক্তি, আলোকবিকীরণশক্তি ও উত্তাপপ্রদায়িনীশক্তি কিছুক্ষণের জন্য কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারে। এইরূপ অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্বও চৈতন্যবৎ কিছুক্ষণের জন্য, কথঞ্চিৎ রূপে আত্ম শক্তি প্রকাশে সমর্থ হয় এবং

চৈতন্যের যে (কল্পিত) ধর্ম্মই হইল জ্ঞানশক্তি, অর্থাৎ নিজেকে নিজে জানা, তাহা অধিকারিত্ব অস্থায়ী ভাবে ও মৃদুভাবে প্রাপ্ত হয়। এই জন্য চিৎপ্রতিবিম্ব ধারণশীল মানব ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। প্রতিবিম্বের কি শক্তি আছে ? যখন আত্মসত্তা স্বীয় প্রতিবিম্ব প্রত্যাহার করেন, অমনই মহাতেজস্বী, মহাগর্ব্বিত ও মহাদাম্ভিক মানব জড়মৃত্তিকা স্তম্ভবৎ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া যায়।

অনাত্মদৃষ্টৈরবিবেকনিদ্রা-
মহংমমস্বপ্নগতিং গতোঽহম্।
স্বরূপসূর্য্যেঽভ্যুদিতে স্ফুটোক্তে
গুর্ব্বোর্মহাবাক্যপদৈঃ প্রবুদ্ধঃ॥

শ্রীগুরবেঽর্পণমস্তু।

ওঁ

অদ্বৈতানুভূতি প্রকাশ

দ্বিতীয় ভাগ

তত্ত্বদর্শন মাত্রেণ জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন কর্তব্যং তত্ত্বদর্শনম্‌ ॥

শ্রীপ্রমোদেশ্বর সেন

বা

শ্রীহারিতায়ন নারদ সংবাদ

প্রথম প্রকরণ

পর্ব্বতে আসিয়া বিচার

কর্ত্তব্যতৈব দুঃখানাং পরমং দুঃখমুচ্যতে।
তৎসত্ত্বেতু কথং তেস্তৌ দুঃখাভাবঃ সুখং চ বা ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মানন্দ যাঁহার স্বরূপ, যিনি অসীম শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, আর যিনি স্বয়ং দর্পনের ন্যায় হইয়া সংসাররূপ অদ্ভুত চিত্রের প্রতিবিম্বরূপে বিকশিত হইতেছেন সেই ত্রিপুরা দেবীকে নমস্কার।

শ্রীহারিতায়ন বলিতেছেন ;—নারদ! ত্রিপুরা দেবী মাহাত্ম্য তুমি পূর্ব্বে মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছ না? কেন না মাহাত্ম্য শ্রবণ করাই মোক্ষের মুখ্য সাধন। সেইজন্য এখন তোমাকে জ্ঞানকাণ্ড বলিতেছি। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ইহা ভালরূপে শ্রবণ করিলে মনুষ্যের দুঃখই হইতে পারে না। এই ভাগ বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব, শক্ত, পাশুপত ইত্যাদি পন্থের ভাল করিয়া শোধন করিয়া

নির্ম্মিত করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র নাই যাহা ইহার মত বুদ্ধিতে ভাল করিয়া জমিয়া যায় (বুঝা যায়)। ইহাতে শ্রীগুরু দত্তাত্রয় পরশুরামকে বুঝাইতেছেন সুতরাং ইহা অনুভবের সুন্দর কথা ও যুক্তিপূর্ণ বিচার পদ্ধতিতে ভরা। ইহা পাইয়াও যদি কাহারও স্বরূপজ্ঞান না হয় তবে তাহার মত ভাগ্যহীন পুরুষকে কেবল পাথরের মত জড় বুঝা উচিত। কিন্তু নারদ! যখন তুমিও আমার নিকট হইতে কিছু শ্রবণ করিবার অভিলাষ করিয়াছ, তাহাতে জানা যাইতেছে যে সত্যই সন্তের চরিত্র বড় অলৌকিক। অথবা, এইরূপ কৃপা করাই সন্তদের সহজ স্বভাব। কস্তুরী স্বভাবতঃ নাসিকাকে সন্তুষ্ট করে।

এখন পর্য্যন্ত পরশুরাম দত্তাত্রয়ের নিকট হইতে ত্রিপুরা দেবীর মহিমা শুনিয়াছেন। সেইজন্য উহার শুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রেমের বাণ ডাকিয়াছে; সুতরাং কিছু সময় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। উহার নয়ন আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া গেল। শরীর রোমাঞ্চ হইল, অন্তঃকরণে আনন্দের প্রবাহ বহিতে লাগিল। পুনরায় কিছুক্ষণ পরে সাবধান হইয়া দত্তাত্রয়কে বন্দনা করিল। আনন্দের প্রাচুর্য্যে কণ্ঠ গদ্‌গদ্‌ হইয়া স্পষ্ট শব্দ বাহির হইতেছিল না! এইরূপ অবস্থায় তিনি বলিতে লাগিলেন;—"মহারাজ, আপনার কৃপায় অদ্য আমি ধন্য হইলাম। আমি জানিতেছি যে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ করুণাসাগর গুরু দত্তাত্রয় সন্তুষ্ট হইলে ইন্দ্রপদ ও তুচ্ছ হয়। যাঁহার সন্তোষে স্বয়ং কালও ভীত হয়, সেই মহেশ্বর গুরু আজ আমার প্রতি অযাচিত কৃপালু হইয়াছেন। আপনার কৃপায় আজ আমার সব প্রাপ্য বস্তু

মিলিল। এজন্য যাঁহার এত মাহাত্ম্য যে ঐ দেবীর উপাসনা পদ্ধতিও আজ আমায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।”

এই প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীদত্তাত্রয়, পরশুরাম এখন উপাসনার অধিকারী হইয়াছেন ইহা বুঝিলেন। এইজন্য পরশুরামের এই শ্রদ্ধা দেখিয়া “ঈশ্বর সেবাতেই আপনার যথার্থ কল্যাণ হয়” আর এই দেখিয়াই উহার অন্তঃকরণও অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ হইয়া গেল, শ্রীগুরু উহাকে সব উপাসনার ক্রম বুঝাইয়া দিলেন। উহা বুঝিয়া পরশুরাম অভ্যাস করিবার ইচ্ছায় একান্তে যাইবার আজ্ঞা লইয়া বহুদূর মহেন্দ্র নামক এক পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। আপনার মনকে আনন্দ দিবার যোগ্য বাসস্থান তৈয়ার করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। ত্রিপুরাদেবীর মূর্ত্তির ধ্যান, জপ, পূজাদি নিত্য নিয়মপূর্ব্বক করিয়া বার বৎসর অতিবাহিত করিলেন। প্রেমপূর্ব্বক উপাসনা করিবার জন্য বার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া উহার মনে আসিল না। ইহার পরে একদিন বসিয়া বসিয়া সহজে তাঁহার মনে এক বিচার আসিল। উহা নিজের প্রতি বলিতে লাগিলেন ;—“প্রথমে যখন সংবর্ত্ত ঋষির সহিত দেখা হইয়াছিল, সেই সময়ে আমি তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত বুদ্ধিগম্য হইল না। কিছুদিন হইতে আমি এই প্রশ্নের বিষয় সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ত্রিপুরাদেবীর মাহাত্ম্য শুনিবার পর আমি উক্ত শ্রীগুরুর নিকট সৃষ্টি নিরূপণ প্রসঙ্গ বিষয়ক প্রশ্ন পুনরায় করিয়াছিলাম। কিন্তু সংবর্ত্ত ঋষির উক্ত কথার অর্থ আজ পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধিগম্য হইল না। ঐ বিষয়ে শ্রীগুরু “ইহা প্রাসঙ্গিক বিষয় নহে” বলিয়া কটক্তৈদাখ্যান

বলিয়াছিলেন। অতএব ঐ বিষয় ঐখানে চাপা পাড়ল। কিন্তু এই জগদ্ব্যবহারের স্বরূপ বাস্তবিক কি তাহার অনুসন্ধান করা উচিত? এই এত বড় বিশ্ব কি করিয়া উৎপন্ন হইল? ইহা কোনদিকে চলিতেছে? আর এইখানে ঘর কোথায় করিব? ঠিক দেখিলে এই সংসার এক তিলও স্থির নহে বলিয়া বুঝা যায়। উহার প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু তথাপি সব জগত ব্যবহার স্থির বলিয়া দেখাইতেছে। ইহা কিরূপে হয়? এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমি বিচার করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না! এক অন্ধের পশ্চাতে আর ঐক অন্ধের মত সব লোক চলিতেছে। সংসারের লোক কেন, আমি স্বয়ংই ইহার উদাহরণ। শিশুকালে কি কি হইয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। কুমার অবস্থায় আমার আচরণ ভিন্ন-প্রকারের আর তরুণাবস্থাতে অন্য প্রকার ছিল। আমার আধুনিক অবস্থা উহা হইতেও অন্যরূপ। কিন্তু বুঝা যায় না যে এইসব হইতে কি ফল মিলিল। যে কোন মনুষ্য যে কোন উদ্যোগ করে তখন সে সেই স্পষ্ট বিচার ফল পাইবার ইচ্ছা করে। কিন্তু এত করিয়াও কাহার কি আজ পর্য্যন্ত মিলিল? কে সুখী হইল? লোকে বলে ফল মিলিল। ইহা যদি সত্য হয় তবে উহা কি পাগলামী ভিন্ন আর কিছু নহে? উহাকে ফল বলা যায় না কারণ পুনরায় চেষ্টা করিতে দৌড়ায়। আমায় বুঝাও ত একবার যদি ফল মিলিল তবে পুনরায় ফল পাইবার ইচ্ছা কি করিয়া হয়? কিন্তু লোকের বার বার ফলের ইচ্ছার উদ্যোগ করিতে থাকে। ফল ত তাহাকে বলা উচিত যাহা হইতে দুঃখের নাশ ও সুখের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু

"আমার অমুক কর্ত্তব্য করা উচিত" এরূপ যতক্ষণ কর্ত্তব্য শেষ থাকিয়া যায়, ততক্ষণ দুঃখের অন্ত হয়না আর সুখ ও মিলে না। কর্ত্তব্যের বোঝাই সব দুঃখের দুঃখ। উহা থাকা পর্য্যন্ত দুঃখের অভাব ও সুখের প্রাপ্তি কি করিয়া হইবে? যখন সব শরীর ঝল্‌সে গিয়াছে তখন পায়ে চন্দন লেপিলে যেরূপ সুখ হয় সেইরূপ কর্ত্তব্য শেষ রহিলে ঐরূপই সুখ সম্ভব। অথবা বাণবিদ্ধ হইয়া হৃদয় একেবারে ফাটিয়া যাইলে তখন অপ্সরার আলিঙ্গনে যেরূপ সুখ হয় সেইরূপ সুখ কর্ত্তব্য শেষ থাকিলে মনুষ্য পায়; মস্তকে কর্ত্তব্যের বোঝাবাহক মনুষ্যের এরূপ সুখ হয় যেরূপ ক্ষয় রোগীর মৃত্যুকালীন সঙ্গীত শ্রবণে সুখ হয়। সংসারে যথার্থ সুখী সেই যাঁহার কর্ত্তব্য শেষ কিছুই নাই; অর্থাৎ যিনি পূর্ণ তৃপ্ত ও অন্তর্বাহ্য শান্ত হইয়াছেন। "আমার এই কর্ত্তব্য করা চাই" এইরূপ মনে হওয়ার পর যদি কাহারও কোথাও সুখ হইত তাহা হইলে শূলবিদ্ধ মনুষ্যের ও গন্ধপুষ্প হইতে সুখ পাইত। যখন শত কর্ত্তব্যবোঝা বাহক মনুষ্য ও সুখের আশা করে, তখন বড়ই আশ্চার্য বোধ হয়। এই অবিচারের মহিমা আর কত বলিব। কোটি কর্ত্তব্যের পর্ব্বতরূপ ভারবাহক মনুষ্যও নিজেকে সুখী বলিয়া বুঝে। যেমন কোন সার্ব্বভৌম রাজার উদ্যোগ সদাই থাকে সেইরূপই সকল ভিকারীর উদ্যোগ ও সদাই থাকে। সেইরূপেই ফল ও ভিন্ন ভিন্ন মিলে আর সে আপনাকে বড় ধন্য মনে করে। আর আমি ও পরিণামের প্রতি মনযোগ না করিয়া বিচার শূন্য পদ্ধতির অনুসারে অন্ধের পশ্চাতে অন্ধের ন্যায় চলিতেছিলাম। এখন এই গতানুগতিকত্বকে ছাড়িতে হইবে আর গুরুর নিকট যাইতে

হইবে। আমার এই সকল কথা বুঝিবার জন্য আর সংসার সমুদ্র তরিবার জন্য শ্রীগুরুর বোধরূপ নৌকার আশ্রয় লইতে হইবে।"

এইরূপ বিচার করিয়া অবিলম্বে পরশুরাম শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিলেন। তথায় তাঁহার গুরুর তেজস্বী মূর্ত্তিকে আসনে উপবিষ্ট দেখিলেন। সম্মুখে গয়া দুই হস্তে দুই চরণ ধরিয়া পায়ের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ইহা দেখিয়া গুরুর অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া গেল আর উনি সপ্রেমে আশার্ব্বাদ করিয়া, "বৎস উঠ" বলিলেন। উঠিলে উ'ন বলিলেন, "বৎস বহুদিন পরে দেখা হইল, তোমার স্বাস্থ্য ত ভাল আছে?" গুরুর আদেশ মত আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রসন্ন মনে হাত জোড় করিয়া পরশুরাম কহিতে লাগিলেন, "শ্রী গুরুদেব, আমি আপনার কৃপামৃতে ডুব্ দিয়াছি, দৈব বশতঃ রোগাদি আমার কি করিবে? আপনার কৃপায় আত্মামৃত ডিবেতে আসিবার কারণ আমার ব্যাধিরূপ প্রখর সূর্য্যের তাপ লাগে নাই। মহারাজ, আপনার কৃপায় আমার অন্তর বাহির আনন্দিত হইয়াছে। মহারাজের চরণের সান্নিধ্য না হওয়ার জন্যই এক রোগ ছিল; ইহা ভিন্ন আমার অন্য কোন রোগ ছিল না। এখন আপনার দর্শনে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। বহুদিন হইতে এক কথা মনে উদয় হইয়াছে। ইহা বহুদিনের সংশয়। ইচ্ছা হয় আপনার আজ্ঞা হইলে ঐ সব শঙ্কা নিবারণের জন্য প্রশ্ন করি।"

পরশুরামের কথা শুনিয়া দয়ালু শ্রীগুরুমহারাজের বড়ই আনন্দ হইল। উনি সপ্রেমে বলিতে লাগিলেন:—"পরশুরাম জিজ্ঞাসা

কর ; তোমার বহুদিনের সংশয় আমায় একবার বল। তোমার শ্রদ্ধা দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। বল, আমি তোমার সংশয় সমাধান করিব।"

দ্বিতীয় প্রকরণ

—০—

সৎগুরুর সাক্ষাৎ।

—•—

বিচারঃ সুখবৃক্ষস্য বীজমঙ্কুরশক্তিকম্
বিরাজতে বিচারেণ পুরুষঃ সর্ব্বতোঽধিকঃ ॥ ৫৫ ॥

যখন শ্রীগুরু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উৎসাহিত করিলেন তখন পরশুরাম বিনয় ও আদরপূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন। উনি বলিতে লাগিলেন :—"মহারাজ, বহুদিনের কথা; একবার প্রসঙ্গ বশতঃ সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির উপর আমার বড় ক্রোধ হইয়াছিল। সেইসময় ক্রোধের বশে সব ক্ষত্রিয় বংশকে, বালক, শিশু ও গর্ভবতী স্ত্রীকেও বিনাশ করিয়াছিলাম। আমি পৃথিবীতে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছি। ইহাতে আমার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন ক্ষত্রিয় পৃথিবীতে জীবিত না থাকে। ক্ষত্রিয়ের রক্তে তলয়ার রঞ্জিত হইল আর তাহার দ্বারা আমার পিতার তর্পণ করিলাম। এতদিন পরে আমার মন শান্ত হইল। পুনরায় আমি জানিতে পারিলাম যে

অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্র রাজ্য করিতেছেন ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করি। কিন্তু তিনিই কেবল আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া পরাজিত করিলেন এবং আমায় ব্রাহ্মণ জানিয়া দয়া করিয়া প্রাণদান করিলেন। মহারাজ, আমার সেইদিনের কথা সব সম্পূর্ণ স্মরণ আছে। পরাভবের জন্য সেইদিন আমার মনে অত্যন্ত ক্ষেদ হইয়াছিল। ফিরিবার সময় পথে আমার বড় অনুতাপ হইয়াছিল। শেষে রাস্তায় হঠাৎ সংবর্ত্ত অবধূতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হাঁ! যিনি সজ্জন হন তিনি সত্যই সম্পূর্ণ গুপ্ত ভাবে থাকেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় উঁহাকে শীঘ্র জানা যায় না। এরূপে আমি বহুক্ষণ পরে উঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারি এবং উক্ত সর্ব্বাঙ্গ শীতল পুণ্য পুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়া আমার বড়ই শান্তি হইল। আমি তাঁহার স্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। উনি যে উত্তর দিলেন তা বড় মধুর ছিল, সব কথার নিস্কর্ষ অর্থ বাহির করিয়া আমাকে সারাংশ বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু দরিদ্রের যেমন রাজপদ দুর্লভ সেইরূপ ঐ সার অংশ যথাযথরূপে আমার বুদ্ধিগম্য হইল না। এই জন্য আমি তাঁহাকে পুনরায় বুঝাইবার প্রার্থনা করি। উনি আপনার নাম করিলেন অতএব আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছি। প্রথমে আমি আপনার নিকট হইতে ত্রিপুরাদেবীর ভক্তিপূর্ণ বর্ণনা শুনিয়াছি; উঁহার উপাসনা করিয়া আমি দেবীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। কিন্তু সংবর্ত্ত মুনির কথিত সেই বিষয় এখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। অতএব উঁহার উপসনা করিয়া আর কতদিন বসিয়া থাকিব? ইহাতে লাভ কি হইবে? অতএব মহারাজ, সংবর্ত্ত মুনির জ্ঞান অবস্থা সম্বন্ধে

আমাকে কিছু বুঝাইয়া দিন। জ্ঞানহীন মনুষ্য জন্ম সফল হয় না। যতক্ষণ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ আমার মনে কোন কর্ম্ম করা ছেলে খেলা মাত্র। আজ পর্য্যন্ত আমি অনেক প্রকার কর্ম্ম করিয়াছি; বহু যজ্ঞ করিয়াছি; যজ্ঞেতে বড় বড় দক্ষিণা দিয়াছি, বহু অন্নদান করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাকে পূজা করিয়াছি। কিন্তু সংবর্ত্ত মুনির সাক্ষাতের পর আমার বোধগম্য হইল যে এই সব কর্ম্মের ফল সসীম (স্বল্প) ও ক্ষণভঙ্গুর। আমি বুঝিতেছি যে ক্ষণিক সুখই দুঃখ। সুখের আভাবই কিছু দুঃখ নহে, কিন্তু অল্প সুখই দুঃখ। কেন না ঐ সুখ সমাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। শুধু এই নয় ইহাতে আর এক ভয় আছে। সে ভয় এই যে সুখভোগাদি হইতে মৃত্যুর অনেক সাহায্য করে। আরএইরূপ কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না যাহার দ্বারা মৃত্যু রোধ হয়। উপাসনার ও এই ফল। সব উপাসনাই মানসিক অতএব কাল্পনিক, সেইজন্য ইহা ছেলে খেলা ভিন্ন আর কিছু নহে। আপনি যে রীতিতে উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন ঐ রীতিতে উপাসনা করা যায় আর অন্য প্রকারেও করা যায়। কর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনুসারে ঐ নিয়মে করা যায় আর বৃত্তির উহ্লাস অনুসারে অনিয়মিত ও হয়। শাস্ত্রে দুই রকমই আছে। কেবল উপাস্য ভেদে উহার বিধিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। সার কথা এই যে ইহা যজ্ঞের ন্যায় আর ইহার দ্বারা সত্য অর্থাৎ শ্বাশত ফল মেলা সম্ভব নহে। ভাল, কাল্পনিক বস্তু হইতে শ্বাশতফল কিরূপে মিলিবে? শাস্ত্রেতে কোথাও কোথাও এইরূপ ও বলিয়াছে যে—"যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন কর্ত্তব্য করা উচিত—ফলের দিকে নজর দিবে না।"

ইহা সত্য; কিন্তু আমার ত ভগবান সংবর্ত্তের স্থিতি কিছু ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। সেই মহাত্মা সর্ব্বাঙ্গশীতল আর কর্ত্তব্য ঝঞ্ঝাটের বিষের জ্বালা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন। সম্পূর্ণ নির্ভয়ে চলিতেছেন বলিয়া এই সব লোকব্যবহার উঁহার নিকট হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হইতেছে। উঁহার অবস্থা, দাবানলে প্রজ্বলিত জঙ্গলে স্বস্থচিত্তে করির সলিলে উপবেসনের ন্যায়। সর্ব্ব কর্ত্তব্য-মুক্তিরূপ অমৃত পান করিয়া উনি আনন্দিত হইয়াছেন। মহারাজ কৃপা করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিন উঁহার উক্ত অবস্থা কি করিয়া হইল। আমার এই কর্ত্তব্যরূপী কালসর্প ছাড়াইয়া দিন।"

এইরূপ বলিয়া পরশুরাম শ্রীগুরুর চরণে মস্তক নত করিলেন। উঁহাকে জ্ঞানের অধিকারী দেখিয়া স্বাভাবিক দয়া বশতঃ শ্রীগুরু বলিতে আরম্ভ করিলেন। উনি বলিলেন—"পরশুরাম, এইরূপ বুদ্ধির জন্য তুমি ধন্য। এইরূপ বুদ্ধি পাওয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির নৌকা পাওয়ায় ন্যায় হয়। উপাসনাদি কর্ম্ম করিয়া যে পূণ্য আর এইরূপ সুবিচার মিলিয়াছে সেই মনুষ্যই আপনাকে পরম-পাবনপদে লইয়া যাইতে পারে। সকলের হৃদয়াকাশে বাস করেন যে ত্রিপুরা দেবী যখন উপসনার বশে আপনার অনন্যভক্তের হৃদয়ে বিকাশিত হন, তখন তিনি উঁহাকে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর জাল হইতে শীঘ্র মুক্ত করেন। যতক্ষণ এই কর্ত্তব্যরূপী ভূতের অতিশয় ভয় না হয় ততক্ষণ উঁহার সুখ হয় না। কর্ত্তব্যরূপী কালসর্প দংশিত মনুষ্যের কল্যাণ কি করিয়া হইবে? কর্ত্তব্য—বিষে জর্জ্জরিত সব জগৎ মূর্চ্ছিত ও অন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে আত্মহিতের সত্য পথ দেখিতে

পায় না অতএব মনের বশে চলিবার জন্য বাব বার মোহে পতিত হয়। এইরূপে কর্ত্তব্যরূপী বিষে মূর্চ্ছিত এই জগৎ অনাদিকাল হইতে ভয়ঙ্কর বিষসাগরে পচিতেছে। উদাহরণের জন্য এই বলিতেছি :—একবার কতকগুলি যাত্রী ঘুরিতে ঘুরিতে বিন্ধাদ্রীতে পৌঁছছায়, ক্ষুধার তাড়নায় এদিকে ওদিকে ফল অন্বেষণ করিতে লাগিল। উহাদের কচিলা ফল মিলিল। দেখিতে কার্জ্জুর সদৃশ, তাহারা কাজু ফল মনে করিয়া উহা খাইল। ক্ষুধায় ব্যাকুল সেইজন্য স্বাদের দিকে নজর ছিল না কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কচিলার বিষ শরীরে ব্যাপ্ত হইলে উহাদের শরীর জ্বালা করিতে লাগিল। উহারা বুঝিয়া ছিল যে ইহা কাজু ফলেরই পরিণাম, তাহারা সেই বিষের জ্বালায় শান্তির জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। পুনরার তাহদের ধুতরা ফল মিলিল। লেবুর ভ্রমে উহারা ঐ সব খাইল। ইহার জন্য আরো অধিক বিপদে পড়িয়া পথভ্রান্ত হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল। জঙ্গল ঘন সেইজন্য পথে সূর্য্যের আলো সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে না। অতএব তাহারা গর্ত্তে পড়িতে ও উঠিতে লাগিল সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার চিহ্ন, হাত, পা, হাটু হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। পুণরায় উহারা পরস্পর এক অপরকে ঠকাইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে লড়াই সুরু হইল এবং একে অন্যকে কাঠ পাথর ও ধাক্কা মারিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উহাদের সর্ব্বশরীর জখম হইল। শেষে উহারা এক গ্রাম পাইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের সীমায় পৌঁছছায় এবং দরজার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। দ্বাররক্ষী সামনে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দিল। এই মূখদের

ইহা জানা ছিল না যে কোথায় কি করিতে হয় অতএব উহারা মারামারি সুরু করিল। পরিণামে দ্বাররক্ষা দ্বারা খুব প্রহৃত হইল। অসহ্য মার খাইবার পর যে যেদিকে পথ পাইল সেইদিকে পালাইতে লাগিল। কতক সহরের আশপাশে গর্ত্তে পড়িল। কেহ কুয়াতে পড়িয়া মরিয়া গেল। যে বাচিল সে কোন রকমে প্রাণ লইয়া পালায়ন করিল।

সারাংশ এই—মূর্খের ন্যায় সব লোক আপন কল্যাণ ইচ্ছা করিয়া কর্ত্তব্যরূপ বিষপান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছে এবং মোহে অন্ধ হইয়া স্বহস্তে আপনার নাশ করিতেছে। ওরে পরশুরাম, তোর অন্তরে বিচার উৎপন্ন হইয়াছে সেইজন্য তুই ধন্য। বিচার সবেরই মূল আর ব্রহ্মপদে যাইবার প্রথম সিড়ি। সুবিচার বিনা কাহার ও কল্যাণ কিরূপে হইবে? অবিচারই বড় ভারী অনর্থ। অবিচারে সব নষ্ট হইয়াছে। বিচারবানের সদাই জয়, উহারই সব ইষ্ট হয়। দৈত্য ও রাক্ষসের বিনাশ অবিচারই হইয়াছে। আর উত্তম বিচারের জন্য দেবতাদের সব সুখ মিলিয়াছে। উহারা শ্রীবিষ্ণুর সাহায্যে আপন শত্রুদের জয় করে তাহাতে ও সুবিচার কারণ। সুবিচারই সুখ-বৃক্ষের বীজ। ইহার দ্বারা সুখের অঙ্কুর ফোটে। বিচারই মনুষ্যের সর্ব্বাধিক শোভার কারণ হয়। বিচারেতেই ব্রহ্মদেব মহৎ পদ পাইয়াছেন এবং বিচার দ্বারাই শ্রীহরি সর্ব্বত্র পূজা পান। বিচার দ্বারাই শ্রীশঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ ও মহেশ্বর হইয়াছেন। শ্রীরাম চন্দ্র বুদ্ধিমান ছিলেন কিন্তু মৃগান্বেসনে অবিচার বশতঃ বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন; বিচারের বলে সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কা আক্রমণ করেন,

অবিচার করিয়া ব্রহ্মদেব মূর্খতাবশঃ অভিমান করিয়া আপনার মস্তক কাটিয়াছিলেন। অবিচার করিয়া মহাদেব রাক্ষসকে বর দিয়াছিলেন এবং যখন স্বয়ং ভস্ম হইবার উপক্রম দেখিয়া নিজে ভয়ে পলায়ন করিলেন। পূর্ব্বকালে হরি ও অবিচার করিয়া ভৃগু ঋষির স্ত্রীকে শাপ দিয়া নষ্ট করিবার ফলে আপনার উপর ভারী সঙ্কট আনিয়াছিলেন। শুধু এই নয় কোন দেবতা, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু ও সব অবিচারেই সঙ্কটে পড়ে। পরশুরাম, যে যখনও বিচার ছাড়ে না সেই ধীর ও মহাত্মা। তিনিই সদাই বন্দনীয়। এই অবিচারের কারণ লোকেরা অনাবশ্যক কর্ত্তব্যের বোঝা মস্তকে তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু পরে সে যখন বিচার করিতে থাকে তখন তাহার ফলে অনন্ত সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। সারাংশ, লোকের বিচারই বড় উপযোগী সাধন। যখন অবিচার তখন বিচার কোথা হইতে আসিবে? প্রখর ও উষ্ণতপ্ত বালুকার ময়দানে শীতল জল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যতক্ষন অবিচাররূপ অগ্নির জ্বালা চারিদিকে বিস্তৃত ততক্ষন কোন উপায় অন্বেষণ বিনা বিচারের শীতল স্পর্শ মেলা সম্ভব নহে। উপায় কেবল একই, আর উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহা কি? সকলের হৃদয়স্থিত শ্রীত্রিপুরা দেবীর আসল কৃপা। অবিচারে অন্ধ হইয়া লোকের ঘোর অজ্ঞানতাকে নষ্ট করিবার আর মোক্ষের উৎকৃষ্ট সাধন বিচাররূপী সূর্য্য উহার কৃপা বিনা কাহার কেমন করিয়া মিলিতে পারে? উহার কৃপা সম্পাদন করিবার উপায় ভক্তিপূর্ব্বক উহার সেবা করা। উত্তম সেবা দ্বারা সাধকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া ঐ দেবী অন্তঃকরণে বিচাররূপী সূর্য্য সদৃশ উদয় হন।

এইজন্য এই সর্ব্বান্তরযামী, চিন্ময়, শিব আর স্বাত্মস্বরূপ শ্রীত্রিপুরা মহেশ্বরীর ভজন করা চাই। উপাসনার ক্রম সৎগুরুর নিকট বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন। মনে কোন কামনা রহিবে না। আরাধনার মূলে প্রেম ও বিশ্বাস চাই। ইহার জন্য প্রথমে মহিমা স্পষ্ট রীতিতে শ্রবণ করা উচিত। পরশুরাম, এইজন্য প্রথমে আমি তোমায় উহার মাহাত্ম শুনাই। সেইজন্য তোমার আজ এই মঙ্গলময় ও মোক্ষদায়ক বিচার মিলিয়াছে। আর তোমার কোন ভয় নাই। যতক্ষণ না, বিচার উদয় হয় ততক্ষণ বড় ভয় থাকে। যে অবিচার গ্রস্ত তাহার পাছে পাছে ভয়। যে মনুষ্যের সন্নিপাত হইয়াছে তাহার আর ঔষধ দিবার কি প্রয়োজন—যতক্ষন শরীর গত ধাতু শুদ্ধ না হয় ততক্ষণ মৃত্যুভয় থাকে। যে মহত্বপূর্ণ বিচার প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারই মনুষ্যজন্ম সার্থক জানিবে। যদি এইরূপ উত্তম জন্ম পাইয়াও মনুষ্যের সুবিচার প্রাপ্তি না হয় ত সেই জীবন নিস্ফল জানিবে। বিচারপূর্ণ জীবনই সফল জানিবে। বিচারহীন মুনুষ্য কুপমণ্ডূক সদৃশ। কুপে জন্মিত মণ্ডূক যেমন শুভ: দেখে না অশুভও দেখে না আর যেমন জন্মায় তেমনি মরে সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডকুপে জন্মিয়া মনুষ্যও বৃথা জীবন ব্যতীত করে। কারণ উহারা জানে না যে কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল হয়। তাহারা ও যেমন জন্মায় তেমনি মরে। পুত্র, সম্পত্তি আদি দুঃখকে তাহারা সুখ বলিয়া বুঝে। তাহারা অবিচারের প্রভাবে সংসাররূপ অগ্নিতে জ্বলিতে থালে। দুঃখে ধড়পড় করিয়া ও উহা ত্যাগ করিতে পারে না। শতলাথি খাইয়া ও গাধা যেমন গাধীর পিছে লাগিয়া

থাকে। সেইরূপ ইহারা সদাই সংসারের পিছে লাগিয়া থাকে। পরশুরাম, কেবল তুমি আজ বিচারশীল হইয়া দুঃখের পরপারে পৌঁছাইয়াছ।”

—০—

তৃতীয় প্রকরণ

—০—

হেমচূড় ও হেমলেখা।

—০—

হেমলেখাং রাজপুত্রো ভোগেষ্বতিকামিনীম্ ॥
উদাসীনাং সদা দ্রষ্ট্বা প্রপঞ্চ রহসি কচিৎ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীদত্তাত্রয়ের এই ভাষণকে অত্যন্ত প্রেম পূর্ব্বক শুনিয়া পরশুরাম পুনরায় বিনয় পূর্ব্বক এক প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন—“ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন সবই সত্য। অবিচারই সব লোকের যথার্থই হানিকারক। বিচারেই মঙ্গল হয়। আমি ইহাও জানিয়াছি যে বিচারের জন্য উপায় পরম্পরা মাহাত্ম্য শ্রবণ করাই প্রয়োজন। কিন্তু ইহাতেও আমার এক বড় সংশয় হয়। সেই শ্রবণই কেমন করিয়া হইবে? উহার জন্য উপায় কি? যদি বল তাহা স্বয়ংই হয় তবে আজ পর্য্যন্ত সব লোকেদের কেন হয় নাই? অথবা আমারই আজ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিবার ইচ্ছা কেন হয় নাই? অন্য যে আমাপেক্ষা অধিক দুঃখ পায়—প্রতিপলে আঘাত সহ্য করে—উহার শ্রবণরূপ সাধন কেন

মিলিল না? কৃপা করে আমার এই বিষয় ভাল রকম বুঝাইয়া দিন।"

এই প্রশ্ন শুনিয়া দয়ানিধি দত্তাত্রেয়ের বড় আনন্দ হইল। উনি কহিলেন—"পরশুরাম, শুন! আমি তোমাকে মোক্ষের যথার্থ মূল কারণ বলিতেছি। সন্ত-সমাগম অর্থাৎ সৎসঙ্গেই দুঃখ নাশের সম্পূর্ণ আদি কারণ। পরমার্থ ফল পাইবার সৎসঙ্গই বীজ। তুমি মহাত্মা সংবর্ত্তকের সাক্ষাৎ সঙ্গলাভ করিবার কারণ এই মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছ। সন্তের সহিত পরিচয় হইবার পর সেই পরমসুখ দেখা যায়। সৎসঙ্গ বিনা যথার্থ মঙ্গল কাহারও কোথায় হইয়াছে? ব্যবহার ও এইরূপ কি, যে যেরূপ সঙ্গ করে সে সেইরূপ ফল পায়। আমি তোমায় এই সম্বন্ধে এক গল্প বলিতেছি। প্রাচীনকালে দশার্ন দেশে মুক্তপীড় নামক এক রাজা ছিল। উহার হেমচূড় ও মণিচূড় দুইপুত্র ছিল। ইহারা দুইজনে সুন্দর গুণবান, আর সব বিদ্যায় নিপুণ ছিল। উহাদের একবার মৃগয়া করিতে ইচ্ছা হয়। আপন আপন ধনুর্ব্বান লইয়া ও সঙ্গে কিছু সৈন্য লইয়া সহ্যাদ্রির এক ভয়ঙ্কর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। আপনার বান বিদ্যার কৌশলে উহারা বহু সিংহ, বাঘ, চিতা, ভল্লুক হরিণাদি শীকার করিয়াছিল। কিন্তু ইহার, পরেই প্রচণ্ড আঁধী উঠে। বালি ও কাঁঙ্করের বৃষ্টি হইতে লাগিল। ধূলায় আকাশ ভরিয়া গেল আর আমাবস্যা রাত্রের ন্যায় অন্ধকার হইয়া গেল। মনুষ্য, বৃক্ষ প্রস্তরাদি কিছু চেনা যাইতেছে না। উচ্চ গহ্বরের জ্ঞান হইতেছিল না। এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে কঁঙ্কর পাথর দ্বারা পিড়ীত হইবার

পর সব সৈন্যরা যেদিকে মন গেল সেইদিকেই পলাইল। কেহ কেহ বৃক্ষে আশ্রয় লইল, কেহ বা চটির আশ্রয় পাইল কেহ বা গুহার স্মরণ লইল। দুই অশ্বারোহী ও দূরে চলিয়া গেল। উহাদের মধ্যে হেম-চূড়ের এক তপস্বীর আশ্রম মিলিল। উহার চতুস্পার্শে কদলী ও খর্জ্জুর বৃক্ষের শ্রেণী সুতরাং উহা অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল। সেখানে সে এক সুন্দরী ও তেজস্বী রমনী দেখিল। উহার শারিরীক কান্তি তপ্ত সোনার ন্যায় শোভয়মান ছিল। উহার লক্ষ্মীসদৃশ স্বরূপ দেখে রাজপুত্র কিছু পরিহাস ছলে কহিতে লাগিল :—"হে কমল নয়নে তুমি কে? এই নির্জ্জন আর ভয়ঙ্কর জঙ্গলে তুমি নির্ভয়ে কিরূপে রহিয়াছ? তুমি কাহার? তুমি কি একলা আছ বা তোমার সহিত অন্য কেহ আছে?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে শুদ্ধান্ত—করণবতী রমনী কহিতে লাগিল ঃ—"রাজপুত্র! ভিতরে আসুন ও এই আসনে উপবেশন করুন। অতিথি সৎকার করা আমাদেব ন্যায় তপস্বীনীর ধর্ম্ম। বুঝিতেছি আপনি মেঘের প্রচণ্ডতার জন্য ক্লান্ত হইয়াছেন অতএব ঐ খর্জ্জুর বৃক্ষে ঘোড়া বাঁধিয়া এইস্থানে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। তাহার পর আমার পরিচয় আপান পাইবেন।"

রাজপুত্র সেইরূপই করিলেন। পরে এই কন্যা তাহাকে কিছু ফল ও জল খাইবার জন্য দিল। রাজপুত্র জলোযোগ করিবার পর তাহাকে শ্রমরহিত দেখিয়া ঐ কন্যা মধুমাখা মিষ্ঠ বাক্যে বলিতে লাগিল ঃ—"রাজপুত্র, শিবভক্ত ব্যাঘ্রপদ নামক মুনি তপবলে সব স্বর্গ জিতিয়া লইয়াছেন। উনি ব্রহ্মজ্ঞানী, আর অন্য বড় বড় মুনিগণও

উহাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। আমি উহার ধর্ম্মকন্যা। আমার নাম হেমলেখা। এক সময় এই বেণা নদীতে বিদ্যুতপ্রভা নাম্নী এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বিদ্যাধরী স্নান করিতেছিল। সেই সময় বঙ্গদেশের রাজা সুষেণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজা ঐ সুন্দরীকে নদীতে স্নান করিতে দেখিলেন। ভিজা কাপড়ের জন্য তাহার স্তন দেখা যাইতেছিল আর তাহাই দেখিয়া তিনি কামে পীড়িত হইলেন। তখন ঐ রাজা বিদ্যাধরীকে প্রার্থনা করিলেন। সে ও তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল। অতএব তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়া ভোগের জন্য দেহার্পণ করিল। ইহার পর রাজা নিজ নগরে চলিয়া গেলেন। সেই সময় তাহার গর্ভ হইল। কিন্তু এইরূপ দোষ করিলে পতির ভয়ে গর্ভকে তথায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সেই সময় সেই রাজর্ষির অমোঘ বীর্য্যে আমার জন্ম হইল। পরে সন্ধ্যো-পাসনা করিবার জন্য ব্যাঘ্রপদ তথায় উপস্থিত হইয়া আমায় দেখিলেন। দয়া বশতঃ আমাকে নিজ আশ্রমে আনিয়া আজ পর্য্যন্ত মাতার ন্যায় পালন করিতেছেন। ধর্ম্মপালককে ও পিতা বলা হয়। সুতরাং আমি উহার ধর্ম্মকন্যা। উহার সেবা করিতে থাকি। উহার সামর্থের প্রতাপে আমার কোন ভয় নাই। রাক্ষস কিম্বা দেবতা কেহই এখানে কুমতলবে প্রবেশ করিতে পারে না। যদি কেহ প্রবেশ করে ত সে বিনাশ হইবে। আমি আমার পরিচয় দিলাম। এখন আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। পিতা ঠাকুর আসিতেছেন। উহাকে নমস্কার করিয়া আপনার কথা শুনাইবেন ও আপনার ইচ্ছা পূরণ করিয়া প্রাতঃকালে চলিয়া যাইবেন। হেমলেখার কথা শুনিয়া

রাজপুত্রের মনে তাহাকে কিছু বলিবার জন্য ইচ্ছা হইল কিন্তু ধৈর্য্য পূর্ব্বক দমন করিতে পারিতেছিল না। সেইজন্য সে চকিত হইল। তাহাকে কাম পীড়িত দেখিয়া ঐ চতুরা কন্যা কহিতে লাগিল :—
"রাজপুত্র, একটু ধৈর্য্য ধরুন। আমার পিতা আগত প্রায়। উনি আসিলে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।" এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই মুনিবর পুষ্প ফলমূলাদি লইয়া সেথায় উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া [illegible] আত্ম পরিচয় দিল। পুনরায় আজ্ঞা পাইয়া [illegible] আসনে উপবেশন করিল। মুনি যোগদৃষ্টিতে রাজপুত্র কামে [illegible] হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। সুযোগ দেখিয়া হেমলেখাকে [illegible] হস্তে অর্পণ করিলেন। উহাকে পাইয়া রাজপুত্র সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া নিজ নগরে ফিরিয়া আসিল। উহার পিতা মুক্তচূড়েরও বড় সন্তোষ হইল এবং তাহার সহিত খুব সমারম্ভে তাহার বিবাহ দিলেন।

বিবাহ হইবার পর রাজপুত্র হেমচূড় তাহার চতুরা ও সুন্দরী পত্নীর সহিত মহলে, উপবনে, নদীতটাদি স্থানে বিহার করিতে লাগিল। কিন্তু সে শীঘ্র বুঝিতে পারিল যে উহার স্ত্রী হেমলেখা সুখভোগেচ্ছা রহিত ও উদাসিনী। একদিন নির্জ্জনে সে তাহাকে কহিল—"প্রিয়ে, আমি তোমায় কত ভালবাসি কিন্তু তুমি কেন আমায় ভালবাস না? তোমার হাসি বড়ই মনোহর কিন্তু তোমায় বিষয়ে আসক্ত কেন দেখিতেছি না? কেন আমা হইতে কি তুমি সুখ পাইতেছ না? কিন্তু এই বা কিরূপ হয়? ভাল ভাল বিষয়েও তোমায় আকাঙ্খা দেখিতেছি না। তুমি এরূপ অরসিকা অতএব তোমার সঙ্গলাভে

আমার সুখ কেমন করিয়া হইবে? মনে হয়, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ঠ হইলেও তোমার মন অন্য কোথাও আকৃষ্ট আছে। আমি কথা কহিতে থাকি তুমি তাহা কাণেও লও না। অনেকক্ষনপরে আমি তোমার ঘরে আসিয়া তোমায় আলিঙ্গন করিলেও তুমি কেবল মাত্র "নাথ, কখন আসিলেন?" এই কথা ছাড়া তুমি এইরূপ আবিকলিত চিত্তে বলিয়া থাক যেন তুমি কিছুই বুঝিতেছ না! সুন্দর ও দুর্লভ উপভোগ্য বস্তুর উপর তোমার মনে আসক্তি জাগে না; তাহার প্রতি তুমি কিছু মাত্র প্রেম দেখাও না। শুধু কি এই? যখনই আমি তোমার নিকট থাকি না তখনই তুমি নয়ন বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক। কাছে আসিলেই ইহা আমি সদাই দেখি। তুমি যখন এইরূপ বিষয়োপভোগ বিমুখ তখন কাষ্ঠের পুতলীর ন্যায় তোমার সহবাসে আমার কি সুখ মিলিবে? তুমি ভিন্ন আমার আর কিছুই ভাল লাগে না। যেমন কমল চন্দ্রিকার সর্ব্বদা অনুসরণ করে সেইরূপই আমিও তোমার অনুসরণ করি। অতএব আমায় বল কিসের জন্য তোমার মন সংসার-সুখে এত বিমুখ হইল? তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমার শপথ—এই সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া আমার মনের সংশয় ভঞ্জন করিয়া দাও।

চতুর্থ প্রকরণ

—০—

পতি পত্নীর বাক্যালাপ

কিং স্যাস্প্রিয়তমং লোকে কিং নু স্যাদপ্রিয়ং খলু ॥
নৈতজ্জানামি তত্ত্বং মে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥৪॥

এইরূপ পতির কথা শুনিয়া সেই শুদ্ধা বালিকা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পতির তত্ত্ববোধের জন্য যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিতে লাগিল :— "রাজপুত্র, বলিতেছি শুনুন! এই কথা ঠিক নহে যে আপনার প্রতি আমার প্রেম নাই কিন্তু বহুদিন হইতে এক বড় ভারি সংশয় আমার হইয়াছে তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। বিচার এই যে সংসারে মনুষ্যের প্রিয় কোন বস্তু ও অপ্রিয় কোন বস্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। আমি বহুদিন হইতে ইহার বিচার করিতেছি কিন্তু স্ত্রীস্বভাব বশতঃ আমার ঠিক ঠিক বোধগম্য হইতেছে না। আপনি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহার বিচার করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিন।"

এই কথা শুনিয়া হেমচূড় হাঁসিতে লাগিল। সে কহিলঃ— "ঐ কথা ঠিক যে স্ত্রীবুদ্ধি মূর্খতাপূর্ণ। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রিয় ও অপ্রিয়কে পশুপক্ষী এমন কি কীট পতঙ্গ ও বুঝে উহাতে ইহা স্পষ্ট জানাযায় যে প্রিয়বস্তুতে প্রবৃত্তি হয় আর অপ্রিয় বস্তুতে

নিবৃত্তি হয়। ইহাতে বড় ভারি বিচারের কি প্রয়োজন? যাহাতে সুখ হয় সেই প্রিয় আর যাহাতে দুঃখ হয় সেই অপ্রিয়। প্রিয়ে, ইহাতে উচ্চজ্ঞানের কি কথা আছে আর তুমি বা সদা কি বিচার করিতেছ!"

পতির বাক্য শুনিয়া হেমলেখা পুনরায় বলিতে লাগিলঃ—"ঠিক কথা—স্ত্রালোকমূর্খই হয়; উহাদের নিকট উচ্চ বিচার করিবার শক্তি থাকে না। কিন্তু আপনি ত উত্তম বিচারী অতএব আমাকে বুঝাইয়া দিন। আপনি বুঝাইয়া দিলে আমি এই বিচার ছাড়িয়া দিব এবং আপনার সহিত উপভোগ করিবার জন্য সদাই প্রস্তুত থাকিব। রাজন, আপনার সূক্ষ্ম বিচারে এই কথা বলা ঠিকই হইয়াছে যে যাহাতে সুখ হয় তাহা প্রিয় আর যাহাতে দুঃখ হয় তাহা অপ্রিয় কিন্তু যখন দেশ, কাল বদলাইয়া যায় তখন একই পদার্থ, সুখ ও দুঃখ দুইই উৎপন্ন করে। সুতরাং সুখ ও দুঃখের নিশ্চয়াত্মক স্থল কোথায় থাকে? উদাহরণের জন্য অগ্নিকেই ধরুণ। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহাতে ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক পরিণাম হয় আর ভিন্ন ভিন্ন আকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপযোগ হয়। যে অগ্নি শীতে অত্যন্ত উপযোগী মনে হয় তাহাই আবার গ্রীষ্মে ত্যাজ্য হয় অর্থাৎ দেশ ভেদে উহা প্রিয়—অপ্রিয় হয়। উহা শীতল প্রকৃতি লোকের ভাল লাগে ও উষ্ণ প্রকৃতি লোকের ভাল লাগে না। এই অল্প অগ্নির এক রকম ও অধিকের অন্যরকম হয়। দ্রব্য, স্ত্রী, পুত্র এবং রাজ্যের ও এই দশা হয়। আপনি আপনার মুক্তাচূড় মহারাজকে দেখুন। উহার

সন্ততি, সম্পত্তি স্ত্রী সবকিছু উপলব্ধ হইতেছে, তথাপি উনি নিত্য দুঃখিত কেন? আর তিনি ভিন্ন অন্য লোক সুখে কি-রূপ মগ্ন থাকে? যদি আপনি বলেন যে সুখদায়ক বিষয় ভোগ অসীম অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন নহে—অল্পই হয় তাহা হইলে কি এই সবের সব কেহই কি কখন ও পাইয়াছে? ইহার পরে ও যদি আপনি বলেন যে অল্প বিষয় প্রাপ্ত হইলে অল্প সুখ হয়; তাহা হইলে আমি বলব যে ইহা একেবারেই সুখ নহে; কারণ ইহাতে দুঃখ মিশ্রিত আছে। দুঃখ শারীরিক ও মানষিক দুই প্রকারের হয়। ইচ্ছা উৎপন্ন হইলেই যে দুঃখ হয় তাহা মানষিক দুঃখ আর রোগাদির জন্য যে বাহির দুঃখ তাহা শারীরিক দুঃখ। ইহার মধ্যে মানষিক দুঃখ শারীরিক অপেক্ষা অধিক। ইহা সমস্ত সংসার গ্রাস করিয়াছে। দুঃখরূপী বৃক্ষের বড় জবদস্তি বীজ---বাঞ্ছা। ইহার অর্থাৎ বাঞ্ছার জন্য স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দাসত্ব স্বীকার করিয়া সদাই নিস্পীড়িত হয়। রাজপুত্র, ইচ্ছার শেষ থাকিলে অর্থাৎ ইচ্ছা পূরণ না হইলে যে সুখ হয় তাহা কি দুঃখের সমান নহে? এই সুখ কীড়ের ও হয়। কিন্তু কৃমি কীটাদি তীর্য্যক যোনীর জন্তুর বাসনা কমই থাকে অতএব এক দৃষ্টিতে উহাদের সুখ মনুষ্যাদির সুখাপেক্ষা ভালই বলা যায়, কিন্তু শতইচ্ছাবান এই মনুষ্যের সুখকে সুখ কিরূপে বলা যায়? অনেক বাসনাবিশিষ্ট মনুষ্য কিছু পাইলেই যদি সুখী হইতে তাহা হইলে বলুন কে সুখী নয়? যদি সর্ব্বঙ্গে অগ্নি জ্বলিলে চন্দনের ছোট এক বিন্দুতে শরীর শীতল হইত তাহা হইলে তাহাদেরও সুখ বলা যাইত। অনেকেই মনে করে

স্ত্রীকে আলিঙ্গণ করিয়া পুরুষ সুখী হয় কিন্তু তাহাও শারারিক দুঃখই। কাম বিকারের আবেশে সব বিপরীত মনে হয়, আর কামভোগের পর যে শ্রম হয় তাহা ভারবাহী পশুর শ্রমের সমতুল্য হয়। এই জন্য আমি ইহা বুঝিতে পারি না যে আপনি উহাতে সুখ কি করিয়া বুঝিতেছেন। নাথ, স্ত্রীর সঙ্গমে আপনার যে স্পর্শ সুখ ঐ সুখ কি কুকুরের ও হয় না? এখন যদি আপনী বলেন যে স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের জন্য আপনার কুকুরাপেক্ষা অধিক সুখ হয় তাহা হইলে ইহা স্বপ্ন—স্ত্রী সংযোগের মত এক ভাবনামাত্রাই হয়—ইহাতে অধিক কিছুই নাই। আমি এই সম্বন্ধে এক উদাহরণ দিতেছিঃ—

এক রাজপুত্র কামদেব অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ছিল। তাহার এক অত্যন্ত মনোহর সুকুমারী স্ত্রী ছিল। সে তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল। কিন্তু উহার স্ত্রীর মন রাজপুত্রের এক চাকরের প্রতি আসক্ত ছিল। চাকর ছলে রাজপুত্রকে বোকা বানাইয়াছিল। রাজপুত্রকে মোহিত করিবার জন্য সেই চাকর তাহাকে প্রচুর মদ্যপান করাইত আর যখন যে বেহুস হইয়া যাইত তখন ঐ চাকর রাজপুত্রের নিকট এক কুরূপা দাসীকে পাঠাইয়া দিত; ঐরূপে ঐ চাকর রাজপুত্রের সুন্দরী স্ত্রীর সহিত নিরন্তর ইচ্ছাপূর্ব্বক উপভোগ করিতে লাগিল। মদ্যের নেশায় চুর চুর হইয়া হইয়া রাজপুত্র সেই কুরূপা দাসীর সহবাসে আপনাকে ধন্য মনে করিত। রাজপুত্র মনে করিত যে সে ঐরূপ ত্রৈলক্য সুন্দরী প্রাণ প্রিয়াকে নিত্য উপভোগ করে অতএব উহার মত ভাগ্যবান কেহ

নাই। এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইল একদিন দৈবযোগে চাকর রাজপুত্রের নিকট মদ্য রাখিয়া অন্যস্থানে অত্যন্ত প্রয়োজনে বাহির যাইতে হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে রাজপুত্র ও অধিক মদ্যপান করেন নাই—অল্পই পান করিয়াছিলেন। ইহার পর অন্যান্য দিনের মত রতিসুখের জন্য উৎসুক হইয়া আপনার বিলাসালয়ে গেল। বিলাসের অনন্ত সামগ্রীর কারণ ঐ বিলাসগৃহ অত্যন্ত মনোহর দেখাইতেছিল। তথায় গিয়াই কামবেগাক্রান্ত হইয়া পালঙ্কে শয়-মানা দাসীর সহিত অত্যন্ত আনন্দের সহিত বিলাসে মগ্ন হইল। ইহার পরে উহার মনে ঐ কুরূপা দাসীর সম্বন্ধে সন্দেহ হইল। সে বুঝিল যে কোথাও ভুল হইয়াছে—তাহার সহিত প্রতারণা করা হইয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল, ইহা কিরূপে হইল। সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলঃ—"আমার সেই স্ত্রী কোথায়?" রাজপুত্রকে সচেতন দেখিয়া ঐ দাসী অত্যন্ত ভয় পাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। উহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে কিছু বলিতে পারিতেছিল না। রাজপুত্র তখন স্পষ্ট বুঝিল যে তাহাকে ঠকাইবার জন্য এইরূপ ফন্দি করা হইয়াছে। ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল; সে তৎক্ষণাৎ দাসীর কেশাকর্ষণ করিয়া অন্যহস্তে অসি তুলিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল,— সব কথা খুলিয়া বল? ঠিক ঠিক না বলিলে তুই এখনই মরিবি। বল শীঘ্র বল। ইহা শ্রবণ করিয়া দাসী একবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া গেল ও নিজ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বহুদিন হইতে সে সব ব্যাপার হইতেছিল সে সবই ঠিক ঠিক বলিল। শুধু এই নহে সে রাজপুত্রকে দেখাইয়া দিল যে তাহার স্ত্রী চাকরের সহিত বিলাসে

তখনও রত রহিয়াছে। তথায় মেঝে এক সতরঞ্চি পাতা, চাকরের কাল শরীর, হলদে চক্ষু, ধূলাচ্ছাদিত দেহ, রুক্ষ আব ঘৃণাজনক চেহারা— এইরূপ হইলেও পাটরাণী সেই চাকরের সহিত প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন করিয়া শুইয়াছিল। রতিভোগের জন্য সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল আর নিদ্রায় দুইজনই অচেতন ছিল। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া রাজপুত্র আপনাকে ভুলিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাবধান হইয়া স্বয়ং নিজেকে বলিতে লাগিল :—

হেমলেখা পুনবার কহিতে লাগিল :—'নাথ! সে কি বলিতে লাগিল শুনুন। সে কহিতে লাগিল :— হায়, হায়, আমি অনার্য্য, আমায় ধিক্কার! আমি মদ্য পানের জন্য অত্যন্ত মূর্খ হইয়া গিয়াছিলাম! যে এরূপ স্ত্রীর সহিত প্রেম করে সে অত্যন্ত মূর্খ। সেই অধম পুরুষকে ধিক্কার! বৃক্ষের উপর বিহারকারী পাখীর ন্যায় স্ত্রী কাহারও হয় না। যে ইহার প্রেমে বিশ্বাস করে সে বনের গাধার সমান। কারণ শরৎ ঋতুতে মেঘের দশা যেমন ক্ষণিক ও অস্থির ঐরূপ কিম্বা তদপেক্ষা চঞ্চল ও দুর্বোধ্য স্ত্রীর চরিত্র। ওহো! আমার এখন পর্যন্ত স্ত্রীর স্বভাব জানা ছিল না। আমার স্ত্রীর প্রতি আমি সম্পূর্ণ আসক্ত। আর সে আমায় ছেড়ে ভৃত্যের সহবাস করে। অন্যাসক্ত হইয়াও বাহিরে আমার প্রতি প্রেমভাবের ভাণ সদাই দেখাইত। আর আমি মদ্যপানে মুগ্ধ হইয়া তাহার কপটতা একটুও বুঝিতে পারি নাই। উহাকে নিজ ছায়ার ন্যায় আপন জানিয়া মনে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। এই ঘৃণিত দাসীকে ভোগ করিয়া আমি খুব মজিয়া গিয়াছিলাম। বাঃ রে ভৃত্য! অদ্ভুত স্বরূপ ও বিচিত্র

শরীর। আমার স্ত্রীকে তুই কি করিয়া সৌন্দর্য্য দেখাইলি? আমার উপর সকলের নজর— আমার সৌন্দর্য্য সবকেই আকর্ষিত করে— আমি আমার স্ত্রীকে খুব প্রেম করিতাম কিন্তু সে কি বুঝিয়া আমায় ত্যাগ করিয়া উহার অধীনতা স্বীকার করিল।”

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজপুত্রের মন বিরক্ত হইয়া গেল। আর সমস্ত ইচ্ছা ও বাসনাকে ত্যাগ করিয়া অবশেষে বনে চলিয়া গেল। এই জন্য নাথ, ইহা স্পষ্ট যে সুন্দরতা মনের তৈরী এক কল্পনা মাত্র। আপনার আমার নিকট সুন্দরতা ও রতিভোগে অতিশয় যে সুখ মিলে, সেইরূপ কিম্বা ততোধিক সুখ কুরূপা স্ত্রীতে পুরুষের হয়। আমি এই কথা আপনার মনে সম্পূর্ণ অঙ্কিত করিয়া দিতেছি অর্থাৎ বুঝাইয়া দিতেছি— আপনি কেবল একাগ্র মনে শ্রবণ করুণ। স্ত্রী যে যে চক্ষে দেখা যায়, তাহা তাহার বাহ্য আকার। কিন্তু সঙ্কল্পরূপে চিত্তে উহার কিছু প্রতিবিম্ব টানিয়া লয় অর্থাৎ প্রতি-বিম্বের ছাপ পড়ে— সেখানে এইরূপ চিত্র জন্মায় যে উহা সুন্দর। এইরূপ সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হইতে হইতে উহাকে ভোগ করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া মনুষ্য কামে ব্যাকুল হইয়া যায়।

তখন সে রতিসুখের অনুভব করে। মনে ক্ষুব্ধতা না থাকিলে অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রী হইতে ও রতিসুখ হয় না। ক্ষুব্ধতা উৎপন্ন হইবার জন্য স্ত্রীর সৌন্দর্যর ভাব পুনঃ পুনঃ চিত্তে চিত্রিত হইবার আবশ্যক। এইজন্য খুব ছোট শিশু আর একচিত্ততার আভ্যাসী যোগীর এরূপ ক্ষোভ কখনও উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ উহার স্ত্রীতে সুখ বোধ হয় না। অতএব ইহা নিশ্চিত হয় যে সুন্দরী কিম্বা কুরূপা হউক কিন্তু উহাতে

যে যে মনুষ্যের রতিসুখ মিলে সেই সেই মনুষ্যের মনে সে যে সুন্দরী এইরূপ চিত্র অঙ্কিত হইবার পরেই এইরূপ হয়। সে স্ত্রীর শরীর সম্পূর্ণ ঘৃনিত ও কুরূপ তাহার সন্তান সম্ভাবনা হইলে স্বতঃই ইহা প্রমাণিত হয় যে সে তরুণ পুরুষের সহিত ভোগ করিয়াছে। যদি তাহাকে কুরূপা বলিয়া মানিয়া লও অথবা যদি মনে উহার সৌন্দর্য অঙ্কিক না হয় ত মুনুষ্যের উহার সঙ্গমে রতিসুখ কেমন করিয়া মিলিবে? আর এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব সূচক চিত্র অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব নহে। কামী পুরুষের এই মনভ্রষ্টতা (মতিচ্ছিন্নতা) সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই মূর্খ নিতম্ব ও যোনীর তুচ্ছভাগেও সর্ব্বাধিক সুন্দরতা দেখে। যখন সে মলমুত্রাদিতে ভরা অঙ্গতেও সুন্দর দেখে, তাহইলে বল তাহার অন্য অঙ্গে ও সৌন্দর্য্য কেন না দেখিবে? অতএব প্রাণনাথ দেখুন—সৌন্দর্য কি রকম বস্তু? "ইহা সুন্দর" এইরূপ ভাবনা "কল্পনা" বিনা কোথাও কেহই বস্তু সুখদাষক বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। মধুরসের মধুরতার ন্যায় সুন্দরতাও যদি স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে কি ছোট শিশুর ও অনুভবে কি আসিত না? ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির লোক দেখা যায়। কাহারও এক পা, কাহারও এক চক্ষু, কাহারও কাণ গাধার ন্যায়, কাহারও মুখ ঘোড়ার মত, কাহারও কাণ লম্বা, কাহারও দাঁত হালের ন্যায় মুখের বাহিরে আসে, কাহারও নাকই থাকে না, কাহারও নাক বড় লম্বা, কাহার শরীর লোমে ভরা, কাহারও দেহে একেবারে চুল নাই, কাহারও চুল কটা, কাহারও ভ্রু নাই, কাহারও ভ্রু বড় ঘন। কাহারও শরীর কাকের ন্যায় কাল রংএর কাহারও

লাল, সাদা ও কাহারও হল্‌দে হয়। সারাংশ এই :—অনেক প্রকার লোক, আপন আপন জাতির স্ত্রীপুত্রের আপনার মতই প্রেমসুখের অনুভব করে। নাথ, ইহা ভিন্ন আপনি সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ইহা বিচার করুন, সুখের সাধন সব বস্তু হইতে স্ত্রীর শরীর প্রধান যাহা সকলের প্রিয় বলিয়া বোধ হয়. আর যাহার উপর বড় বড় মহাত্মাও মোহিত হন, সেই স্ত্রীর শরীর—অথবা স্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয় ও সুন্দর দেখায় এই পুরুষের শরীর—বস্তুতঃ ইহা কি? ইহা মাংসের দ্বারা আচ্ছাদিত, রক্তে ভরা, শিরা দিয়া বাঁধা, ত্বকে বেষ্টিত। ভিতর হাড়ে গঠিত, বাহিরে চামড়ায় আচ্ছাদিত। উহা কফ পিত্তাদি ব্যাপ্ত আর মলমূত্রে ভরা। ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা যে শুক্র শোণিতে জন্ম আর মুত্রদ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়াছে এই অমঙ্গল শরীরকেও প্রিয় বলিয়া বোঝে। যে এইরূপ অত্যন্ত ঘৃণিত শরীরে প্রেম করে উহার সহিত আর বিষ্টার ক্রিমির সহিত কি ভেদ হইতে পারে? হে রাজপুত্র এই যে আমার শরীর আপনার বড় প্রিয় বোধ হইতেছে উহার ত্বক রক্তাদির ভিন্ন ভিন্ন স্থিতির দৃষ্টিতে বিচার করুণ। এই অবস্থা অন্য বস্তুর। মিষ্ট, টকাদি ষোড়স ভোজন উহার পরিণাম ও আপনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অল্প বিচার করুণ। যাহা কিছু আহার করিবে পরিণামে বিষ্টাই হইবে। সংসারের এই সব দশা দেখিয়া আপনি আমাকে বলুন এখন প্রিয় কি আর অপ্রিয় কি?

হেমলেখার উক্ত অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া হেমচূড়ের বড় বিস্ময় বোধ হইল। সে এ বিষয়ে স্বয়ং পুনরায় বিচার করিল। অনন্তর উহার ভোগ্য পদার্থের প্রতি ঘৃণা হইতে লাগিল আর যথার্থ বৈরাগ্য হইল।

ফলতঃ সে আপনার প্রিয়াকে অনেক প্রশ্ন করিয়া শেষে আত্মস্বরূপ জানিয়া লইল। আর আত্মস্বরূপ-চৈতন্য ত্রিপুরাদেবীর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী হইয়া গেল। উহার সব বস্তু আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হইল আর উনি জীবনমুক্ত হইয়া গেলেন। উহার ভাই মনিচূড় ও উহার নিকট হইতে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইল। রাজা মুক্তচূড় আপনার পুত্রের নিকট আত্মস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইল আর রাণীও আপনার বধূ হেমলেখার নিকট আত্মস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইল। ক্রমে ক্রমে রাজার মন্ত্রী আর নগরবাসীও জ্ঞানী হইয়া গেল। শেষে ঐ নগরে এমন লোক রহিল না যে ব্রহ্মজ্ঞান জানে না। কাম ক্রোধাদি সাংসারিক বাসনার ও কোন খোজ পাওয়া যায় না। আর ঐ বিশাল নগর ব্রহ্মপুরীর সমান সংসারে উত্তম ও উচ্চ দশায় পৌহুঁছায়।

একদিন বামদেবাদি ব্রহ্মনিষ্ট মহাত্মাগণ মণ্ডলী ভ্রমন করিতে করিতে তথায় পৌহুছান, তাঁহারা দেখিলেন যে সেখানকার তোতা ময়নাদি পক্ষীও সচ্চিদানন্দ স্বরূপের গুণগাণ করিতেছে। অতএব এই মহাত্মারা সেই নগরের বিদ্যানগর নাম রাখিলেন।

এখন সেই নগর ঐ নামে প্রসিদ্ধ। পরশুরাম, এজন্য সজ্জনের সমাগমেই সব কল্যানের মূল। ঐ হেমলেখার সঙ্গতে তাহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। অতএব ঠিক ঠিক স্মরণ রাখিও যে সৎসঙ্গই মোক্ষের মূল কারণ।

আশ্চর্য্য কথা।

পুরা মে জননী কাংচিৎক্রীড়ার্থায় সখীং দদৌ ॥
সা স্বভাবসতী কাংচিদসতীমনুসঙ্গতা ॥১॥

এইরূপ শ্রীদত্তাত্রেয়ের নিকট সৎসঙ্গের পরিণাম শুনিয়া পরশুরামের বড় আনন্দ হইল। উনি আর কিছু প্রশ্ন করিবার জন্য কহিতে লাগিলেনঃ— "ভগবন্, আপনি কহিলেন সমস্ত কল্যাণের সাধন সৎ-সঙ্গতি। ইহা নিঃসন্দেহ, আপনার এই কথা আমারও মনে ঠিক এইরূপই হইয়াছে। যে যেরূপ সঙ্গ করে তাহর সেইরূপ ফল মিলে। হেমলেখার ন্যায় স্ত্রী ছিল বলিয়াই উহার সঙ্গেতে সকলে মহৎফল পাইল। কিন্তু মহারাজ, আমার আরো কিছু শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে। কৃপা পূর্ব্বক বিস্তারিত ভাবে ইহা বলুন যে হেমলেখা নিজপতির বোধ কি কি উপায়ে করিয়াছিলেন।"

পরশুরামের এই প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীগুরু কহিতে লাগিলেনঃ— "পরশুরাম শুন ; আমি তোমাকে সে সমস্ত পরমপাবন কথা বলিতেছি। রাজপুত্র আপনার স্ত্রীর নিকট শুনিল যে বিষয় ভোগকে যখন প্রিয় বলা যায় না তখন উহার বিষয়ে নিরসতা বোধ হইল ; অর্থাৎ বিষয়ে যে সুখ নাই তাহা বুঝিলেন আর উনি বিষয়ে উদাস হইয়া সদাই ক্ষীণ

মন অর্থাৎ বিষন্ন হইয়া রহিলেন। বহুদিন পরে বিষয় বাসনার সংস্কার হইবার জন্য, না সে বিষয় বাসনাকে ত্যাগ করিতে পারে, আর না সে সহসা উহা উপভোগ করিবার ও ইচ্ছা করে। স্ত্রী একবার এইরূপ নিরোত্তর করিয়া দিয়াছিল অতএব সে তাহাকে আবার বলিতে লজ্জিত হইল। এই চিন্তায় তাহার বহুসময় অতিবাহিত হইল। বিষয় বিকার হইলে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেই তাহার হেমলেখার কথা স্মরণ হয় আর বাসনাবশ হইয়া বিষয় সেবন করিয়া শেষে সে অনুতপ্ত হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সংস্কারের প্রবলতার জন্য উনি বিষয়ে আকৃষ্ট হইতেন কিন্তু বিষয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই পত্নীর কথামত বিষয়দোষ উহার মনে উদয় হইত আর তিনি প্রতিক্ষণ উদাস হইয়া দুঃখভাগী হইতেন। এইরকমে উহার চিত্ত স্ত্রীর কথামত চলিতে না পারার জন্য এবং বাসনাবশে চলিবার জন্য উভয়তঃই দুঃখ ভোগ করিতেন। উহার খাওয়া-পরা, বসনভূষণ, সুন্দরীস্ত্রী, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাহন, প্রাণপ্রিয় মিত্রাদি কোন পদার্থেই সুখ পাইত না। সে ঐরূপ ক্রমান্বয়ে খেদ করিতে থাকে যেমন কাহারও সর্ব্ব সম্পত্তি নষ্ট হইলে করে সেইরূপ। কারণ বাসনার প্রবলতার দরুণ বিষয় ত্যাগ করিতে পারে না আর বিষয় দোষ জ্ঞান হইবার জন্য ভোগ ও করিতে পারে না। এইরূপ শোকের কারণ রাজপুত্রের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে দেখিয়া হেমলেখা বলিতে লাগিলঃ— "প্রাণ নাথ, এখন আপনাকে আগেকার মত আনন্দিত কেন দেখিতেছি না? সদাই দুঃখে রহিয়াছেন কেন? আপনার এইরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল? আপনার কিছু হয় নাই ত? বৃদ্ধ লোকের বচন আছে যে বিষয়

—সুখের উপভোগে রোগের ভয় আছে। বাত পীত্ত কফের ত্রিদোষে উৎপন্ন এই শরীরে ঐ দোষের বিষমতার জন্য অনেক প্রকারের বহু-রোগ বাস করে। এইরূপ অব্যক্ত দশায় এই দোষের বিষমতা নষ্ট করা যায় না। দোষ বহুকারণে বিষম হইয়া যায়। অন্নতে, বস্ত্রতে, কথা কহিলে, কিছু দেখিলে, কিছু বস্তুর স্পর্শে, কাল বিশেষে, স্থল বিশেষে আর কিছু বিশিষ্ট প্রকার উদ্যোগ ধন্ধাতে ও শরীরে এই দোষের বিষমতা উৎপন্ন হইয়া যায়। এই কারণে ইহা একেবারেই জানা যায় না আর বাহির লক্ষণে চিকিৎসা করিতে হয়। যদি দোষের বিষমতা না হইত চিকিৎসা করিবার আবশ্যকতাই হইত না।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র হেমলেখাকে কহিতে লাগিল—"প্রিয়ে, আমি আমার দুঃখের কারণ বলিতেছি। ইহা তোমার উপদেশেরই পরিণাম। পূর্ব্বে আমার যে সকলকে সুখদায়ক বলিয়া বোধ হইত, সেই বোধ এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আমার কিছুই সুখদায়ক বলিয়া মনে হয় না। রাজা আমার সেবার জন্য বহু পদার্থ দিয়াছেন কিন্তু উহা যেমন বদ্ধ পুরুষকে সুখী করিতে পারে না সেইরূপেই ও সেইকারণে আমি ঐসব বস্তু হইতে সুখ পাইতেছি না। আমি যে বিষয় সুখ ভোগ করি উহা দায়ে-পড়া মনুষ্যের মত বাসনাবশে ভোগকরি, উৎসাহে নহে। প্রিয়ে, ঐইজন্য আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কি করিলে আমার সুখ হইবে তাহা বল।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলে হেমলেখা আপনমনে ভাবিতে লাগিল—সত্য সত্যই ইহার আমার কথা শুনিবার পর বৈরাগ্য উৎপন্ন

হইয়াছে। আর যখন ইহার অবস্থা ঐরূপ হইয়াছে তখন ইহাও বলা যায় যে ইহাতে মোক্ষ প্রাপ্তির বীজ অবশ্য আছে। যাহার মোক্ষ পাওয়া সম্ভব নহে তাহার এই কথায় তিলমাত্র কখনও বদ্‌লাইত না। বহু সময় পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিবার পর যাঁহার উপর আত্মদেব প্রসন্ন হইয়াছেন তাঁহারই এই অবস্থা হয়। ঐরূপ বিচার করিয়া ঐ বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী স্ত্রী নিজপতির বোধ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি নিজ বিদ্যার পরিচয় না দিয়া উহাকে অন্য প্রকারে বলিতে লাগিলেন :—

রাজন, পূর্ব্বকালের আমার এক কথা শুনুন! পূর্ব্বকালে আমার মাতা (শুদ্ধস্বরূপচিতি) খেলিবার জন্য (অর্থাৎ সুখ দুঃখ জীবের ভোগ করিবার জন্য) আমার (জীবস্বরূপচিতির) এক সখী (বুদ্ধি) দিয়াছিলেন। উহা স্বভাবেই শুদ্ধ ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই শুদ্ধবুদ্ধি এক অসৎ স্বভাব স্ত্রীর সঙ্গ লাভ করিয়াছিল (অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধি অবিদ্যার সঙ্গতে পড়িয়াছিল) এই স্ত্রী এরূপ সামর্থবতী ছিল যে যাহা একেবারে নাই এরূপ আশ্চর্য্য-জনক সৃষ্টি উৎপন্ন করিয়া দেখাইতে পারে। উহা (অবিদ্যা) আমার (জীবরূপ চিতির) সখীর (বুদ্ধির) সহিত মিত্রতা করিল। এই কথার জ্ঞান আমার মাতার (শুদ্ধচিতির) হয় নাই। ঐ স্ত্রীর (অবিদ্যার) সব আচরণ অসভ্যতাপূর্ণ হইয়া থাকিত। কিন্তু আমার সখীর (বুদ্ধির) সহিত উহার (অবিদ্যার) স্নেহ ছিল। আমার সখী আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল। অতএব আমি সহজেই উহার (অবিদ্যার) ফাঁদে ফাঁসিয়া উহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে

লাগি। (অর্থাৎ জীবচিতি বুদ্ধির সঙ্গে অবিদ্যার বশ হইয়া গেল।) আমি আমার সখীকে ক্ষণকালও ছাড়িয়া কোথায় থাকি না (কারণ বুদ্ধির উপর শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীব; সুতরাং জীব বুদ্ধিকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবে?) সে (বুদ্ধি) আপন নির্ম্মল স্বভাবে আমাকে (জীবচিতিকে) সম্পূর্ণ আপনার বশ করিয়া লইয়াছে। নিরন্তর উহার (বুদ্ধির) সহিত থাকিবার জন্য আমার স্বভাব ও উহার স্বভাবে মিলিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ আমি বলিতে বুদ্ধিকেই বুঝিতেছি)। অনন্তর সেই বিচিত্র ও দুষ্ট স্বভাব নটী স্ত্রী (অবিদ্যা) মিথ্যা লালসা দেখাইয়া আমার সখীকে (বুদ্ধিকে) আপন (অবিদ্যার) পুত্রের (মোহের) অধীন করিয়া দিল (অর্থাৎ অবিদ্যার পুত্র মোহ, অবিদ্যার কারণ বুদ্ধি মোহের অধীন হইয়া গেল।) ঐ পুত্র অত্যন্ত মূর্খ ছিল। মদ্যপানে (বিষয়াসক্তি রূপ মদ্যপানে) উহার আঁখি সদাই লাল থাকিত (অর্থাৎ উহা সদাই বিষয়াসক্তিতে অনুরঞ্জিত বা অনুরক্ত থাকিত)। আমার সম্মুখে (জীবচিতির সম্মুখে) সে (মোহ) আমার সখীকে (বুদ্ধিকে) বলাৎকার করিয়া ভোগ করিত (অর্থাৎ অনিচ্ছুক বুদ্ধিকে জোর করিয়া মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিত)। এই নিত্য পীড়ার জন্য সে সদাই ত্রস্ত হইয়া থাকিত। কিন্তু সে আমায় ত্যাগ করে নাই। এই জন্য সে একদিন আমায়ও স্পর্শ করিয়াছিল (অর্থাৎ বুদ্ধির সংস্পর্শে জীবচিতিরও মোহস্পর্শ হইয়াছে এইরূপ বোধ হইয়াছিল।) কিছুদিন পরে ঐ দুজনার (বুদ্ধির ও মোহের) এক পুত্র হইল (অর্থাৎ জীবের বুদ্ধি মোহবশ হইয়া গেল আর মন উৎপন্ন হইল। মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক।

শুদ্ধ বুদ্ধিতে সঙ্কল্পবিকল্পের বৃত্তি হয় না। উহা মোহের সঙ্গতে উৎপন্ন হয়।) উহার আকার ঠিক উহার বাপের মত (অর্থাৎ মোহ আর মনের স্বরূপ দুইজনেরই একরূপ।) তরুণ অবস্থাতেই সে অত্যন্ত চঞ্চল ছিল (তরুণ অর্থাৎ ব্যবহার কর্ত্তা মনই সব ব্যবহার করে এইজন্য সে চঞ্চল ছিল।) বাপের (মোহের) মূঢ়তা আর ঠাকুমার (অবিদ্যার) নিকট অনেক বিচিত্র বস্তু উৎপন্ন করিবার সামর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ কারণ অবিদ্যাই জগত উৎপন্ন করে। এই জগত ঐরূপই হয় যেমন মনের মনরাজ্য আর স্বপ্ন দেখা)। আর অস্থির নামক পুত্রকে (মনকে) উহার মূঢ় নামক পিতা (মোহ) আর শূন্য নামক ঠাকুমা (সেই অসৎস্বভাব স্ত্রী—অবিদ্যার—কোন সত্তা নাই অতএব উহাকে শূন্য বলা হয়) ভাল করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রবীণ করিয়া দিয়াছিল। ফলতঃ সে অত্যন্ত অপ্রতিবদ্ধ ও জোরদার গতিপ্রাপ্ত হইল অর্থাৎ মন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চঞ্চলই হইল। প্রাণনাথ, সারাংশ এই যে যদ্যাপি আমার ঐ সখী (বুদ্ধি) জন্ম হইতে শুদ্ধস্বভাববতা ও সতী ছিল তথাপি অসতী স্ত্রীর (অবিদ্যার সঙ্গতে অত্যন্ত মলীন অবস্থা প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধি অবিদ্যার বশেপূর্ণ মূঢ় হইয়া গেল।) ক্রমে ক্রমে উহার পতিও পুত্রের (মোহ ও মনের) উপর প্রেম অধিক হইতে লাগিল, আর আমার (জীবের) উপর প্রেম কমিতে লাগিল (অর্থাৎ যখন বুদ্ধি জীবচৈতন্যকে বিস্মরণ হইত তখন উহার মন ও মোহ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতেই পাইত না)। কিন্তু আমি (জীবচিতি স্বভাবতঃ সরল ছিলাম অতএব উহার সঙ্গ ছাড়িয়া দিবার জন্য

আমি একলাই প্রস্তুত হই নাই। আমি সদাই উহার সহিত থাকিতাম আর উহার রুক্ষ ব্যবহার দেখিতে থাকিতাম। একদিন উহার মূঢ় নামক পতি আমার (জীবচিত্তির) প্রতি বলাৎকার (মোহাচ্ছন্ন) করিবার জন্য প্রস্তুত হইল কিন্তু আমি স্বভাবতঃ শুদ্ধ ছিলাম অতএব উহার (মোহের) বশ একতিলও হই নাই। এরূপ হইলেও সংসারে আমার অপকীর্ত্তি (কুৎসা) রটিয়াছে যে মূঢ় আমায় যথেচ্ছা উপভোগ করিতেছে। কিছুদিন পরে আমার সখী (বুদ্ধি) আপন পতির (মোহের) সঙ্গ সদাই করিতে লাগিল। সে তাহার পুত্রকে (মনকে) আমার নিকট রাখিয়া দিল। ঐ অস্থির নামক বালক (মন) আমার নিকট আসিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যুবা অবস্থায় আপনার ঠাকুমা (অবিদ্যার) অনুমতিতে সে (মন) এক কন্যাকে বিবাহ করিল (অর্থাৎ কল্পনা মনের সহায়ক হইল।) উহার [মনের] স্ত্রীর নাম চপলা। আপনার পতির রুচি অনুসারে সে (চপলা) প্রতিক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন মনোহর রূপ ধারণ করিতেছিল। অস্থির (মন) ও স্বয়ং একক্ষণে ক্রোড়যোজন যায় এবং ঐরূপে ফিরিয়া আসে। উহার (মনের) বিশ্রাম কখনও মিলে না। অস্থির যেখানে সেখানে যাইবার অভিলাষ করিত সেইখানে সেইখানেই যাইত আর উহার রুচির অনুকূল রূপ ধরিয়া চপলা (কল্পনা) আপনার পতিকে (মনকে) প্রসন্ন করিত। এইরূপে চপলার (কল্পনার) এক সঙ্গে পঞ্চপুত্র হইল (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, উহা সব মনেরই বিস্তার।) ঐ পুত্রেরা মাতৃপিতৃ পরায়ণ ছিল অর্থাৎ ইহাদের যোগে (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে কল্পনা বাড়িয়া যায় আর মনের পুষ্টি হয়।)

আমায় সখী (বুদ্ধি) এই পাঁচটাকে আমারই (জীবেরই) অধীন করিয়াছিল। সখী প্রেমে আমি উহাদের ভালভাবে পালন পোষন করি। ঐ পাঁচটী বালক (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়) নিজ নিজ বিভিন্ন আবাস প্রস্তুত করে (অর্থাৎ পঞ্চইন্দ্রিয় শরীরের পাঁচ অবয়বে আপন আপন স্থান নিয়ত অর্থাৎ চিহ্নিত করিল) পুনরায় উহারা (ইন্দ্রিয়েরা) আপনার মাতার (কল্পনার) সহয়তায় পুষ্ট হইয়া আপন পিতা অস্থিরকে (মনকে) বশ করিয়া লইল (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মনকে আপনার বশ করিল)। সে (মন) যেখানে যায় প্রতিক্ষণ উহাদিগকে (ইন্দ্রিয়-দিগকে) সঙ্গে রাখে। একবার অস্থির (মন) আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের (শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের) নিকট গিয়াছিল। সে তাহাকে অনেক মধুর স্বর শুনায়। ভাল গান বাজনাও সে শুনে। সে বেদ ও ঋচা শুনে। আপনার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উহাকে কিছু অন্য শাস্ত্র, ইতিহাস, গাধার ঝঙ্কার, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের পঞ্চম-সুর গানাদি বহু মনোহর ধ্বনি শুনায় সে আপনার পুত্রের শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের) প্রতি প্রসন্ন হইয়া উহার কথানুসারে চলিতে লাগিল। পিতাকে বশ করিয়া পুত্র কিছু অন্য খেলা খেলিল। অরুচিকর, কর্ণকটু ও ভয়ঙ্কর পব্দ শুনাইল। সিংহের গর্জ্জন, মেঘের গড় গড় বিজয় ঘণ্টার ঘোষাদি ভয়ানক শব্দ শুনাইল। এইসব শুনিয়া অস্থির চকিত হইয়া গেল! যখন সে একদিকে যায় তখন সে দেখে কেহ ক্রন্দন করিতেছে, কেহ বিলাপ করিতেছে আর কেহ দুঃখ করিতেছে। একবার দ্বিতীয় পুত্র (ত্বাচ্ ইন্দ্রিয়) পিতাকে তাহার নিকট লইয়া গিয়াছিল। সে তাহাকে (মনকে) মৃদুস্পর্শ

ও কোমল আসন দিল। উহার (মনের) কোমল ও কড়া শীতল ও উষ্ণ ঐরূপ কতরকমের বস্ত্র ও শয্যা মিলিল। উহার (মনের) হিতকারকের সেবনে আনন্দ ও অহিতকারকের সেবনে দুঃখ হয়। পুনরায় সে তাহার তৃতীয় পুত্রের (চক্ষুর) নিকট গেল। সেখানে সে অনেক প্রকার আকার, ও বর্ণ দেখে। লাল, কাল, হলদে ইত্যাদি অনেক রং আর স্থূল, কৃশ, ছোট, বড়, লম্বা, চোওড়া, সুন্দর, ভয়কারক, বীভৎস, তেজময় উগ্র, কাল আদি অনেক আকার দেখায়। যখন সে (মন) এই দৃশ্য দেখিতেছিল তখন তাহার চতুর্থ পুত্র (রসনেন্দ্রিয়) আপনার বিচিত্র স্থানে লইয়া গেল। ঐ পুত্রের নিকট উহার (মনের) অনেক ফলফুল মিলিল! সে (মন) অমৃতের ন্যায় মিষ্ট, সুস্বাদু, অন্নাদি, লেহ্য, চোষ্য, ভক্ষ্য, পেয় অনেক পদার্থ সেবন করিল। তাহার পর উহার (মনের) পঞ্চম পুত্রের (ঘ্রানেন্দিয়ের) নিকট গেল। তথায় সুগন্ধিত ফলফুল পাইল। সে সেইখানে বিভিন্ন ঔষধি ও বনস্পতির গন্ধের অনুভব করিল। কেহ সুগন্ধ কেহ দুর্গন্ধ। কেহ কোমল কেহ উগ্র গন্ধযুক্ত। কেহ লোভনীয়, কেহ উত্তেজনীয়, কেহ মুর্চ্ছিত করিবার গন্ধ দিল। এইরূপে সে (মন) নিত্য একের ঘর হইতে অন্য পুত্রের ঘরে যাইতে লাগিল। কখনও সে (মন) অনুকুল ইষ্ট বিষয়ে তন্ময় হইয়া যায় আর কখনও প্রতিকুল অনিষ্ট বিষয়ে অভিলাষ করিয়া দুঃখ করিতে লাগে। সে এইরূপ নিত্য ক্রমে যাতায়াত করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। সব পুত্র পিতৃবৎসল ছিল অতএব উহারা সুখের কোন বিষয়কে পিতার (মনের) সঙ্গ

না লইয়া স্পর্শ করিত না। কিন্তু পুত্রের (ইন্দ্রিয়ের) নিকটে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সুখে অস্থির [মন] তৃপ্ত হইত না। আর সে [মন] অনেক বিষয়কে চুরি করিয়া ঘরে আনিত ও আপনার স্ত্রীর [কল্পনার] সহিত একান্তে ঐ সব সেবা করিত। অর্থাৎ স্বপ্নাদিক মানষিক বিষয় ভোগ করিত। সেখানে [স্বপ্নকালে] কোন পুত্র [ইন্দ্রিয়] থাকিত না।

এইরূপ কিছুদিন অতীত হইলে ঘটনাক্রমে তথায় চপলার ভগ্নী উপস্থিত হইল। উহার নাম মহাশনা (আশা) ছিল। সে বহুভোজী ছিল (অর্থাৎ বিষয় ভোগ বাড়িলে চিত্তে আশা উৎপন্ন হয়।] উহা কল্পনার—(চপলার) বোন। উহা (আশা) অস্থিরকে (মনকে) দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল। উহার (আশার) সহিত অস্থিরের (মনের) বিবাহ হইল (অর্থাৎ আশা মনের সহায়ক হইল)। শীঘ্রই উহার প্রতি অস্থিরের-ও প্রেম বাড়িতে লাগিল। উহার প্রতি অতিশয় আসক্ত বশতঃ উহাকে সুখী করিবার জন্য অস্থির নিত্যনূতন ও বিভিন্ন বিষয় সম্পাদনের জন্য সদা উদ্যোগ করিতে লাগিল। সে (মন) অনেক কিছু যোগাড় করিয়া আনিত কিন্তু তাহার অতিলোভী স্ত্রী [আশা] সে সব গোগ্রাসে গিলিত আবার তখনই পুনরায় ক্ষুধিতা হইয়া পতিকে [মনকে] কাজে জুতিতে সদাই প্রস্তুত থাকিত। সেও [মনও] সেই বিষয়রূপ বস্তুকে কোথাও না কোথাও হইতে আনিবার জন্য সদাই প্রস্তুত থাকিত। সে [মন] ও উহার পাঁচপুত্র [ইন্দ্রিয়] যাহা আনিত তাহা সে [আশা] ভক্ষণ করিত। এবং পরক্ষণেই পুনরায় ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া পতি [মন] ও পুত্রগণকে [ইন্দ্রিয়-

গণকে] বস্তু সংগ্রহের জন্য শীঘ্রই পাঠাইত। কিছুদিন পরে ঐ স্ত্রীর [আশার] দুই পুত্র জন্মিল। একের নাম জ্বালামুখ আর অন্যের নাম নিন্দ্যবৃত্ত অর্থাৎ একটী কাম ও অপরটী লোভ। উহারা [কাম ও লোভ] আপনার মাতার আশার বড় প্রিয় ছিল। ফলতঃ কখনও কখনও প্রেমের প্রবলতার জন্য মহাশনাকে আলিঙ্গন করিতে করিতে এই জ্বালামুখির [কামের] জ্বালায় সেই অস্থির (মন) দগ্ধ হইয়া মুৰ্চ্ছিত হইয়া যাইত। যদি নিন্দ্যবৃত্তে (লোভে) কাম পড়িত (মিলিত) তবে সারা সংসারে অস্থিরের (মনের) খুব অপমান হইত আর সে মরা হইতে মরা হইত অর্থাৎ অধিক জড় ভাবাপন্ন হইত। যখন এরকমে অস্থির (মন) অত্যন্ত দুঃখী হইতে লাগিল তখন আপন পুত্রের প্রতি অর্থাৎ অস্থিরের (মনের) প্রতি প্রেম হইবার কারণ আমার সখীর [বুদ্ধির] বড় দুঃখ হইল, এইখানে ভাবার্থ এই, মনবুদ্ধির একতা হইবার জন্য মনের সহিত বুদ্ধিও দুঃখী হইয়া গেল। উহার নাতির মধ্যে এক নাতি—নিন্দ্যবৃত্ত [লোভ] উহার সর্ব্বত্র নিন্দা করিল। আর অন্য নাতি জ্বালামুখী [কামের] আলিঙ্গনে উহাকে [বুদ্ধিকে] মরার মত জড়ভাবাপন্ন করিয়া দিল। নিত্য সহবাসে থাকার জন্য আমিও (জীবও) বর্ষ (এই জীবন) পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করি। মহাশনাকে (আশাকে) বিবাহ করিবার পর অস্থির (মন) একেবারে পরবশ হইয়া গেল। কিছু সময় পরে কর্ম্ম বশে অস্থিরের মনে এক নগর মিলল অর্থাৎ শরীর পাইল। উহার দশ দরজা। তথায় সে (মন) মহাশনাকে লইয়া আপনার মাতা (বুদ্ধি) আর পাঁচ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়) ও দুই পুত্রের (কাম ও লোভের) সহিত বাস করিতে লাগিল। সে (মন)

খুব সুখ পাইবার ইচ্ছা করিত কিন্তু উহার (মনের) দিবারাত্রি দুঃখ ভোগ হইত। যদি একছেলে শরীরকে জ্বালায় তখন অন্যে চরিত্রকে মাটিতে মিলাইত। উহার স্ত্রী মহাশনা (আশা) উহাকে (মনকে) সন্তাপিত করিত। ইহা ভিন্ন চপলার (কল্পনার) পাঁচ পুত্রের (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) নিকট উহার (মনের) নিত্যই আনা গোনা করিতে হইত। এই সব কারণে উহার (মনের) কষ্টই হইত কখনও সুখ পাইত না। আপনার পুত্রের (মনের) দুঃখ দেখিয়া আমার সখী (বুদ্ধি) ব্যাকুলা হইত। শূণ্যাক্ষ নামা শাশুড়ী (অবিদ্যা) আর আশার মূঢ় নামক শ্বশুর (মোহ) উহার (আশার) দুইপুত্র জ্বালামুখ (কাম) আর নিন্দ্যবৃত্ত (লোভ)—ভালভাবে লালন পোষন করিয়াছে। মহাশনা (আশা) তাহার সতীনের (কল্পনার) সহিত অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। উহারা (আশা ও কল্পনা) উভয়েই অস্থিরকে (মনকে) পুরাপুরি বশ করিয়া লইয়াছে। আমি (জীবচিতি) ও সখীর (বুদ্ধির) প্রেমে উহার (বুদ্ধির) সহিত থাকিতাম। কিন্তু সখীর দুঃখে আমি মৃতের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলাম।

হেমলেখা এইরূপ আরো কহিতে লাগিল :—রাজকুমার, শুনুন। আমি (জীবস্বরূপচিতি) যদি উহার (বুদ্ধির) সহিত না থাকিতাম ত কোন ঘটনা ঘটিত না। আমি ঐসবকে রক্ষা করি। সখীর (বুদ্ধির) সঙ্গতে আমার অনেক পরিণাম হওয়ার মত দেখায় :—আমি শূণ্যাক্ষের জন্য শূণ্য, মূঢ়ের সহিত মূঢ়, অস্থিরের যোগে অস্থির, চপলার (কল্পনার) সহবাসে চঞ্চল, জ্বালামুখীর (কামের) জন্য জ্বালারূপী আর নিন্দ্যবৃত্তের (লোভের) জন্য নিন্দ্যবৃত্ত (লোভী) হইয়া গিয়াছি। আমি যদি সখীকে (বুদ্ধিকে) পরিত্যাগ করিতাম তাহা হইলে উহা

(বুদ্ধি) তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইত। কিন্তু তাহার সহিত থাকিবার জন্য লোকে আমাকে ব্যভীচারিনী কহিতে লাগিল। কেবল আমার সম্বন্ধীর (আত্মান্বেসীর) আমি যে নির্ম্মল এই জ্ঞান ছিল। আমার মাতা (শুদ্ধচিতি) মহাসতী, অত্যন্ত শুদ্ধ, নির্দ্দোষ, আকাশ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ আর পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম। সে (মাতা) বুঝিত সব কিছু আছে কিন্তু উহার (শুদ্ধচিতির) কিছু অনুভবই হইত না; সবই করে কিন্তু উহার (শুদ্ধচিতির) কিছু করা হইত না "কারণ তিনি নিরিন্দ্রিয়" অর্থাৎ ব্যবহারিক কর্ত্তা হইয়াও পারমার্থিক অকর্ত্তা; উঁহা সকলের আধার হইয়াও কাহারও আধার নহেন; সকলের আশ্রয় হইয়াও উঁহার আশ্রিত কেহই নাই। উঁনি সব রূপই করেন অর্থাৎ সব রূপের অবভাসক অথচ উহার কোন রূপ নাই। উঁনি সকলের সহিত মিলিয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক অথচ কাহার সঙ্গ করিতেন না (অর্থাৎ অসঙ্গ)। উঁহার সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইত কিন্তু কাহারো বুদ্ধিগম্য হইত না (অর্থাৎ আত্মা বৃত্তি ব্যাপ্ত কিন্তু ফলব্যাপ্ত নহে)। উহা অতিশয় আনন্দপূর্ণ অথচ আনন্দশূণ্য। আর উহার মা বাপ কেহ ছিল না অর্থাৎ উহার কোন কারণ ছিল না (অর্থাৎ উনি অকারণ)। আমার (জীবচিতি) মত উহারও অসংখ্য মেয়ে ছিল। সমুদ্রের অগণিত ঢেউএর ন্যায় আমার অনেক বোন ছিল। প্রাণনাথ, উহাদের আচরণ আমারই মত। আমি বড় মান্ত্রিক (মন্ত্রজ্ঞ) অতএব এত সখীদের সহিত থাকিয়াও আপনার মাতার (শুদ্ধচিতির) ন্যায় স্বরূপতঃ শুদ্ধ থাকি।

সেই নগরে (শরীরে) আমার সখীর (বুদ্ধির) পুত্র অস্থির (মন)

অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিজ মাতার (বুদ্ধির) কোলে শান্তিপূর্ব্বক ঘুমাইতে লাগিল। উহা (মন) শুইলে উহার সব পুত্র ও (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কাম আর লোভও) ঘুমাইয়া পড়িত। সেই সময় (নিদ্রিত অবস্থায়) অস্থিরের [মনের] প্রচার [প্রাণ] নামক এক মিত্র সেই নগর [স্থূল শরীর] রক্ষা করিত। অর্থাৎ মন নিদ্রায় বিলীন হইলেও ঐ বায়ু [প্রাণ] বহিতে থাকে। উহার [প্রাণের] ব্যবহার পূর্ব্বাঙ্গের দুই দরজায় [অর্থাৎ নাকের দুই ছিদ্রে] হয়। যখন অস্থিরের সহিত উহার মাতাও [মনের সহিত বুদ্ধিও) নিদ্রিত হইত তখন উহার [বুদ্ধির] অসংস্বভাব বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী [অবিদ্যা] ঐসবের [মন বুদ্ধির] উপর আচ্ছাদন করিয়া [নিদ্রিত সময় মন ও বুদ্ধির উপর অবিদ্যার আচ্ছাদন থাকে] উহাদের [মন বুদ্ধিকে] ও উহাদের পুত্র-[পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, কাম ও লোভকে] রক্ষা করিত। ইহারা নিদ্রিত হইলে সে [জীবচিতি] আপনার মাতার নিকট যায় [অর্থাৎ নিদ্রায় জীবের স্থিতি শুদ্ধ স্বরূপই হয়] ও আনন্দে থাকে। উহারা সব [মন বুদ্ধি আদি সব জাগিলে] পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় আমি [জীবচিতি] উহাদের [মন বুদ্ধির] অনুসরণ করি। অস্থিরের [মনের] প্রচার [প্রাণ] নামক মিত্র অস্থিরের সহিত সবকে নিত্য পোষণ করে [অর্থাৎ প্রাণ বায়ু দ্বারা সব ক্রীড়া হয়]। একলা হইলেও [প্রাণ এক হইলেও] সে [পাঁচ দশ প্রকার রূপ হইয়া সব নগরে [শরীরে] ও নগরবাসীদের ব্যাপিয়া থাকে আর সকলের সহিত মিলিয়া চলে। মালাতে গাঁথা মণি যেমন সুতা বিনা পৃথক পৃথক হইয়া যায় সেইরূপ প্রচারের সহিত [প্রাণের সঙ্গ] না থাকিলে এই সব নষ্ট হইয়া যাইবে। উহা

[প্রাণ আমাদের সকল লোকের সঙ্গ করি৩ আর সে সেই নগরে [দেহে] সূত্রধারত্ব আমাকেই [জীবকেই] দিয়াছে। এক নগর (দেহ) জীর্ণ হইলে প্রচার [প্রাণ] এই সবকে শীঘ্রই অন্য নগরে [শরীরে] লইয়া যায় (অর্থাং বাসনা বশতঃ প্রাণ, মনকে ভিন্ন ভিন্ন যোনীতে পৌহুঁছাইয়া দেয়)। এই রকমে প্রচারের ভিন্নতাতে অস্থির অনন্ত ভিন্ন ভিন্ন আর অদ্ভূত দেশের রাজা হইয়াছে। দেখ, অস্থিরের [মনের] জন্ম, সতীর [বুদ্ধির] গর্ভে হইয়াছে, উহার মহাবল প্রচারের [প্রাণের] আশ্রয় মিলিয়াছে, প্রত্যক্ষ আমিই [জীবই] উহাকে [মনকে] বড় করিয়াছি; কিন্তু এইসব হইলেও উহার (মনের) ভাগ্যে দুঃখই লেখা। কারণ চপলা ও মহাশনার মত উহার (মনের) স্ত্রী, জ্বালমুখ (কাম) ও নিন্দ্যবৃত্তের [লোভের] মত পুত্র আর অন্য পাঁচ পুত্রের [পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) তত্ত্বাবধানে লাগিয়া থাকিত সেইজন্য উহার (মনের) মহাক্লেশ হওয়াই স্বাভাবিক। উহার সুখের লেশ-মাত্র মিলিল না। কখনও উহার পাঁচপুত্র উহাকে এদিক ওদিকে ঘুরায়, কখনও উহার স্ত্রী চপলা (কল্পনা উহাকে) জ্বালাতন করিত ও দুঃখ দিত, কখনও উহার (মনকে) মহাশনার (আশার) উদর ভরণের জন্য উদ্যোগ করিতে হইত। কখন জ্বালামুখীর (কামের) সহিত সাক্ষাং হইলে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত দগ্ধিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যাইত। সে কোন উপায়ই দেখিত না। কখনও নিন্দ্যবৃত্তে (লোভে) পড়িলে সংসারে উহার (মনের) বড় নিন্দা হইত আর সে মৃতের ন্যায় হইয়া যাইত। এইরূপে সে (মন) দুষ্টা স্ত্রী ও দুষ্ট পুত্রগণপ্রতি মোহবশে, দুষ্টকুলে জন্ম লইয়া অনেক পত্নী ও পুত্রের

সহিত উহাদের ইচ্ছার দাস হইয়া অস্থির [মন] ছোট বড় অনেক নগরে [অর্থাৎ অনেক যোনিতে] ভ্রমণ করে। কখন ও ভয়ঙ্কর জঙ্গলে, কখন ও হিংস্রপশুর প্রদেশে, কখনও অতিশয় উষ্ণ দেশে, কখনও শীত দেশে, কখনও অজ্ঞানপূর্ণ স্থানে কখনও দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে আর কখন ঘোর অন্ধকারে—এইরূপে সে (মন) অনেক দেশ (যোনী) বেড়ায়। বিনা কারণে স্বভাবতঃ সতী সখী [শুদ্ধ বুদ্ধি] এই মূর্খের সঙ্গতে দুঃখিতা হইয়া গেল। প্রাণনাথ, উহার [মনের] সঙ্গতে আমিও [জীবও] মোহিত হইয়া এতগুলি কুটুম্বের পালন করিতেছি। কিন্তু কখনও কি কাহারও কুসঙ্গ হইতে সুখ মিলিয়াছে ?

এইরূপে বহুসময় অতীত হইল। একবার একলা পাইয়া আমার সখী (বুদ্ধি) অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আমার নিকট আসিল অর্থাৎ স্বরূপের ভাণ হইল। আমার নিকট হইতে উপায় (বৈরাগ্য) জানিয়া সে (বুদ্ধি) এক বুদ্ধিমান পতির সহিত বিবাহ করিল অর্থাৎ বিবেক প্রাপ্ত হইল। অনন্তর উহা (বুদ্ধি) অস্থিরকে (মনকে) জয় করিল অর্থাৎ মনকে নিজের বুদ্ধির অধীন করিল। উহার (মনের) পুত্রদিগের মধ্যে কাহাকে বধ করিয়া আর অন্যকে বাধিয়া ফেলিল অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিগৃহীত করিল। আর অন্তে আমার (জীবের) সাহায্যে আমার মাতার (শুদ্ধাচিতির) অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার মাতার গলায় লাগিয়া গেল অর্থাৎ শুদ্ধাচিৎস্বরূপে বুদ্ধি লীন হইয়া গেল। সেইজন্য (চিৎস্বরূপে লীন হইবার জন্য) আমার সেই নির্ম্মলস্বভাবা সখী সহজ ও স্বাভাবিক আনন্দে মগ্ন রহিল। প্রিয়, এইজন্য আপনিও আপনার সখার (বুদ্ধির)

দুষ্ট পুত্রকে বশ করিয়া (মনকে বশ করিয়া) মাতার সাক্ষাৎ করুন অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যের সাক্ষাৎ করুন আর নিত্য সুখপ্রাপ্ত করিয়া লউন। প্রাণনাথ, আমি আপনাকে যে সুখস্থানের বর্ণনা করিলাম, উহা আমি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি।

ষষ্ঠ প্রকরণ

বিশ্বাসের আবশ্যকতা

আপ্তেষ্বশ্রদ্ধিনং মূঢ়ং জহাতি শ্রীঃ সুখং যশঃ ॥
স ভবেৎসর্ব্বতো হীনো যঃ শ্রদ্ধারহিত নরঃ ॥ ২৪॥

আপনার স্ত্রীর কথা শুনিয়া রাজপুত্র হেমচূড় বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাসিতে লাগিল। সে একেবারেই বুঝিল না যে হেমলেখা জ্ঞানী স্ত্রী। সে কহিতে লাগিল :—"প্রিয়ে, তোমার কথা অসম্ভব বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া আমি ইহাও জানিতেছি যে তোমার কথার কোন আধার (মূল) নাই। বিদ্যাধরীর গর্ভে তোমার জন্ম, জঙ্গলে এক ঋষি তোমায় লালন পোষন করিয়া মানুষ করিয়াছে। এখন তুমি তরুণ হইয়াছ, তুমি এখনও পুরাপুরি যুবতীও হও নাই

আর হাজার বৎসরের বৃদ্ধার ন্যায় বাক্য বলিতেছ। তোমার কথা ঠিক ভূতগ্রস্থ মনুষ্যের মত কোথাও কিছুরমিল নাই। আমি তোমার বাক্যকে কি সত্য মনে করিব? ভাল বল,—তোমার সখী কোথায়? সেই নগর কোন প্রদেশে আছে? ইহা ছাড়িয়া দিলেও, কিছুও কোথাও না হইলেও আমাকে কেবল ইহাই বলিয়া দাও যে আমার সখী কোথায়? কারণ, আমার মাতা আমায় কোন সখী দেন নাই। যদি আবশ্যক হয় ত আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা কর—উনি অন্তঃপুরে আছেন। ইনি ভিন্ন আমার পিতার আর অন্য কোন স্ত্রী নাই। অতএব বল সেই সখী ও তাহার পুত্র কোথায়? প্রিয়ে, তোমার কথা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অঘটিত বলিয়া বুঝিতেছি। নাটকে কোন বিদূষক কহিতে থাকে যে কোনবন্ধ্যা স্ত্রীর এক পুত্র ছিল। সে এক সময় এক রথের প্রতিবিম্বের উপর বসিল, ঝিনুককে রূপা মনে করিয়া উহা হইতে উহার গহনা নির্ম্মাণ করিয়া পরিল ও পুনরায় মনুষ্যের শিং এর অস্ত্র লইয়া গগনরূপী জঙ্গলে যুদ্ধ করে। তথায় ভবিষ্যকালের রাজাকে বধ করিয়া বর্ষাদৃষ্ট সহরের ন্যায় সহর জিতিয়া লয়, এখন সে মরুভূমির জলে স্বপ্নের স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। প্রিয়ে, তোমার সমস্ত পূর্ব্বোক্ত কথার মত সম্পূর্ণ অসঙ্গত।”

এই শুনিয়া সেই চতুরা স্ত্রী পুনরায় বলিতে লাগিল—“প্রাণনাথ, আমি তোমাকে যাহা কিছু কহিয়াছি সে সব অসঙ্গত কেমনে হইবে? আমার মত লোকের কথা কনখও নিরাধার হইতে পারে না। তপস্বীর কুলে আর সত্যশীল স্ত্রীপুরুষে মিথ্যাবাণী হওয়া ঠিক সেইরূপই অসম্ভব যেমন কুশ্চিৎ মনুষ্যের সুন্দর হওয়া। তাহা হইলে ইহা মিথ্যা কি

করিয়া হইতে পারে ? যে জিজ্ঞাসু পুরুষকে মনগড়' কথা বলে উহা অসত্য দোষের কারণ সুখদায়ক ছোট বড় কোন লোক মিলে না। রাজপুত্র, যাহার সত্যই তিমির রোগ হইয়াছে তাহার চক্ষুর ভিতরে অঞ্জন লাগাইবার প্রয়োজন—অঞ্জনের কেবল শব্দ-সমুহতেই শুদ্ধ দৃষ্টি মিলে না। এইজন্য সুজন লোক জিজ্ঞাসুকে অর্থ শূন্য শব্দ বলেন না। কিন্তু অজ্ঞানী হিতকারী ব্যক্ত বাক্যও মিথ্যার ন্যায় বোঝে। প্রাণনাথ, আমি আপনার প্রিয়া হই. আপনি জিজ্ঞাসু হন, অতএব আমি অসঙ্গত কথা কেমনে বলিতে পারি ? আমার কথা মিথ্যা বলিয়া মনে হইলে আপনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিদ্বারা বিচার করুন। ব্যবহারে দেখা যায় যে জ্ঞাতাপুরুষ একঅংশ পরীক্ষা করিয়া সব কথা বুঝিয়া লয়। আপনার, আমার এক পূর্ব্বের উদাহরণ জানা আছে ; তাহাকে আপনি ঠিক ঠিক দেখুন ! প্রথমে আপনার যে সব বিষয় সুখকর বলিয়া বিদিত হইতে ছিল কিন্তু আমার কহিবার পরে এখন কেহই আর সুখদায়ক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সেই সব বিষয় অন্য লোকের সুখদায়ক। এই অনুভবে আপনি আমার কথনের সত্যাসত্যতার, নির্ণয় করুন।

রাজন্, এখন আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব উহা সম্পূর্ণ সরল ও শুদ্ধভাবে শুনুন। সজ্জনের কথায় অবিশ্বাস হওয়া বড় ভারী শত্রু। শরণাগত বালককে শ্রদ্ধা নাম্নী প্রেমময়ী মাতা সব কুতর্ক হইতে সুরক্ষিত রাখেন, কুটুম্বের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে না যে সব মূর্খ তাহাদের লক্ষ্মী, কীর্ত্তি আর সুখ ও ত্যাগ করে। বিশ্বাস-হীন পুরুষ সব রকমে হীন ও দীন হয়। বিশ্বাস সারা সংসারের

আধার, এবং উহা সকলের জীবন। যদি বালক মাতার প্রতি বিশ্বাস না করে তবে সে কেমনে বাঁচিবে? যদি বিশ্বাসই না হয় তবে পুরুষের স্ত্রী হইতে কি সুখ মিলিবে? শিশুর প্রতি বিশ্বাস না হইলে বৃদ্ধের প্রেম কোথা হইতে হইবে? যদি বিশ্বাসই না হয় কিষাণ জমীকে কেন চসিবে? বিশ্বাস না হইলে মনুষ্যের ধান বোনাও একত্রিত করিয়া রাখা ও অসম্ভব হয়। নাথ ইহার পর আপনি কদাচিৎ বলিতে পারেন যে, "সমস্ত লোকপ্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ মিলনের ফলোপরি অবলম্বিত—কেবল বিশ্বাসের উপর নহে।" তবে ইহা বলুন প্রত্যক্ষ ফলের মিলনের ভাবনা ও কি করিয়া হইতে পারে? কারণ ফল ভবিষ্যৎকালে মিলে; তৎক্ষণাৎ মিলে না। অতএব এই মতের আশ্রয় লওয়া বিশ্বাসের আশ্রয় লওয়ারই সমান। এইজন্যই নিশ্চয় হয় যে বিশ্বাস না হইলে লোক ব্যবহার ও বন্ধ হয়। বিশ্বাস বিনা নিঃশ্বাস ও গ্রহণ হয় না। রাজকুমার! অতএব আপনি দৃঢ় বিশ্বাস সম্পাদন করিয়া আত্যান্তিক সুখ প্রাপ্ত হউন।

এই বলিয়া হেমলেখা শেষে কহিতে লাগিল:—"রাজকুমার, আপনি বলিবেন যে মিথ্যায় বিশ্বাস রাখা অনুচিত। কিন্তু এইরূপ বলিলে আপনার যে প্রবৃত্তি হইবে তাহা কি বিশ্বাসের জন্য নহে? তা না হইলে উহা (প্রবৃত্তি) কেমন করিয়া হয়?"

হেমলেখার প্রশ্ন শুনিয়া হেমচূড় কহিতে লাগিল:—"প্রিয়ে, যদি তুমি বলিতে চাও যে, সব কথায় বিশ্বাস রাখ তাহা হইলে আমার এক শঙ্কা হইতেছে। বিশ্বাস সজ্জনের প্রতি রাখা উচিত তবেই কল্যাণ হইবে। হিতেচ্ছুক পুরুষের সজ্জন ভিন্ন অন্য

স্থানে বিশ্বাস না রাখা উচিত। তাহা না হইলে বাহিরে সরলও ভিতরে বাঁকা ও তীক্ষ্ণ বড়সীতে বিশ্বাস করিয়া মৎস্য যেরূপে নষ্ট হয় সেইরূপ নষ্ট হইবার প্রসঙ্গ ঘটিবে। অতএব সজ্জনের প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত—দুর্জ্জনের প্রতি নহে। দুর্জ্জনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া নাশ হইয়াছে ও সজ্জনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া যাহার কল্যাণ হইয়াছে উহার উদাহরণ পূর্ব্বোক্তই প্রমাণ স্বরূপ হয়। সারাংশ ইহা হয় যে অনুভব করিয়া বিশ্বাস করা উচিত; ইহা ভিন্ন বিশ্বাস করা যোগ্য নহে। যদি ইহা সত্য হয় ত তোমার উক্ত বিধান সম্ভব কি প্রকার হইতে পারে?"

এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে হেমলেখা পুনরায় কহিতে লাগিলঃ—"শুনুন, বলিতেছি। আমি আপনাকে ইহা বলিব যে সেই বিধান কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে। আপনি যে এখানে নিশ্চয় করেন যে ইহা ভাল উহা মন্দ তাহাও কোন আধারে করেন? যদি আপনি ইহার উত্তর দেন যে "কিছু প্রমাণে উহার লক্ষণ জানা যাইতে পারে।" তাহা হইলে প্রথমে ইহাই বলুন যাহার বিশ্বাসই হয় না তাহার কোন প্রমাণ উপযোগী হইবে? উহার অন্য কাহারও প্রমাণ অল্প ও উপযোগী হইতে পারে না। ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে সব লোক বিশ্বাসের আধারেই চলিতেছে। আমি এই কথাটি সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, মনযোগ করিয়া শুনুন। বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অসম্ভব তর্ক করিয়া অথবা অল্পও তর্ক না করিয়া উভয় অবস্থায় লোকের ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইহা হইতে ভিন্ন অবস্থার লোকেদের

কিছু শ্রেয় প্রাপ্তও হইতে পারে কিন্তু অসম্ভব তার্কিকের কিছুই লাভ হইবে না। ইহার এক উদাহরণ আছে—পূর্ব্বকালে মহ্যাদ্রি পর্ব্বতে গোদাবরীতটে কৌশিক্ ঋষি বাস করিতেন। তিনি বড় শান্ত ও সদ্বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। উঁহার এই দৃশ্য জগতের মর্ম্ম জানা ছিল। উহার নিকটে অনেক শিষ্য ছিল। এই সব শিষ্য সংসারের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য একত্রিত হইয়া আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে আপন আপন মত প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শুঙ্গ নামক একশিষ্য নিজ বুদ্ধির বলে সকলের মত খণ্ডন করিয়া দিল। শাস্ত্র প্রতি উহার বিশ্বাসই ছিল না। ফলতঃ উহার বুদ্ধি থাকিলেও না থাকার তুল্য হইল। কিন্তু সে বাদবিবাদে সুপণ্ডিত ছিল। সেই সময় সকলেই এই কথা বলিত, "যাহা প্রমাণে সিদ্ধ হয় উহাই সত্য।" কিন্তু সে কেবল তর্কবাদীই—অসম্ভব তার্কিক ছিল। অতএব সে সকলের বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া দিল। সে কহিতে লাগিল—"ভাইএরা আমার কথা শুনুন, আপনারা যে বলেন, প্রমাণে যাহা সিদ্ধ হয় তাহাই সত্য কিন্তু ইহা সিদ্ধই হইতে পারে না। কারণ সিদ্ধ করিবার প্রমাণ যদি সদোষ হয় তবে নির্ণয় ও অসত্য হইবে। এইজন্য প্রথমে প্রমাণের শুদ্ধ হওয়ার নিশ্চয় হওয়া চাই। নিশ্চয় হইবার জন্য অন্য প্রমাণের আবশ্যক হইবে। কিন্তু সেখানে পুণরায় ইহা প্রশ্ন হইবে যে প্রমাণ শুদ্ধ কি না? তখন পুণরায় এই বিচার কতদূর চলিবে? অতএব তথায় এক বড় অনবস্থা দোষ প্রাপ্ত হইবে। আর কিছুও নিশ্চয় করা যায় না! সারাংশ ইহা হয় যে প্রমাতা প্রমেয় ও প্রমাণ নিশ্চিতই হইতে পারে না।

তাৎপর্য্য এই যে এই সব আভাস যাহা দেখা যাইতেছে উহা শূন্যে প্রতিষ্ঠিত—ঐ শূন্য ত শূন্যই হয় কারণ উহা প্রমাণের বিষয়ই হইতে পারে না। এই জন্য ইহা নির্ণয় করা যাইতে পারে যে ইহা শূন্য—অন্য কিছু নহে।” শুঙ্গের এই কথা শুনিয়া উহাদের মধ্যে যে মন্দ-বুদ্ধি ছিল সে এই আভাসাত্মক তত্ব জ্ঞানকে সত্য বুঝিয়া শূন্যবাদী হইল আর বিনাশের দশায় পোঁছাইল। উহাপেক্ষা যে অধিক বিচারশীল ছিল সে শুঙ্গের মতকে কৌশিক ঋষির নিকট কহিল। কৌশিক ঋষি উহার সমাধান উত্তম ভাবে করিলেন। রাজপুত্র, এই জন্য অসম্ভব তর্ককে একেবারে ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের আধারে তর্ক করুন। ইহাই উচিত আর ইহাতেই কল্যাণ হইবে।”

পত্নীর এই অত্যন্ত ধৈর্যপূর্ণ উত্তর শুনিয়া হেমচূড় বড় বিস্মিত হইল আর সেই বিশালান্তঃকরণ বিশিষ্ট স্ত্রীকে বলিতে লাগিল—“প্রিয়ে, আমি তোমার এই অগাদ জ্ঞান জানিতাম না। তুমি ধন্যা। তোমার সঙ্গ পাইয়া আমিও ধন্য। তোমার কথায় আমি ঠিক বুঝিয়াছি যে বিশ্বাসেই সব কল্যাণ হয়। কিন্তু এখন বল, বিশ্বাস হয় কিরূপে? বিশ্বাস কোথায় করা উচিত? আর কোথায় না করা উচিত? শাস্ত্র অনন্ত উহার অর্থ পরস্পর বিরুদ্ধ। উহাদের আচার্য্যের মত ভিন্ন ভিন্ন আর টীকাকারের মত বিভিন্ন। আর নিজ বুদ্ধির দিকে দেখিলে উহা ও (বুদ্ধিও) অস্থির দেখিবে। তাহা হইলে কাহাকে মানা উচিত আর কাহাকে মানা অনুচিত? প্রত্যেক মনুষ্য ইহা নিশ্চয় করে যে উহার যাহা রুচিকর বলিয়া মনে হয় তাহাই সত্য আর অন্যসব অনিশ্চিত ও হানিকর। এই স্থিতিতে

অন্তিম নির্ণয়ে কেহই পৌঁছাইতে পারে না। শূন্যবাদী অশূন্যবাদীকে দোষ দেয়। আর এই লোকের শাস্ত্রের আধার (প্রমাণ) মিলে, অতএব উহাদের ও অবিশ্বাস কি করিয়া করা যায়? তুমি এই সব কথা ও বিচার করিয়া থাকিবে। অতএব আমাকে এই সব পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া বল।"

সপ্তম প্রকরণ

ঈশ্বর কি নাই?

এবং সত্তর্কাগমাভ্যাং জগদেতৎ সকর্তৃকম্ ॥
স কর্ত্তা লৌকিকেভ্যস্তু কর্তৃভ্যঃ স্যাদ্বিলক্ষণঃ ॥ ৪১॥

পতি প্রশ্ন করিলে সংসারের স্বরূপ বিজ্ঞাতা সেই জ্ঞানী স্ত্রী হেমলেখা কহিতে লাগিলেনঃ—"প্রাণেশ্বর, চিত্তস্থির করিয়া আদর পূর্ব্বক শুনুন। মন মর্কটের ন্যায় সদা চঞ্চল। সাধারণ লোক এই মনের জন্যই বড় বড় অনর্থে ফাঁসিয়া গিয়াছে। এই চঞ্চল মনই সব দুঃখের কারণ। সুসুপ্তিতে মন গতিহীন হইলে সুখ হয়। এইজন্য আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি উহা মন স্থির করিয়া শুনুন। শুনিবার সময় অনাস্থা (অশ্রদ্ধা) হইলে শুনা না শুনা সমান। চিত্রে চিত্রিত বৃক্ষের মত উহা ফলরহিত হইয়া যায়।

নিরাধার তর্ক অর্থাৎ কুতর্করূপ হানিকর মার্গ ত্যাগ করিয়া সুবিচারের আশ্রয় লইলে লোকের ইহার উত্তম ফল তৎকালেই মিলে। অতএব সযুক্তিক বিচার পদ্ধতির সাহায্য লইয়া একনিষ্ঠায় সাধন করা চাই। এইরূপ বিচার উৎপন্ন বিশ্বাস হইতে মনুষ্যের ফল মিলে। এই জন্য মনগড়া তর্ক ত্যাগ করিয়া বিচার করুন। সমস্ত সংসারের প্রবৃত্তি বিশ্বাসের জন্যই সফল হয়। সুবিচারে যোগ্য সময় বুঝিয়া কৃষক জমি চষে। বিতণ্ডবাদ ছাড়িয়া সরল বিচার ও বিশ্বাসেই সোনা, রূপা, রত্ন, ঔষধাদির স্বরূপ নিশ্চিত হয়। সরল বিচার আর বিশ্বাসের সহায়তাতে স্বহিতের নিশ্চয় করিয়া সাধন করিবার জন্য সুদৃঢ় প্রযত্ন করা উচিত। পূর্বোক্ত শুঙ্গের মত কেবল তর্কবাদী হইয়া প্রযত্ন ত্যাগ করা অনুচিত বিশ্বাসপূর্বক পরিশ্রমীর প্রযত্ন কখন বৃথা হয় না। কৃষক প্রযত্ন করিয়া ফলপ্রাপ্ত কেন হইবে না? পুরুষার্থে কৃষাণের ধান মিলে, ব্যাপারির দ্রব্য মিলে, আর রাজার রাজ্য বৈভব মিলে। ব্রাহ্মণের সর্ব্বসুখকারী বিদ্যা মিলে; শূদ্রের চাকুরী মিলে, দেবতার যে অমৃত মিলে তপস্বীর পুণ্যলোক উহা সব পুরুষার্থেরই দ্বারা হয়। বিশ্বাসরহিত আর যথেচ্ছা তার্কিকের কি কখনও কোথাও অল্পও কিছু ফল মিলিয়াছে? এক আধ বার ফল না মিলিলে যে মনুষ্যের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায় তাহাকে নিজেই নিজের শত্রু বলিয়া জানিবে। অতএব বিশ্বাস ও প্রমাণপুষ্ট বিচারের দ্বারা বর্দ্ধিত পুরুষার্থপূর্ণ প্রযত্নের স্বীকার করিয়া মোক্ষের মুখ্য সাধনের পাঠ শেখা চাই। মোক্ষ সাধন ও অনেক আছে, উহার মধ্যে যে আচরণ করিলে আপনার কৃত সব কার্য্য সফল হয় সেই মুখ্য সাধনের

সাহায্য লওয়া চাই। নিস্কাম ভাবে করিলে সব কর্ম্মে ফল মিলে। এইজন্য উচিত হয় কি প্রমাণপুষ্ট বিচার আর অনুভবে সাধনের নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে দৃঢ়তার সহিত কার্য আরম্ভ করা চাই।

যাঁহাকে পাইলে পুনরায় দুঃখ পাইবার প্রসঙ্গই থাকে না উঁহাকেই পরম শ্রেয় কহা উচিত। সূক্ষ্ম বিচার করিবার পর এই দৃশ্যসংসারের চারিদিকে দুঃখই দেখিতে পাওয়া যায়। তাৎপর্য্য এই হয় যে যাহা দুঃখ মিশ্রিত তাহা পরম শ্রেয় নহে। সম্পত্তি, স্ত্রী পুত্র, রাজ্য, কোষ, সেনা, লৌকিক যশ, বিদ্বত্তা, বুদ্ধিমত্তা, প্রভাবশালী চক্ষু (তীক্ষ্ণবিচক্ষণ চক্ষু) ভব্য শরীর, অঙ্গের কমলতাদি সব কালসর্পের মুখে গ্রস্ত ক্ষণিক দ্রব্যের মত। এইসবে দুঃখের অঙ্কুর উৎপন্ন করিবার সূক্ষ্ম বীজ আছে। পুনরায় ইহাতে পরম শ্রেয় কি প্রকারে মিলিতে পারে? পরমকল্যাণের মুখ্য সাধন ভিন্নই হয়। ধনাদি বিষয়কে উপযোগী বোধ করা অর্থাৎ ইষ্ট সাধন জ্ঞান করা নিছক ভ্রম মাত্র। ইহা মোহের দ্বারা হয়। সারা জগতের কর্ত্তা পরমেশ্বরই মোহ উৎপন্নকারী উঁহার দ্বারা সব মোহিত হইয়া গিয়াছে। কোন মান্ত্রিক ও আপনার অল্প বিদ্যার জোরে অন্য কোন লোকের ভ্রম উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু সসীম বিদ্যার কারণ সে সবলোককে ভ্রমে ফেলিতে পারে না। ইহা বিচার করিবার কথা, এই যে অল্পবিদ্যা মায়াবীর মায়া হইতে যখন লোকেরা ত্রাণ পায় না তখন মহামায়াবী মহাদেব হইতে কে বাঁচিতে পারে? সেই মান্ত্রিকের অল্প বিদ্যা হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে যেমন তাহার (মান্ত্রিকের) বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন কিন্তু

তাহাও তাহার সঙ্গতি বিনা—উঁহার কৃপা সম্পাদন করা বিনা—কখনও মিলিতে পারে না। অতএব এই মহামায়াবী ঈশ্বরের প্রসন্নতা বিনা এই সংসাররূপী মহামোহের পরিত্রাণ কি করিয়া করা যাইবে? এইজন্য অনন্য ভাবে (অভিন্ন ভাবে) উঁহারই শরণাগত হওয়া উচিত। যে উঁহাকে ভাল করিয়া প্রসন্ন করিবে তাহার তাঁহারই কৃপায় মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইবে আর সেই বিদ্যাদ্বারা সে এই মহামায়ার মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। এই পরমকল্যাণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য অন্য অনেক মার্গ বলা হইয়াছে সত্য কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপা বিনা সব ব্যর্থ। অতএব সারা বিশ্বের সুসারথি সেই পরমেশ্বরের আরাধনা প্রথমে করা চাই; উঁনি মোহের নিরসনের জন্য সব সাধন মিলাইয়া দিবেন।

এখন যদি আপনি এই সংশয় উপস্থিত করেন "ঈশ্বর আছেন, ইহার প্রমাণ কি?" তাহা হইলে দেখুন এই সংসাররূপ কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। এই সত্য যে পৃথ্বি, অগ্নি ইত্যাদির উৎপত্তি হয় তাহা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু এসব অবয়ব বিশিষ্ট পদার্থ। অতএব ইহারা কাহার কার্য্য হইবে। এইরূপ সযুক্তিক অনুমানে আর অনেক শাস্ত্রদ্বারা ও এই কথার দৃঢ়তা হয়, উহাতে নিশ্চয় হয় যে এই সংসারের কেও না কেও কর্ত্তা আছেন আর উনি সর্ব্বসাধারণ কার্যকর্ত্তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হন। যদি কোন শাস্ত্রে বলা হইয়া থাকে যে "এই সংসার কোন ও কর্ত্তা বিনা আপনা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে" তাহা হইলে বিচার দ্বারা যুক্তিপূর্ণ যুক্তিবাদী অন্য অনেক শাস্ত্র

উহার উত্তম খণ্ডন করিয়াছেন। কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বিচার কর "আত্মাই নাই" এইরূপ সিদ্ধ যে শাস্ত্র করে সেই শাস্ত্রকে শাস্ত্র না বুঝিয়া ইহার কেবল আভাস (ছায়া) বলা উচিত। উহা'র-দিকে মন দেওয়া অনুচিত। শুষ্ক তর্কে ভরার জন্য এইরূপ শাস্ত্র ত্যজ্য। অন্য কেহ কেহ বলে যে—"এই সনাতন সংসারকে কেউ উৎপন্ন করিলে ও জ্ঞানপূর্ব্বক করেন নাই; ইহা স্বভাবের নিয়মে অর্থাৎ জড়তত্ব হইতে জন্মায়। কিন্তু এই কথাও ভ্রমপূর্ণ। ক্রিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বকই হয়। বুদ্ধি বিনা ক্রিয়া হয় কোথাও দেখা যায় না। ইহার অতিরিক্ত অনেক শাস্ত্র দেখিলে ইহা বিদিত হয় যে ক্রিয়ার কর্ত্তা বুদ্ধিযুক্তই হয়। প্রথমে কার্য্য মাত্রেই বিচারে আসে, ফের পরে কার্য্যে পরিণত হয়। এইরূপ সযুক্তিক (অর্থাৎ শাস্ত্রানুযায়ী যুক্তি) শাস্ত্রের যোগে জগতের কর্ত্তা থাকা সিদ্ধ হয়। এই কর্ত্তা ব্যবহার কর্ত্তা হইতে ভিন্ন। কেন না যখন উহার কার্য অসংখ্য, কার্য্যের সীমা না থাকায় উহা ও অচিন্ত্য ও অনন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট। যখন কার্য্যের সীমা দেখা যায় না তখন কর্ত্তার সামর্থ্য ও সীমার বাহিরে। অর্থাৎ শরণাপন্নকে উদ্ধার করিতে উনি সম্পূর্ণ সমর্থ। এইজন্য রাজপুত্র, অনন্য ভাবে (অভিন্ন ভাবে) উহার শরণ লউন। আপনার বিশ্বাসের জন্য এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য সীমাবদ্ধ, উহাকেও যদি সত্য প্রেমভাবে প্রসন্ন করিলে সেও আপনাশ্রিতের হিতেচ্ছায় পূর্ণপ্রযত্নে উহার মনোরথ পূর্ণ করে তাহা হইলে ঐ ত্রৈলোক্যের অধিপতি ভক্তবৎসল ঈশ্বর যাহার প্রতি প্রসন্ন নহ উহাকে উহার অভিলষিত পদার্থ কি দিবেন না? লৌকিক

দৃষ্টিতে সংসারের ঐশ্বর্য্যবান পুরুষ অনিয়মিত, আদর ভাবরহিত, নিষ্ঠুর ও কৃতঘ্নও হয়। কিন্তু পরমেশ্বর দয়ার সাগর হন, ক্রিয়ার জ্ঞাতা ও নিশ্চিতরূপে ফলদাতা হন। যদি এরূপ না হইতেন তাহা হইলে সকলের বন্দনীয় কিরূপে হইতেন? আর এই সংসার যাত্রা সুব্যবস্থিত রীতিতে চলিত কি প্রকারে? যদি উহা অব্যবস্থিত হইত তাহা হইলে এই সব রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইত। ইহা হইতে কি ইহা নিশ্চিত হয় না যে সেই দয়াসিন্ধু ঈশ্বর সুব্যবাস্থিত। এইজন্য রাজকুমার, বিলম্ব না করিয়া সর্ব্বতঃ ভাবে তৎপরতার সহিত উঁহারই শরাণাপন্ন হউন। ইহাই আপনাকে পরমকল্যাণপদে পৌঁছাইয়া দিবে। রাজন্, পরমাত্মার উপাসনার অনেক ভেদ আছে। সঙ্কটে কিম্বা কিছু লাভের প্রত্যাশায় অনেকে উপাসনা করে কিন্তু নিষ্কাম উপাসনা কোথাও কোথাও দেখা যায়। নিস্কাম উপাসনাই সত্য উপাসনা। সঙ্কট উপস্থিত হইলে পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে, সম্ভবতঃ দয়া করিয়া সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন আর উপাসনা অপূর্ণ হইলে কখনও উপেক্ষাও করেন। লাভের আশায় ঈশ্বর উপাসকের ফল সল্প ও অনিয়মিত কিন্তু নিস্কাম উপাসনার পরিণাম ইহা হয় যে কিছু সময় পর্য্যন্ত উপাসকের শুদ্ধ ভাব জানিয়া সংসারী প্রভুও—যদিও সে স্বয়ং অব্যবস্থিত আচরণকারী হয়—আপনার সেবকের সম্পূর্ণ বশ হইয়া যায়, এখানে উহার সেবকের শুদ্ধভাব জানিতে সময় অধিক লাগে কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ভগবান সবের হৃদয়ের স্বামী বলিয়া সব কথা সেইক্ষণেই জানিতে পারেন আর তৎকালে ফল দেন। ব্যসনার্থ ও লাভেচ্ছু পুরুষের

ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সময় ঈশ্বর নিয়তির সহায় উহার পূর্ব্বকর্ম্মানু-সারে ফল দেন। কিন্তু নিস্কাম উপাসক উহার অনন্যরূপে (অভিন্ন-রূপে) শরণ লইতে দেখিয়া, তিনি উহার যোগক্ষেমের ভার আপনি লন অর্থাৎ উপাসনা মার্গে উপাসকের স্থিতির ও উন্নতির ভার লন। আর উপাসকের নিয়তিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব কর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া মোক্ষের সাধনে নিযুক্ত করাইয়া শীঘ্র ফল মিলাইয়া দেন। ইহাই সেই পরম পিতার মহেশ্বরতা আর উহাই উঁহার মহৎস্বতন্ত্রতা। পূর্ব্ব কর্ম্ম আর নিয়তির প্রভূত্ব ঈশ্বরবিমূখের হয়। ঈশ্বরে নিস্কাম ও একনিষ্ট ভক্তের উপর উহারা (পূর্ব্ব কর্ম্ম বা নয়িতি) আধিপত্য করিতে পারে না। মার্কণ্ডেয় আখ্যানে সব লোক জানে যে ঈশ্বর নিজভক্তকে পূর্ব্ব কর্ম্ম ও নিয়তি হইতে উল্লঙ্ঘণ (ত্রাণ) করেন। প্রাণনাথ, যদি আপনি জানিতে চান ত আমি আপনাকে ইহার যুক্তি দেখাইতে পারি। যদি প্রারব্ধ ও নিয়তি অনুল্লঙ্ঘনীয় হয় ত প্রারব্ধের অভেদ্যতা যাহারা প্রযত্ন করে না অর্থাৎ অলসের জন্য। এই জন্য প্রযত্ন পূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাসী যোগীকে উহার প্রারব্ধ দুঃখ দিতে সমর্থ হয় না। যে প্রযত্ন পরান্মুখ সে প্রাবব্ধরূপী সাপের মুখে যায়। "উহাও নিয়তিরই সঙ্কল্প। অনুভবেও এই কথার পুষ্ট করিতেছি। নিয়তি ঈশ্বরের শক্তি কেবল সঙ্কল্পই উহার স্বরূপ। আর পরমেশ্বর সত্য সঙ্কল্প বলিয়া এই নিয়তি জীবের অনুল্লঙ্ঘনীয় হইয়া গিয়াছে। অকুণ্ঠিত হইলেও উহা ঈশ্বর-ভক্তের জন্য কুণ্ঠিত হয়। অতএব প্রাণনাথ, আপনি কুতর্কচক্রে না পড়িয়া সেই মহেশ্বরের শরণাপন্ন হউন। নিস্কাম ভাবনার

যোগে উঁনি আপনাকে কল্যাণ স্থনে পৌঁছাইয়া দিবেন। সুখের চটীতে পৌঁছাইবার জন্য ইহাই প্রথম সিড়ি। ইহা ভিন্ন অন্য মার্গে যাইয়া কোন ফল মিলিবার সম্ভাবনা নাই।"

শ্রীদত্তাত্রেয় কহিতে লাগিলেন—,'পরশুরাম, পত্নীর এই কথাগুলি শুনিয়া হেমচূড় অত্যন্ত আনন্দিত হইল আর পুনরায় কহিতে লাগিল, "প্রিয়ে, এখন ইহা আমায় বুঝাও যে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন, তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার? আর যিনি সকলের কর্ত্তা, অত্যন্ত স্বতন্ত্র আর যাঁহার শক্তিতে সকল সংসার চলিতেছে উহার নাম কি? উহাকে কেহ বিষ্ণু বলে, কেহ শিব বলে, কেহ গণপতি বলে ঐ প্রকার কেহ সূর্য্য, কেহ নৃসিংহ, কেহ বুদ্ধ, সুগত, অর্হত, বাসুদেব, কেহ প্রাণ, চন্দ্র, কেহ অগ্নি, আর কেহ কর্ম্মপ্রধান, অনু ইত্যাদি অনেক নামে ডাকে। এইরূপে জগতের কারণকে বিভিন্ন মতে বিবিধ প্রকার বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাহারও উপর ঈশ্বরভাবনা রাখা উচিত। তুমি অবশ্য জান কারণ ব্যাঘ্রপদ মুনি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শী ছিলেন এবং এইজন্য স্ত্রী হইয়াও তোমার এই জ্ঞান আছে। তোমার কথাও আমার বড় মিষ্টি লাগিতেছি, আর তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস গাঢ় হইয়াছে। ইহা ছাড়া তোমার আমার প্রতি প্রেমও আছে। অতএব সব আমায় বুঝাইয়া দাও।"

রাজপুত্র এইরূপ বলিলে হেমলেখারও আনন্দ হইল। অনন্তর সে কহিতে লাগিল—"প্রাণনাথ, আমি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় স্পষ্টভাবে কহিতেছি, শুনুন! সমস্ত সংসাররূপ আড়ম্বর উৎপন্নকারী আর

পুনরায় লয়কারীর ঈশ্বর হন। উনি বিষ্ণু, উনি শঙ্কর, উনি ব্রহ্মাদেব, উনি সূর্য্য আর চন্দ্র। এইরূপ অনেক ভেদে সকলে উঁহাকেই নিরূপণ করে। কিন্তু বস্তুতঃ উনি শিবও নহেন, বিষ্ণুও নহেন, ব্রহ্মাদেবও নহেন আর অন্য কেহই নহেন। এ বিষয় সম্পূর্ণ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি, একাগ্রচিত্তে শুনুন। যে শৈব সে পঞ্চমুখী ও ত্রিনেত্র শঙ্করকে কর্ত্তা বলিয়া বুঝে। এইরূপে ভিন্ন মতবাদী আপন আপন ভাবনা অনুসারে বুঝে। কিন্তু এই ভেদকে ছাড়িয়া সামান্য অনুমানে দেখিলে ঐ কর্ত্তাকে ঘটাদির কর্ত্তার মত চেতন আর দেহধারী বলিয়া মানিতে প্রথমে কোন বিঘ্ন নাই। ব্যবহারেও কোন বস্তুর কর্ত্তা চেতন ও দেহধারী দেখিতে পাওয়া যায়। অশরীর ও অচেতন কর্ত্তা কোথাও মিলে না। এই দুই কর্ত্তার মধ্যে কর্তৃত্ব শক্তি মুখ্যতঃ চেতনেই থাকে। কেন না ইহা অনুভবের কথা যে স্বপ্নে জীব আপনার স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া চৈতন্যযুক্ত শরীরের দ্বারা যথেষ্ট পদার্থ উৎপন্ন করিয়া লয়। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে কার্য্যকর্ত্তা চিতাত্মার শরীর এক সাধন হয়। এই সাধনের (করণের) আবশ্যকতা জীবের হইবেই কারণ জীবের স্বতন্ত্রতা সসীম। কিন্তু জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর পূর্ণ স্বতন্ত্র এইজন্য উহার কোনও সাধনের (করণের) আবশ্যকতা হয় না আর উনি এই সম্পূর্ণ জগত উৎপন্ন করেন। অতএব ইহা নির্দ্ধারিত হইল হে উহার কোন শরীর নাই। যদি এইরূপ না হইত ত লৌকিক কর্ত্তার মত উহার সামগ্রীর আবশ্যকতা মনে হইত। ফলতঃ দেশ কালাদি সামগ্রী লইয়া সংসার রচয়িতা পরমেশ্বরের এক সাধারণ জীবই হইয়া যাইতেন আর উহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্যতে বিধান হইত

অগনিত। জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে উহার নিকট সাধন অবশ্য থাকে আর যদি সে সধেনের কর্ত্তা না হইলে ইহা স্পষ্ট হয় যে তাঁহার সব কর্ত্তৃত্ব শক্তিই নষ্ট হইয়া যাইত। অতএব ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল যে পরমেশ্বরের স্থূল দেহ জগদুৎপত্তি করিবার আবশ্যক হয় না— বস্তুত তাঁহার স্থূল শরীরই নাই! পরমেশ্বরের শরীর শূন্য সূক্ষ্মরূপে স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য হয় না। এইজন্য ভক্তি করিবার সময় নিজ নিজ বুদ্ধির অনুসারে ঈশ্বরের ধ্যান ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে করে। এই কারণে ভক্তচিন্তামণি পরমেশ্বর ভক্তের জন্য অনেকরূপও ধারণ করেন। পরমাত্মা শুদ্ধ চেতন হন, পরম চৈতন্যই উহার শরীর ইহাতে (চৈতন্যে) উহার মহা সত্ত্বা। ইনি মহাস্বামিনী পরমেশ্বরী ত্রিপুরা দেবী। বস্তুতঃ একরূপ এই সংসার উহাতে নানারূপ ভাসিত হইতেছে। দর্পনে ভাসিত প্রতিবিম্বের ন্যায় এই সব চরাচর জগৎ শুদ্ধচিংরূপেই হয়। অর্থাৎ উত্তম অধমেয় ভাবনা ব্যর্থ। ইহা ভিন্ন পরমেশ্বরকে যে অন্য দেহধারী স্থূল বলিয়া মানে উহার কিছু প্রধানতা নাই। উত্তমজনের কর্ত্তব্য দেহরহিত রূপের উপাসনা করা। যদি ইহা করিতে অপারক হইলে আপন রুচির অনুকূল আকার রূপের ধ্যান করা চাই। পুণরায় উহার নিষ্কাম উপাসনা আরম্ভ করা চাই। ইহাতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ পরমকল্যাণ প্রাপ্ত হয় রাজপুত্র বিনা উপাসনায় অন্য কোন মার্গে কোটী জন্মে মনুষ্যশরীরের সার্থকতা নাই।
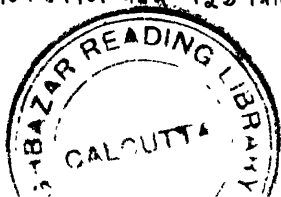
অষ্টম প্রকরণ

তত্ত্ব জ্ঞানের স্ফুরণ।

পরাচিতি র্মে জননী সখী বুদ্ধির্মতা মম ॥
অবিদ্যা ত্বসতী প্রোক্তা যথা বুদ্ধিঃ সুসংগতা ॥২৬॥

আপনার পত্নীর এইরূপ কথা শুনিয়া হেমচুড় পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিয়া ছিলেন উহার তুর্য্য চৈতন্য স্বরূপে বিশ্বাস হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়া ছিলেন। যে মাহেশ্বরী ত্রিপুরা দেবী উহার সগুণ রূপ, উহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানিয়া উহার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। পুনরায় উনি অত্যন্ত একনিষ্টতা ও দৃঢ় নিশ্চয়ে উহার উপসনা করিলেন। কয়েকমাসে ত্রিপুরাদেবী উহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গেলেন। সেইজন্য উহার চিত্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া বিচারে মগ্ন হইল। এইরূপ দুর্লভ স্থিতি পরমেশ্বরের কৃপা বিনা মিলে না। চিত্তের বিচারে রত হওয়াই মোক্ষের মুখ্য কারণ। পরশুরাম, যতক্ষণ না চিত্ত বিচার তৎপর হয় ততক্ষণ অন্য শত উপায় করিলেও পরমকল্যাণ প্রাপ্তি হয় না। এইরূপ বিচারলীনতা অবস্থায় উহার সহিত উহার পত্নীর নির্জ্জনে একদিন সাক্ষাৎ হইল। আপনার ঘরের দিকে আপন প্রিয়পতিকে আসিতে দেখিয়া হেমলেখা উহাকে ঘরে আনিয়া ভাল আসনে বসাইলেন। যোগ্য সম্মান করিয়া অমৃতের ন্যায় মধুর ও তাত্ত্বিক কথা আরম্ভ করিয়া কহিতে লাগিলেনঃ—

বহুদিন পরে আপনার সহিত সাক্ষাত হইল। স্বাস্থ্যত ভাল আছে? ইহা অসম্ভব যে এতদিন পর্য্যন্ত আপনার আমাকে স্মরণই হয় নাই। আমার সহিত কথা ও আলাপ না করিয়া আপনি এক-ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন না। আমাকে না জানাইয়া স্বপ্নেও কোন কাজ করেন নাই। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না যে এখন কি হইয়া গিয়াছেন। আমাভিন্ন আপনার এক রাত্রিও যুগের সমান বোধ হইত; অতএব আপনি এত রাত্রি একলা কি করিয়া কাটাইয়াছেন?

এইরূপ কহিয়া উহাকে জড়াইয়া ধরিল আর কিছুক্ষণের জন্য খিন্ন হইল। কিন্তু এই সময় পত্নীর আলিঙ্গনে হেমচূড়ের মনে অল্পও বিকার উৎপন্ন হয় নাই। উল্টা তাঁহাকে কহিতে লাগিলেনঃ—"প্রিয়ে, তুমি এইরূপে আমাকে মোহে ফেলিও না। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ চিনিয়াছি। তুমি বড় ব্রহ্মজ্ঞানী আর ধৈর্য্যশালিনী—তোমার এইরূপ মোহ কি করিয়া হইতে পারে? আমি তোমায় এখন কিছু প্রশ্ন করিবার জন্য অসিয়াছি। পূর্ব্বে তুমি আমাকে আত্ম-কথা বলিয়াছিলে তাহা স্পষ্ট করিয়া এখন আমায় বল। তোমার মাতা কে? সখী কে ছিল? উহার পতি কে ছিল? উহার পুত্রাদি কে ছিল? আমাকে এইসব স্পষ্ট করিয়া বল। আমি এখন পর্য্যন্ত ঠিক বুঝি নাই আর আমি ইহাও ভাবিতে পারি না যে তুমি মিথ্যা বলিতেছ। তুমি নিশ্চয় অন্যোক্তির সহিত অর্থাৎ হেয়ালীর সহিত বর্ণনা করিয়াছ। একেবারে সব কথা খোলসা করিয়া বর্ণনা কর; তাহা হইলে সব আমি বুঝিতে পরিব। তোমার

প্রতি আমার অত্যন্ত প্রেম আছে আমার মনের এই সংশয় দূর কর।”

এইকথা শুনিয়া হেমলেখার নয়নে ও বদনে প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে ঈশ্বরের কৃপায় উহার পতি পূর্ণ বিষয়বিমুখ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া গিয়াছেন। মহেশ্বরী চিৎশক্তি তাঁহাকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। উহার পূর্ব্বপূণ্য উদিত হইয়াছে ও প্রবোধ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহার বোধ করাইবার ইচ্ছায় এইরূপ ভাবে ইঙ্গিতে বলিতে লাগিলেনঃ—“প্রাণনাথ পরমেশ্বরের কৃপায় আজ আপনার সৌভাগ্য উদয় হইয়াছে। এইরূপ বিষয়বৈরাগ্য কাহারও হয় নাই। পরমেশ্বরের কৃপার প্রথম লক্ষণ ভোগবিমুখতা হওয়া। অন্য লক্ষণ, মনের বিচার প্রবৃত্তি। এখন আমি আপনাকে আমার আত্মকথার সত্য ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি। পরাচিতি আমার মা; বুদ্ধি আমার সখী। এই বুদ্ধি যাহার সঙ্গ পাইয়াছিল উহার নাম অসতী অবিদ্যা। অবিদ্যার অদ্ভুত সামর্থ্য সংসারে স্পষ্ট দেখা যায়। দড়িতে সাপের আভাস (ভ্রম) দেখাইয়া সে বড় ভয় উৎপন্ন করে। উহার (অবিদ্যার) ছেলে মহামোহ। উহার পুত্র (অর্থাৎ মোহের পুত্র) মন। মনের এক স্ত্রী কল্পনা। ইহার (মনের) পাঁচপুত্র, পঞ্চজ্ঞনেন্দ্রিয়। উহার (ইন্দ্রিয়ের) স্থান শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে। বিষয়ের সেবাতেই মনের সংসার সৃষ্টি হয়—সেই ছেলেদ্বারা বাপের পুষ্টি হয় অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন পুষ্ট হয়। চুরি করিয়া একান্তে মনের ভোগ করা—স্বপ্ন দেখা। কল্পনার অত্যন্ত পেটুক ভগ্নী আশা। আশা মনের দ্বিতীয়

স্ত্রী ; আশার দুইপুত্র একের নাম কাম অন্যের নাম ক্রোধ। আমার নগর আমার শরীর। স্বরূপের বরাবর স্ফুরণ হওয়াই আমার বন্ধনের মহামন্ত্র। মনের যে প্রচার নামক প্রিয় মিত্র বলা হইয়াছিল তাহা প্রাণ। নরককে অরণ্য বলা হইয়াছিল। বুদ্ধির সহিত আমার (জীবচিতির) মিলনের অর্থ চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রবেশ অর্থাৎ সমাধি হওয়া। প্রাণনাথ, আমার মাতার স্থান প্রাপ্তির অর্থ মোক্ষপ্রাপ্তি। এই আমার কথা। এই সব কথা স্পষ্ট বুঝিয়া আপনি পরম পদ প্রাপ্ত হউন।"

নবম প্রকরণ

—০—

যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি

— —

ইত্যুক্ত প্রিয়য়া হেমচূড় আলক্ষ্য তং পদম্ ॥
চিরং বিশ্রাংতিমালভ্য বহির্বিস্মরণং যযৌ ॥ ১০০ ॥

হেমলেখার কথা শুনিয়া হেমচূড় বিস্মিত হইলেন। উহার বাক্য আনন্দে গদগদ হইল। তিনি কহিতে লাগিলেনঃ—"প্রিয়ে ; তুমি ধন্য। তুমি বড়ই নিপুন। তুমি আত্মস্থিতির সবকথা গল্পচ্ছলে বুঝাইয়াছ—আমি তোমার জ্ঞানের কি বড়াই করিব ? ইহা আমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। এখন তোমার বোঝানর জন্য

উহা স্পষ্ট হইয়াছে। আমার উহা স্মরণও হইতেছে অনুভবও হইতেছে। সত্যই এই লোক ব্যবহার বড় অদ্ভুত। প্রিয়ে কিন্তু এখন বল যে সেই পরাচিতি কি হয়? উনি তোমার মাতা কিরূপে হইলেন? উহা হইতে তোমার জন্ম কিরূপে হইল? আমি কে আমার স্বরূপ কি হয়?"

পরশুরাম, এইরূপ প্রশ্ন করিলে হেমলেখা নিজ পতিকে কহিতে লাগিলেন,—"প্রণনাথ, ইহা বড় গুঢ় বিষয়। আমি বুঝিয়াই বলিতেছি; আপনি চিত্তকে সম্পূর্ণ একাগ্র করিয়া শুনুন। প্রথমে আপনি বুদ্ধিকে অত্যন্ত শুদ্ধ করিয়া লউন। আর উহার দ্বারা (শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা) আপনার আত্মার স্বস্বরূপের স্পষ্ট বিচার করুন। এই আত্মতত্ত্ব দেখাইবার যোগ্য বা বলিবার যোগ্য নহে; পুনরায় উহাকে আমি কিরূপে নিরূপণ করিব? যখন আপনার এই আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইবে তখনই আপনি আপনার মাতাকে (চিতিশক্তিকে) জানিতে পারিবেন। প্রিয়বর, এই স্বরূপ বিষয়ে কাহারও উপদেশে কিছুই হইবে না। কোন উপদেশকের আবশ্যকতা না রাখিয়া শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে নিজেই আপনার স্বস্বরূপের শোধন অর্থাৎ বিচার করুন। এই আত্মভাবের দ্বারা দেবতা হইতে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জন্তুগণও ভাসিত হইয়া রহিয়াছে—কেবল আকরে দেখা যায় না। উঁহাকে কোন প্রমাণের দ্বারা দেখান যায় না। উঁহা সকলের, সকলসময়, সর্ব্বত্র অনুভবে রহিয়াছে। উঁহার অংশতঃ নিরূপণ ও কেউ, কিরূপে, কবে আর কোথায় করিতে পারিবে? কেহ যদি বলে আমাকে আমার চক্ষুকে দেখাইয়া দাও তাহা হইলে

চক্ষু দেখান রূপ কাজে কোন গুরুর কোনও উপযোগ হয় না, যতই কুশল উপদেশক হউন না কেন কিন্তু সে চক্ষু দেখাইয়া দিতে পারিবে না। উপদেশকের আবশ্যক কেবল উপায়—পথ—দেখাইবার জন্যই হয়। এইজন্য আমি আপনাকে আত্মতত্ত্ব জানিবার কেবল মার্গ দেখাইতেছি। এই মার্গ এই হয় যে :—আপনার যে যে "আপনার" (অর্থাৎ নিজের) বলিয়া বোধ হয়—উহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ যাহাকে "আপনার" (নিজের) বলা যায় না উহাই নিজের স্বরূপ। একান্তে যাইয়া স্পষ্ট বিচার করুন। যাহা, যাহা "আমার" কহা যায় সেই সবকে ত্যাগ করিয়া ঐ সব হইতে ভিন্ন আত্মস্বরূপকে জানুন। উদাহরনার্থ আমার সম্বন্ধে আপনি বুঝিতেছেন যে 'ইহা আমার পত্নী" এখানে আপনার নিজ আত্মার জ্ঞান হইবে না। সম্বন্ধবশে আমি আপনার আত্মীয় হই কিন্তু আমি আপনার স্বরূপ নহি এইরূপে সমস্ত "মম" অর্থাৎ "আমার" ভাবকে দূর করিয়া শেষে যাহাকে ত্যাগ করা যায় না ঐরূপে আত্মস্বরূপের খোঁজ করিয়া পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হউন।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র হেমচূড় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া এদিক সেদিক কোন দিক না গিয়া শীঘ্র ঘোড়ায় চড়িয়া নগরের বাহিরে চলিয়া গেল। আপনার এক রম্য উদ্যানের স্ফটিক মন্দিরের বৈটকে সে উঠিল। সে তাহার সেবকগণেকে নীচে রাখিয়া গেল। দ্বারপালকে সে আদেশ করিল যে "আমি নির্জ্জনে বিচার করিবার জন্য বসিতেছি এখানে কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না। এমন কি মহারাজ, প্রধান মণ্ডলী অথবা অন্য কেহ হউক না কেন।

আমার অজ্ঞা ব্যতীত এখানে কেহ যেন না আসিতে পারে।” ইহা বলিয়া সে সেই মন্দিরের নূতন মঞ্জিলে চলিয়া গেল। এই স্থান এত উচ্চ ছিল যে উহার জানালা দিয়া দূর দূরান্তের সব-স্থান দেখা যাইতেছিল। নির্জ্জন পাইয়া ও নরম বস্ত্রের আসন করিয়া সে আপন চিত্তকে অত্যন্ত শান্ত করিয়া লইল। পুণরায় সে বিচার করিতে লাগিল:—“বাস্তবিক সব লোক এত মূঢ় কি করিয়া হইয়া গেল? এখানে এমন কেহই নাই যে অল্পও জানে যে আমি কে হই। আর প্রত্যেক লোক নিজের জন্য দেখ কত প্রকারের উদ্যোগ করিতেছে। কেউ শাস্ত্র পাঠ করিতেছে কেউ বেদবেদাঙ্গ রগড়াইতেছে, কেউ দ্রব্য সম্পাদন করিতেছে আর অন্যকেউ রাজ্য চালাইতেছে। কেউ আপনার শত্রুর সহিত লড়িতেছে আর কেউ বিষয় ভোগে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইয়াছে। এই সব কার্য্য নিজের জন্য মনে করিয়া, করিয়া যাইতেছে। কিন্তু কেহই ইহা জানে না যে আমি কে হই আর কিরূপ হই। ইহা কি ভ্রম? আমিও আজ পর্য্যন্ত আমি কে ইহা না জানিয়া বহু কার্য্য করিয়াছি। এই সব স্বপ্নের ন্যায় নিস্ফল হইয়া গেল। এখন আমি আপনস্বরূপেরই বিচার করিয়া স্পষ্ট দেখিতেছি যে রাজমন্দির, ধান্যাদি পদার্থ, সমস্ত রাজ্য, রাজৈশ্বর্য্য, সুন্দরী স্ত্রী, হাতি ঘোড়া আদি কেহই আমি নই। কারণ উহাদিগকে “আমি” বলা যায় না এই সব “আমার”। অতএব আমি এই দেহই হইব। ইহাতে সন্দেহ নাই যে ক্ষত্রিয় কুলে জন্মিয়া শ্বেতবর্ণের এই শরীরই আমি হই। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের কথা যে আমার ন্যায় সকলেই নিজ

নিজ শরীরকেই আমি বলিয়া বুঝে।" ঐইরূপ শঙ্কাগ্রস্থ হইয়া সেই রাজকুমার শরীর সম্বন্ধে আরো বিচার করিতে লাগিল। শেষে "শরীরই আমি" ইহার খণ্ডন করিবার তর্ক আরম্ভ করিল।

সে কহিতে লাগিল :—"এই শরীরকে আমার" বলা হয় ; সুতরাং উহা "আমি" অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি করিয়া হইবে ? এই রক্ত মাংস কায়া প্রত্যেকক্ষণ প্ররিবর্ত্তণ হইতেছে। কালের গতিতে ইহার এক এক কণা প্রতিক্ষণ নষ্ট হইয়া পুনরায় অন্য কণা একত্রিত হইতেছে। এইজন্য আমি শরীর নহি—কেউ অন্য হইব। তাহা হইলে কি শরীরের ভিতরে থাকিয়া উহাকে চালায় যে প্রাণবায়ু, সেই প্রাণই কি আমি হই ? হাঁ, ইহা ঠিক ; কিন্তু উহাতেও এক দোষ হয়—উহার (প্রাণের) কিছু জানিবার সামর্থ্য নাই। নিদ্রায় প্রাণবায়ু, চলিতে থাকে কিন্তু উহা জানিতে পারে না যে আসপাশে কি হইতেছে। কদাচিৎ মনই আমি হই, কিন্তু মন হয় কি বস্তু ? আনেক বৃত্তির মিলনে মন তৈয়ারী হয়। ইহাদের মধ্যে কোন বৃত্তিটি আমি হই ? যেমন শরীরের পরমাণু হয় সেইরূপই মনে বৃত্তি হয় —উহা যায় আসে। উহাতে (বৃত্তিতে) স্থির কে হয় ? তাহা হইলে পুনরায় আমি কে হই ? এই দশা বুদ্ধিরও হয়। উহার (বুদ্ধির) স্বরূপ নিশ্চয়। কিন্তু নিশ্চয়ও এক যায় এবং অন্য আসে। আর আমি ত সদাই আছি। এ রকম কখনও হয় না যে আমি না হই (অর্থাৎ আমি নাই)। তাহা হইলে পুণরায় সদাই যে থাকে ও সদাই যে জানে সেই আমি কেহই হই ? আর উহা কিরূপ ? হেমলেখার কথা অনুসারে প্রাণ, মন, বুদ্ধিকে "আমি" না বলিয়া কেবল "আমার"

বলিতেছি। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ ও নিশ্চয় হয় যে শরীর হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সব হইতে "আমি" কেহ ভিন্ন হই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে আমি সর্ব্বদা জ্ঞাতারূপ হই। আমার ইহা ঠিক ঠিক বুদ্ধিতে আসিতেছে না যে যাহা সর্ব্বদা অনুভবে আসে এইরূপ 'আমি' কে কিপ্রকারে জানিতে পারি। কিন্তু কেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না তাহা জানা দরকার। সংসারে ঘটাদি বস্তু নেত্রে-ন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভবে আসে। প্রাণ স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় সেইরূপ বুদ্ধিকে জানা যায়। কিন্তু ইহা জানা যায় না যে কেমন করিয়া আমাকে জানা যায়। খুব সম্ভব এই ঝঞ্ঝাট্ জন্যই আত্মার ভাণ হয় না। যাহা হইবার হউক আমি এখন অনেক প্রকারের এই সঙ্কল্পকে ছাড়িয়া দিতেছি। কদাচিৎ এরূপ করিলে আমার 'আমার স্বরূপের' স্পষ্ট অনুভব হইয়া যাইবে।"

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সে আপনার মনের সব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া দিল। সেই সময় একাগ্রতা কালে উহার অন্ধকারের অনুভব হইল। ইহাকেই (অন্ধকারকেই) আপনার স্বরূপ বুঝিয়া সে বড়ই আনন্দিত হইল। পুনরায় আবার উহার মনে স্বরূপের অনুভব করিবার ইচ্ছা হইল। সে হটযোগের দ্বারা আপনার চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করিল। তখনই সে এক দিব্য ও অদ্ভুত তেজ দেখিতে পাইল। উহাকে ক্ষণকাল দেখিয়া বিস্মিত ও আশ্চার্য্যা-ন্বিত হইয়া বিচার করিতে লগিল যে স্ব স্বরূপ এইরূপ অনেক প্রকারে কিরূপে দেখা যাইতেছে? আর একবার ত দেখি। সে পুনবায় আপনার মনকে নিরুদ্ধ করিল। ফলতঃ সে বহু সময়

পর্য্যন্ত নিদ্রায় লীন হইয়া গেল। এই অবস্থায় সে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিল। সচেতন হইবার পর উহার মনে এই সব দৃশ্যের জন্য বড় চিন্তা উৎপন্ন হইল। সে বলিতে লাগিলঃ—

"নিদ্রিত হইয়া আমি কিরূপে এই স্বপ্ন দেখিলাম? সেই অন্ধকার আর সেই তেজ যাহা দেখা গিয়াছিল তাহা স্বপ্নই। স্বপ্নের অর্থ—মনের বিলাস। ফের এই প্রশ্নের মীমাংসা কি করিয়া হইবে? পুণরায় নিগ্রহ করিয়া দেখিবার দৃঢ়নিশ্চয়ে সে আপন চিত্তকে একাগ্রতা করিল। উহা (চিত্ত) কিছু স্থির হইয়া গেল; এই সময় উহার এইরূপ অনুভব হইল যে সে আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। চিত্তের গতি (চঞ্চলতার) জন্য উহা পুণরায় সজাগ হইল। আর বিচার করিতে লাগিল আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? আমার কি চিত্তভ্রম হইল? অথবা এইসব যথার্থ সত্যই? বড় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি কোনও বিষয় অনুভব করি নাই। ফের আমার সুখ কি প্রকারে অনুভব হইল? অন্য কোন রীতিতে আমার এই সুখের লেশ মাত্রের অনুভব হইতে পারে না। নিদ্রিত অবস্থার ন্যায় আমি ভিতর বাহির সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম; পুণরায় সেই সুখ কোথা হইতে আসিল? যখন সুখ হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না তখন সুখ কি প্রকারে হয়? আমি আত্মার খোঁজ করিতে লাগিয়াছিলাম। উহা আমার মিলিল না আর অন্য কিছু দেখিতে পাইলাম। ইহা কি? আত্মা কি প্রকাশ স্বরূপ? কি উহা অন্ধকার স্বরূপ? কি সুখই আত্মা হয়? অথবা উহা অন্য কিছু? এই সব স্বরূপ কি আত্মা নহে? ইহার নির্ণয় হয় না।

এখন এই বিষয় আপনার প্রিয়ার নিকটে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন।”

দ্বারপাল পাঠাইয়া রাজপুত্র হেমলেখাকে আপনার নিকট ডাকিল। বিদূষী মনোহারিণী রমণী আসিয়াই দেখিলেন, রাজপুত্র শান্তচিত্ত হইয়া এক আসনোপরি স্থির হইয়া বসিয়াছে। উহার শ্বাস খুব ধীরে বহিতেছিল। চিত্ত গতিরহিত হইয়া গিয়াছিল। সব ইন্দ্রিয়েরও দমন হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি উহার নিকটে গিয়া উহার আসনে বসিয়া পড়িলেন। নেত্র উন্মীলন করিলে রাজপুত্র হেমলেখাকে দেখিল। চখে চখে মিলন হইবার পরেই হেমলেখা উহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া অমৃততুল্য মধুর বাণী বলিতে লাগিলেন:—

“প্রাণনাথ আমাকে কেন ডাকিয়াছেন? আপনার স্বাস্থ্য ত ঠিক আছে?” রাজপুত্র বলিতে লাগিল:—“প্রিয়ে, তোমার কথানুসারে আত্মস্বরূপের দর্শন করিবার ইচ্ছায় একেবারে তন্ময় হইয়া আমি এই নির্জ্জনস্থানে বসিয়াছি কিন্তু আমি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুই দেখিতে পাইতেছি। ইহা কি? প্রথমে আমার বিচারে এইরূপ বোধ হয় যে আত্মা সদাই প্রাপ্ত ও নিত্য প্রকাশমান। উহা অনুভবে আসে না উহার কারণ অন্য অনাত্মা পদার্থ হইবে। এই বুঝিয়া আমি ভিতর বাহিরের সমস্ত ভাসকে নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তকে স্থির করিয়া লই। কিন্তু ইহা করিবার পরেও আমার কিছুই বোধ হইল না। প্রথমে আমি অন্ধকার দেখি; একবার প্রকাশ দেখি। একবার স্বপ্নও দেখি। একবার আমার বড় ভারি সুখপ্রাপ্ত হয়। আমাকে

বল এইসব কি ? আত্মার কি এই স্বরূপ অথবা অন্য কিছু ভিন্ন ? স্পষ্ট বুঝাইয়া দাও যাহাতে আত্মাকে চিনিতে পারি।”

ইহার উত্তরে সেই ব্রহ্মজ্ঞানী স্ত্রী কহিতে লাগিলেন :— “প্রিয়তম, শুনুন। আপনি বাহ্য নিরোধ করিবার যে প্রযত্ন করিয়াছিলেন উহা খুব ভালই করিয়াছিলেন। ঐসব আত্মজ্ঞানীর বড় পছন্দদায়ক। উহা ভিন্ন (চিত্ত নিরোধ ভিন্ন) কাহারও কখনও স্বরূপ দর্শন হয় নাই কিন্তু সেই বাহ্য নিরোধ আত্মপ্রাপ্তির কারণ নহে। কারণ আত্মা প্রাপ্তই আছে অর্থাৎ নিত্য-প্রাপ্ত। যদি উহা প্রাপ্তব্য বস্তু হইত ত উহা কি করিয়া আত্মা হইবে ? আর যিনি আত্মাই হন তাহা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে ? আত্মা সর্ব্বদা অপ্রাপ্য—উহার প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব নহে। যাহা পাওয়া যায় নাই তাহাকেই পাওয়া যাইতে পারে ; প্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ফের কি করিয়া হইবে ? এইজন্য আত্মার প্রাপ্তি অসম্ভব। মনের নিরোধ উহাকে পাইবার জন্য একেবারেই করিতে হয় না। উদাহরণার্থ, অন্ধকারে কোন বস্তু দেখা যায় না কিন্তু দিয়াসলই আদিদ্বারা অন্ধকার নিবারণ হইবার পর সেই বস্তু পুনরায় নূতনের মত প্রাপ্ত হয়, অথবা—যদি কাহার চিত্ত লক্ষ্যতে না থাকে ত উহা কোথাও রক্ষিত সুবর্ণের বিস্মরণ হইয়া যায়। পুনরায় মনের অন্য চিন্তাকে দূর করিয়া, সম্পূর্ণ ধ্যান করিয়া একাগ্রের সহিত খুঁজিলে সেই নষ্ট (বিস্মৃত) সুবর্ণ উহার পুনরায় প্রাপ্ত হয়। কথা এই যে অন্য চিন্তাকে দূর করা যেমন সুবর্ণপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ নহে সেইরূপ বাহ্য পদার্থের নিরোধ করা আত্মপ্রাপ্তির মূল কারণ নহে ; আপনি আত্মাকে চিনিতে পারেন নাই ইহার কারণ

ইহা নহে যে উহা পান নাই ; কিন্তু কারণ এই ছিল যে আপনি তাহাকে চিনিতেন না। যেমন কোন মানুষ্য রাত্রে রাজ সভায় গিয়া উহা সব সভাসদকে দেখে তথায়—প্রজ্বলিত দীপকেও সে দেখে। সে ইহা জানেও না যে প্রকাশ কি ? অতএব সে ইহা জানিতে পারিল না যে সভায় উজ্জ্বল (আলো) কোথা হইতে হইতেছে। এইরূপ দশা আপনারও হইয়াছে। নিরোধ করিবার পরে আপনি অন্ধকার দেখিলেন ঐ অন্ধকারকে দেখিবার আগে আর নিরোধ করিবার পর মধ্যকালে আপনার যে কিছু অবস্থা হইয়াছিল সেই অবস্থার ধ্যান সদাই করুণ—উহা আপনার স্বরূপ। উহা পরমানন্দদায়ক ভাব হয়। ঐ স্থানে সব বহির্মুখ লোক মহামোহগ্রস্থ হইয়া যায়। খোঁজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া যায় কিন্তু স্বয়ং ঐ পদে পৌঁছিতে পারে না। সংসারে বহু শাস্ত্রবেত্তা বুদ্ধিমান, আর তর্কনিপুণ মনুষ্য আছে কিন্তু এই স্বরূপের জ্ঞান না হইবার জন্য তাহারা রাতদিন দুঃখ ভোগ করে। শব্দের অর্থজ্ঞান হইবার পরও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যতক্ষণ কোন পণ্ডিত উহার খোঁজ করিতে থাকেন অথবা উহার সম্বন্ধে বিচার করিতে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝা উচিত যে সে সেই পদ প্রাপ্ত হয় নাই কারণ উহা (পরমপদ) গ্রাহ্য নহে ; কোথাও দূরে গিয়াও পাইবার যোগ্য নহে কোন স্থানে অর্থাৎ সব স্থানে উহা সদাই প্রাপ্ত। উহা বিচারের দ্বারা জানা যায় না ; যখন বিচার বন্ধ হয় সেই সময়েই উহা প্রকাশিত হন। কিন্তু দুই অবস্থাতেই (বিচারের সময় ও বিচার বন্ধের সময়) উহা স্বরূপেই স্থিত থাকেন। দৌড়াইলে যেমন নিজ

মাথার ছায়া হাতদিয়া ধরা যায় না সেইরূপ কোন ক্রিয়ার দ্বারা উঁহাকে মিলে না। সম্মুখবর্ত্তী দর্পনে প্রতিফলিত অনেক প্রতিবিম্বকে ত অনেক বালকও দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ দর্পণকে সে দেখিতে পারে না। এইরূপ সকল মনুষ্য আত্মরূপী দর্পনে প্রতিবিম্বিত সংসারচিত্রকে অবলোকন করিতে থাকিলেও কেবল পরিচয় নাই বলিয়া আত্মাকে জানিতে পারে না। আকাশের পরিচয় না থাকায় জন্য মনুষ্য আকাশস্থিত এই জগত পদার্থকে প্রত্যক্ষ করে কিন্তু সে জানে না যে আকাশ কিরূপ। আত্মস্বরূপেরও এইরূপ দশা। নাথ, আপনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করুন। এই সারা সংসার জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই দুই পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুই এর মধ্যে জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব স্বয়ং সিদ্ধ। যদি উহা (জ্ঞান) না থাকেত কিছুই থাকে না। সব প্রমাণের উহাই আধার হয়। অর্থাৎ উহা স্বয়ংই আছে। উহার জন্য অন্য প্রমাণ নাই। উহার প্রমাণের আবশ্যকতাও নাই আর এইজন্যই উহা সর্বপ্রথম সিদ্ধ হয়। উহার সিদ্ধি ঐরূপ নহে যে এক অমুক সাধন ও জ্ঞানে উহার সিদ্ধি করে যদি আপনি বলেন যে 'ফের জ্ঞান আছে ইহা কি প্রকারে কহা যায়?" তাহা হইলে তাহার উত্তর এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে যে বস্তুতঃ জ্ঞানই যদি না হয় ত উহার আক্ষেপ ও প্রত্যুত্তর কিরূপে হইবে? অর্থাৎ আক্ষেপ করা সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ জ্ঞানের অভাব হওয়াও সম্ভব নহে। কোনও বড় দর্পনের ন্যায় উহার (জ্ঞানের) স্বরূপ। দর্পনের প্রতিবিম্বের মত এই সব জগত উহার উপরেই ভাসিত হইতেছে। উহাতে দেশকালের কোনও মর্য্যাদা নাই। এই দুই

অর্থাৎ দেশ ও কাল উভয়েই উহার ভিতরে ভাসিত হয়। অত-এব উহার উপর ইহাদের মর্য্যাদা কি করিয়া হইবে? উহা জ্ঞান বলিলে যে সীমাবদ্ধতা আসে উহা, আকাশস্থিত বস্তুর স্বয়ং আকাশকে ব্যাপ্ত করার মত, আভাস হয়; বস্তুতঃ নাই। আপনি সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বিচার করুণ—আপনার ও স্বরূপ এইরূপ। এইরূপ সর্ব্বসামান্য জ্ঞানের উপর—চৈতণ্যের উপর—এই জগত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহা হইতে একরূপতার অর্থাৎ সর্ব্বসামান্য জ্ঞান যে এক বহু নহে এবং তাহাই জগৎ অর্থাৎ দর্পণই প্রতিবিম্ব অথবা দৃকই দৃশ্য এইরূপ অনুভব করিলে ঐ অনুভব সহজসিদ্ধ করিয়া লইলে অর্থাৎ সেই অনুভব স্বাভাবিক হইলে বুঝা উচিত যে মনুষ্যের সব কিছু পাওয়া হইয়াছে। এখন আমি আপনাকে উহাকে খুজিবার স্থান বলিতেছি যাহাতে আপনার ঐ পদ মিলিতে পারে। (১) নিদ্রাও জাগরণেও মধ্য অবস্থায় অথরা (২) এক বস্তুর আকার ছাড়িয়া চিত্ত অন্য বস্তুর উপর যাইবার আগে অথবা (৩) হৃদয়ের বৃত্তি কোন পদার্থ-উপর যখন পৌছানর মত হয় (অর্থাৎ পৌছানর পূর্ব্বে-ক্ষণে) তখন ঐ সময় যে স্থিতি থাকে উহা সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা আপনার ধ্যানে লউন। ইহাই পরমপদ আর ইহা আত্মস্বরূপ হয়। ইহাকে পাইলে আর মোহ হয় না, ইহার জ্ঞান না হওয়ার জন্যই এই জগৎ এত বিস্তৃত হইয়াছে। প্রাণনাথ, এই আত্মস্বরূপে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ অথবা শব্দ কিছু নাই। তথায় দুঃখও নাই আর সুখ ও নাই। উহা এই সবের আধার; উহাই এই সব রূপে প্রকট হইতেছেন অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে ইহা সর্ব্বদা উহাতে নাই। ইহাই

সর্ব্বেশ্বর। উঁহাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহাদেব হন। চিত্তকে স্থির করিয়া কেবল সৎরূপ আত্মাদ্বারাই আত্মাকে দেখুন। চিত্ত হইতে দৃশ্যকে বাহির করিয়া, অন্তর্মুখ করিয়া 'এখন আমি দেখিতেছি' এই অভিনয়কে বা অভিমানকে ছাড়িয়া, একেবারে নিশ্চল হইয়া, দেখা না দেখার দুই ভাবনাকে ত্যাগ করিয়া দেখুন ; তখন যা শেষ থাকিবে উঁহাই আপনার স্বরূপ হয়। বিলম্ব না করিয়া সেই অবস্থা সেবন করুণ।"

হেমলেখা এইরূপ বলিবার পর হেমচূড়ের আত্মপদের অনুভব সামান্য বিচারেই হইল। উঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইল আর শরীর তথা বাহ্য জগতের সম্পূর্ণ বিস্মরণ হইল।

দশম প্রকরণ

সকলেই তত্ত্ব জ্ঞানী হইয়া গেল।

এবং তত্র নরা নার্য্যো দাশদাস্য নটা বিটাঃ॥
সর্ব্বে বেদিত বেদান্তে বিশাল নগরেহ্ ভবন্॥ ৫৯॥

হেমচূড়ের পরমাত্মস্থিতি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া হেমলেখা উঁহার সমাধি ভঙ্গ না করিয়া উঁহাকে সেই স্থিতিতে থাকিতে দিলেন। এক সময় তিনি চক্ষু মেলিয়া আর সাবধান হইয়া নিজ স্ত্রী তথা এই বাহ্য জগত

কে অবলোকন করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই উহার সমাধিতে থাকিবার ইচ্ছা হইল আর চক্ষু বন্ধ করিতে লাগিলেন। উহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া আর তাহার হাত নিজ হস্তে রাখিয়া হেমলেখা কহিতে লাগিলেন—"মহারাজ, কি অভিপ্রায় করিয়াছেন? আমার ত তাহা বোধ গম্য হইতেছে না। ভাল, বলুন ত? চক্ষু বুদিলে বা খুলিলে আপনার কি লাভ, অথবা কি ক্ষতি হইতেছে? উহা খুলিয়া রাখিলে কি চলিয়া যায় আর বন্ধ হইলে কি মিলে? আমি জানতে চাই আপনার কি ভাবনা আছে?"

রাজপুত্রের বলিবার ইচ্ছা ছিল না। উহার কিছু আলস্য হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছিল। তথাপি তিনি কহিতে লাগলেন—"প্রিয়ে, বহুদিন ধরিয়া ও বহুপরিশ্রমে আজ আমি এই বিশ্রান্তির স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। দুঃখে ভরা এই বাহ্য রুক্ষ জগতে বিশ্রামের স্থান কোথায়? আমি বুঝিতে পারিতেছি যে নীরস ছোবড়ার ন্যায় এই বাহ্য ব্যবহারের আমার কোন আবশ্যকতা নাই। দুর্দৈববশে আজ পর্য্যন্ত আমার আত্মাস্থিতির এই সুন্দর সুখ প্রপ্ত হয় নাই। আপনার ঘরের ধন না জানিবার কারণ মনুষ্য ভিক্ষুক হইয়া ভিক্ষা করিতেছে। এইরূপ আমি স্বসুখের সমুদ্রকে না জানিয়া দুঃখ-সমুদ্রে ভরা এই বিষয় সুখকে শ্রেষ্ঠ বুঝিতে ছিলাম। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এই বিষয় সুখকে আমার স্থির (নিত্য) বলিয়া বোধ হইতেছিল। উহার পশ্চাতে দৌড়াইয়া আমায় বহুদুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। শান্তি অল্প ও মিলে নাই। আহা! লোকের সুখ দুঃখের বিচার পূর্ব্বক জ্ঞান একেবারে নাই। সুখের ইচ্ছা

করে আর সদাই রাশি রাশি দুঃখ পায়। প্রিয়ে, এখন আমার সে সময় চলিয়া গিয়াছে যে চেষ্টা করিলেও আমার দুঃখ ভোগ করিতে হইত। তুমি আমার প্রতি কৃপা কর, আমি হাত জোড় করিতেছি। আমার সুখময় আত্মস্থানে চিরকালীন বিশ্রান্তি পাইবার উৎকণ্ঠা বা আকাঙ্খা হইয়াছে। আহা! তুই ত অভাগী! তুই এই পরমপদ জানিস্ কিন্তু ইহা ছাড়িয়া পাগলার মত দুঃখের জন্য কেন প্রযত্ন করিতেছিস্?”

ইহা শুনিয়া সেই চতুরা স্ত্রী রহস্যের ছলে কহিতে লাগিলেন—‘প্রাণনাথ, দুঃখের বিষয় যে আপনি সেই পরম পাবনপদকে এখনও জানেন নাই। যেখানে যাইলে অন্তঃকরণ পুরাপুরি খুলিয়া যায় আর পুনরায় মোহ হয় না সেই স্থান আপনার জন্য এখন সেইরূপই দূরে রহিয়াছে যেমন পৃথিবীর মনুষ্যের জন্য আকাশ বহুদূরে থাকে। আপনি যাহা কিছু ঠিক ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছেন সেই বুঝাও না বুঝার সমান। সেই স্থান কি চক্ষু বুজিলে বা খুলিলে দেখা যায়? কিছু কার্য্য করিলে অথবা কিছু কার্য্য না করিলে সেই পদ কাহারও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কাহার যাওয়া বন্ধ করিলে অথবা কোথাও চলিয়া গেলে সেই স্থান মিলে না। চক্ষু বন্ধ করিলে, কিছু ক্রিয়া করিলে অথবা কোথাও যাইয়া কিছু পাইলে উহাকে পূর্ণ কি করিয়া বলা যায়? চাউলের চার দানার সমান আকার যে পলকের আছে উহা খুলিলে যদি তাহা অন্তর্ধান হয় ত সে বড় ভাল পূর্ণ পদ হইবে? উহাকে পূর্ণ কি করিয়া বলা যায়? বাহবা! রাজকুমার, ইহা কিরূপ স্নেহ, ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যের কথা? যাঁহার এক কোনে,

কোটি ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে সেই আত্মস্বরূপ এই ছোট পলক খুলিলে লুপ্ত হইয়া যায় কি ? রাজন্ আমি এইসবের সার বলিতেছি, ঠিক ঠিক শুনুন। যতক্ষণ না হৃদয় গ্রন্থি খোলে ততক্ষণ সুখ পাওয়া যায় না। মোহ নামক রজ্জুতে কোটী হৃদয় গ্রন্থি তৈরী হইয়াছে। স্বরূপের অজ্ঞানই মোহরজ্জু। উহাতে বিপরীত গ্রহাত্মক বহু গ্রন্থি আছে। উহার মধ্যে প্রথম গ্রন্থি 'দেহাদিতে আত্মত্ব নিশ্চয় হওয়া' (অর্থাৎ আমি দেহ এইরূপ নিশ্চয় হওয়া)। ইহার জন্য এই সংসার এত বড় ও অনিবার্য্য হইয়াছে অর্থাৎ নিবারণ করা যায় না। 'কেবল ভাসমান জগতে আত্মা নাই' এই কথা নিশ্চয় হওয়া দ্বিতীয় গ্রন্থি। এইরূপ জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন বুঝা অথবা জীবে জীবে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বুঝাই সব গ্রন্থি হয়। এই স্বরূপের অজ্ঞান অনাদি কালে উৎপন্ন আর পৃথক পৃথক হইয়া গ্রন্থিরূপ হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য পুরুষ বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থি খুলিলেই বন্ধন মুক্ত হওয়া যায়। চক্ষু বন্ধ করিয়া সেই পদ পাওয়ার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিন। সেই পদ অর্থাৎ আপনার নিজস্বরূপ সব আকারের নিরসন করিবার পর শেষ যাহা বাকী থাকে সেইশুদ্ধ সংবিদই হয়। সেই এই সংসার—চিত্র দেখাইবার দর্পণ। ভাল, আপনি এখন বলুন ত যে উঁহা কোথায় ও কোনরূপে নাই ? যদি আপনি বলেন যে আত্মসংবিদ্ অমুক সময় অমুক স্থানে অমুকরূপে নাই তাহা হইলে ঐ দেশ ও কাল বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় মিথ্যা হইবে। ইহা সেইরূপেই অসম্ভব যেমন বিনা আদর্শে প্রতিবিম্ব থাকা। সারাংশ এই যে, সেই সংবিদের অভাবে কোথায় কিছুও নাই। তাহা হইলে ফের আপনার চক্ষু খুলিলে

উহা লুপ্ত কি করিয়া হইবে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে এই দৃঢ় গাঁট আছে যে 'আমি উহাকে জানিতেছি' ততক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝা উচিত যে সেই পদ প্রাপ্তই হয় নাই; অথবা যদি প্রাপ্ত হইয়া গিয়া থাকে ত সেই পদ হইবে না। যে পদ আপনার চক্ষু বন্ধ করিলে বা খুলিলে প্রাপ্ত হয় সে পূর্ণ পদ নহে কারণ আপনি উহাকে কাল ক্রিয়াদির মর্য্যাদাতে বাঁধিতেছেন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ করিতেছেন। রাজপুত্র, ভাল, দেখুন, কালাগ্নির সমান এই মহাসংবিদ্ কোথায় নাই? অনেক কল্পনারূপী ইন্ধনরাশিকে ইহা অগ্নির ন্যায় আত্মরূপ করিয়া দেয়। সেই পরমপদকে জানিবার পর আপনার জন্য নেত্রোন্মীলনাদি কোনও কর্ত্তব্য থাকিবে না। আপনি নিজ হৃদয়ের এই গ্রন্থিকে ভাঙ্গিয়া ফেলুন যে "আমি মন নিরোধ করিয়া উহাকে দেখিতেছি।" এই ভাবকে নির্মূল করিয়া দেন যে এই জগত আত্মরূপ নহে—কিন্তু কিছু অন্য হইবে। চারিদিকে অখণ্ড আনন্দব্যাপ্ত আত্মরূপকে দেখুন। এই দেখা শিখুন যে দর্পনে প্রতিবিম্বের মত সব লোক আত্মস্বরূপে ভাসিত হইতেছে, এই ভাবনাকেও পুনরায় জাগ্রত হইতে দিবেন না যে "আমি সর্ব্বত্র আত্মরূপ দেখিতেছি—সামান্য চৈতন্যে মিলিয়া স্বরূপে নিমগ্ন হউন।"

এই কথা শুনিয়া হেমচূড়ের অন্তঃকরণ শীতল হইয়া গেল। উঁহার সব ভ্রান্তি দূর হইয়া গেল। তিনি পূর্ণ আত্মস্বরূপকে বুঝিয়া লইয়া ক্রমে পূর্ণ তদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর পৃথিবীতে থাকিয়া হেমলেখাদি স্ত্রীর সহিত

খুব বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি বড় বিস্তৃত রাজ্য-চালান ও প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া শত্রুকেও জয় করিলেন। নিজে বহুশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া লোককে শুনাইবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া তিনি অশ্বমেধ, রাজসূয়াদি মুখ্য যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে তিনি দুই অযুত বৎসর জীবন্মুক্ত অবস্থার অনুভব করিতে লাগিলেন। হেমচূড়ের জীবনমুক্ত দশায় বিহার করিতে দেখিয়া রাজা মুক্তচূড় আর উহার ভ্রাতা মনিচূড় বিচার করিল যে এই হেমচূড়কে পূর্ব্বের ন্যায় এখন কেন দেখিতেছি না। ইনি সুখে অতিশয় আনন্দিত আর দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না। ইহার লাভ লোসকান, শত্রু মিত্র সমান বোধ হইতেছে। ইহা কিরূপে হইল? ইনি রাজকার্য্যকেও নাটকের পাত্রের মত (অভিনেত্রীর মত) কেবল লীলায় দেখিতেছেন। সদাই নিজানন্দে তন্ময় দেখাইতেছে। বোধ হয় যেন ইহার মন সদা কোথাও অন্য স্থানে থাকে। কিন্তু ইনি সব কার্য্য করেন। এইরূপ কি করিয়া হইল? এইরূপ বিচার করিয়া উহারা উভয়ে একান্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিল ও প্রশ্ন করিল, "হেমচূড়, তোমার এইরূপ অবস্থা কি করিয়া প্রাপ্ত হইলে?" হেমচূড় উহাদের উভয়কে সক্রমে আত্মস্থিতির মর্ম্ম (তথ্য) বুঝাইয়া দিলেন। বুঝিবার পর পিতা-পুত্র উভয়ে পরমপদ প্রাপ্ত করিয়া আর তাহারা জীবনমুক্ত স্থিতিতে পৌঁছিয়া গেলেন। পুনরায় প্রধান মন্ত্রীও রাজার নিকট হইতে সংসারের রহস্য বুঝিয়া আত্মতত্ত্বের বিচার করিয়া সেও জ্ঞানী হইয়া গেল! এইরূপে সেই

বিশাল নগরে পরস্পর এক অন্যের উপদেশে ক্রমে ক্রমে সকলেই এই তত্ত্বকে জানিল। তথায় স্ত্রী-পুরুষ, বালকবৃদ্ধ, দাসদাসী এমন কি কৃষক পর্য্যন্ত জ্ঞানী হইয়া গেল। সকলের শরীর সম্বন্ধে অহং ভাব অর্থাৎ "শরীরই আমি" এই ভাব নষ্ট হইয়া গেল। কাহারও কাম ক্রোধ আর লোভ সীমার বাহিরে থাকিল না। সকলে কাম ক্রোধকে জয় করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিল। মাতা বালকের সহিত খেলা খেলিবার সময় খেলারচ্ছলে ব্রহ্মের কথা বলিতে লাগিলেন। দাসদাসী প্রভু সেবা করিবার সময় স্বতঃই ব্রহ্ম বিচারের কথা কহিতে লাগিল। নাট্যাকার তাত্ত্বিক পুর্ণ নাটক রচনা করিতে লাগিল। গায়ক ব্রহ্ম বোধের বিবেক-পূর্ণ গান গাইতে লাগিল। বিদূষক লোক ব্যবহারকে উপহাস করিতে লাগিল। শাস্ত্রী লোক শিষ্যকে আত্মতত্ত্বপূর্ণ বিচার আর উদাহরণে ভরা শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। তথায় স্ত্রী, পুরুষ, নাট্যাকার সিপাই সর্দ্দার, মন্ত্রীগণ, কারিগর, বেশ্যা, সকল লোক ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া গেল। উহাদের ব্যবহার প্রাক্তন্ সংস্কারে চলিতে লাগিল কেহই এই কথা স্মরণ রাখে না যে অমুক কাজ হইয়া গিয়াছে তাহা শুভ কি অশুভ। কেউ এই কথায় মন দেয় না যে আগামী ঘটনায় সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে। সব বর্ত্তমানকালে হাসিতেছে, আনন্দ করিতেছে, অথবা প্রসঙ্গবশতঃ! (প্রয়োজনে) খেদ অথবা ক্রোধ করিতেছে। এই রকমে সব লোক মৌমাছির ন্যায় নিত্য ব্যবহার করিতে লাগিল অর্থাৎ মৌমাছি যেমন নিত্য মধু সঞ্চয় করিয়া ব্যবহার করে সেইরূপ তাহারা নিত্য বর্ত্তমানকালে

স্বস্বরূপানন্দরূপ মধু পান করিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎকালে ঘটনাবলীতে উদাসীনবৎ ব্যবহার করিতে লাগিল।"

দত্তাত্রেয় আরও বর্ণনা করিতে লাগিলেন:—"পরশুরাম, সেখানের তোতা পাখীও খাঁচার ভিতর হইতে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতেছে। আমি তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছি (চার প্রকরণে দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গবশে তথায় যাইয়া আর উহার বাণী শুনিয়া সনকাদি ঋষিরা ঐ নগরের 'বিদ্যানগর' নাম রাখিয়াছিলেন।

এইরূপে হেমলেখার দ্বারা প্রবোধ প্রাপ্ত হইবার পর রাজা হেমচূড় জীবনমুক্ত তত্ত্বাবেত্তা হইয়া গেলেন। সারাংশ, পরমকল্যাণের প্রথম সাধন সৎসঙ্গ। যাঁহার পরম কল্যাণের ইচ্ছা হইবে তাঁহার সন্তের সহবাস করা উচিত।

একাদশ প্রকরণ

সংসার মীমাংসা।

স্বতো ন ভাসতে ক্বাপি ভাসতে চিৎসমাশ্রয়াৎ ॥
অতো জগৎ স্যাদাদর্শপ্রতিবিম্ববৎ সুসংমিতম্ ॥৬১॥

এইরূপ হেমচূড়ের অদ্ভুত কথা শুনিবার পর পরশুরামের কিছু সংশয় হইল। তিনি শ্রীগুরুকে বলিতে লাগিলেন:—

ভগবন, আপনি এই যে অদ্ভুত জ্ঞান বলিয়াছেন উহা আমার বড় বিচিত্র ও বিশেষতঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনার কথা অনুসারে এই দৃশ্য জগৎ কেবল চৈতন্যস্বরূপই কি করিয়া হইতে পারে? প্রত্যক্ষ দেখিলে ইহা ঐরূপ বোধ হয় না; হাঁ, "আপনার কথায়' শ্রদ্ধা করিলে উহা ঐরূপই মানা যাইতে পারে। কারণ, চৈত্য-পদার্থ (অর্থাৎ চেতনের বিষয়) হইতে চৈতন্য ভিন্ন রীতিতে কখনও অনুভবে আসিতে পারে না। বিষয়হীন চৈতন্য কখনও অনুভবে আসে না। ইহা সুসঙ্গত বলিয়া সম্পূর্ণ বুঝা যায় না, তা হইলে ইহা ফের মনে কি করিয়া বসিবে? (অর্থাৎ মনে কি করিয়া সংস্কার উৎপাদন করিবে) এই জন্য আপনি দয়া করিয়া সংশয়কে ছেদন করুন আর বুঝাইয়া দিন।"

শ্রীদত্তাত্রেয় পরশুরামকে বলিতে লাগিলেন:—"পরশুরাম, শুন, তোমায় দৃশ্যের তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। এই সারা দৃশ্য জগত কেবল দৃক্ মাত্র হয়—অন্য কিছু নাই। আমি উহার (দৃশ্যের) উৎপত্তি বলিতেছি। তুমি একাগ্রচিত্তে শুন। এই দৃশ্য জগত এক কার্য্য হয়। ইহার কারণ উৎপত্তি হইলে মিলে। উৎপত্তির অর্থ হয় নূতনতার সহিত ভাসিত হওয়া এইরূপ দেখিলে সংসার প্রত্যেক ক্ষণে নূতনরূপে ভাসমান হয়। কেউ কেউ বলেন যে সংসার প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তিতশীল (পরিবর্ত্তনশীল) কিন্তু নদীর ন্যায় প্রবাহরূপে নিত্য স্থায়ী। কেউ কেউ সংসার স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সমুদয়ে জন্মিয়াছে বলেন। যাহা কিছুই

হউক ইহা সত্য যে উহা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বলা ঠিক হইবে না যে উহা বিনা কারণে আপনা আপনি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ যদি আপনা আপনি উৎপন্ন হইত তাহা হইলে ঘড়া ঘড়াই কেন হয়, ঘড়া বস্ত্র কেন হয় না? এই নিয়মানুবর্ত্তীতা স্বতঃই নিজে নিজে কি করিয়া থাকিতে পারে? আর যদি এইরূপ নিয়মানুবর্ত্তীতা অর্থাৎ কার্য্য থাকিলে তাহার কারণ থাকিবেই এই নিয়ম না থাকিত তাহা হইলে ব্যবহার কিরূপে হইত? ইহা ভিন্ন কার্য্য কারণের সম্বন্ধ সব জায়গায় পাওয়া যায়—যোগ্য সামগ্রী থাকিলে কার্য্য হয় আর কিছু কম থাকিলে কার্য্য হয় না। অতএব সংসার স্বভাবতঃ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। ইহাও অনুভবের কথা যে যে কার্য্য যেরূপে করা যায় তাহা সেইরূপেই সফল হয়। তাহা হইলে পুনরায় এইরূপ কি করিয়া বলা যায় যে সংসার আপনা-আপনিই উৎপন্ন হয়েছে? এখন যদি সংসারের কারণ না দেখা যায় ত ইহা হইতে ইহা বলা যায় না যে উহার কোন কারণ নাই। অনেক বিষয়ে যে ন্যায় উপযোগী হয় উহা স্বীকার এখানেও করিতে হইবে। কয়েকবার কার্য্যের মূলে কারণ দেখা যায় আর যদি কখনও কোন কারণে দেখা না যায় ত উহার (কারণের) থাকা মানা উচিত। নতুবা সব লোক ব্যবহার বিরোধ হইবে। তাৎপর্য্য এই যে সবই সকারণ হয়। এই জন্যই যখন কিছু কার্য্য করিতে যায় তখনই লোকেরা উহার (কার্য্যের) সাধন একত্রিত করিতে লাগে। সব জায়গায়ই ও সদাই এইরূপ হয়। অতএব ইহা ঠিক নহে যে সংসার আপনা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য কেউ, কেউ

বলেন যে, 'এই সংসাররূপী কার্য্য অব্যক্ত জড় পরমাণুদ্বারা হইয়াছে'। কিন্তু সংসার ব্যক্ত হয় অতএব যদি বলা হয় যে উহা হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে ও নাশের অনন্তর সম্পূর্ণ না থাকে যে অব্যক্ত আর জড়পরমাণু হইতে উহা (সংসার) উৎপন্ন হইলে অসৎ ও সতের একতা প্রমাণিত হইবে যাহা পরস্পর বিরোধাত্মক। ইহা কখনও হইতে পারে না যে একই বস্তু কাল হয় আর কাল নাও হয় অর্থাৎ 'আছে ও নাই' ইহারা একস্থানেও একসময়ে থাকিতে পারে না। ইহা বিরুদ্ধ কথা যে প্রকাশই অন্ধকার হয়। ফলতঃ এই মতে 'বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একের উপর আরোপ করিলে সঙ্কর নামক দোষ হয়। এখন যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাদি কারণ মানা যায় তাহা শঙ্কা হয় যে কেবল ইচ্ছায়—অর্থাৎ কার্য্য বিনা—মূল পরমাণুর গতি কি করিয়া উৎপন্ন হয়? পুনরায় যদি এই বলা যায় সংসার গুণ-সাম্যাত্মক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইলে তাহাও অসম্ভব। কারণ প্রকৃতির গুণে প্রথম বিষমতা হইবার কারণ মিলা চাই আর উহার সাম্য হইবার জন্যও কারণ চাই। এইরূপ একটিও কারণ নাই। যখন প্রকৃতি চেতনের অধিষ্ঠান নহে তখন এই জগৎকার্য্য উৎপন্ন কি করিয়া হইতে পারে? এইরূপ হইবার উদাহরণও মিলে না। সারাংশ এই জগৎকার্য্যের কিছুই কারণ পাওয়া যায় না। অতএব এইরূপ অদৃষ্ট বিষয়ে নির্ণয় করিবার জন্য বেদান্তেরই শরণ লওয়া উচিত। অন্য প্রমাণ সুসঙ্গত হয় না। কারণ প্রমাতা জীব স্বয়ং অপূর্ণ হয়; সেইজন্য যোগ্যপ্রমাণ কিরূপে মিলিতে পারে? ইহার অধিক অনুমানে দেখিলেও কোথাও এইরূপ

দেখা যায় না যে কোন কার্য্য কর্ত্তা বিনা স্বয়ং হইয়াছে। ইহাতেও সংসারের কর্ত্তা হওয়া সিদ্ধ হইতেছে। উহার (কর্ত্তার) চেতন হওয়াও সিদ্ধ হইতেছে আর যখন কার্য্য অলৌকিক হয় তখন তাহার কর্ত্তাও সাধারণ কিরূপে হইতে পারে? উহার (কর্ত্তার) শক্তি অবশ্য বিলক্ষণ হয়। এই পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বকে জানিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বাদহীন প্রমাণ বেদেরই হয়। বেদে বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক স্বতন্ত্র মহেশ্বর ছিলেন। তাঁহার নিকটে কিছুও সামগ্রী ছিল না কিন্তু উনি নিজ স্বতন্ত্রতার বলে স্বস্বরূপভূত পটে সংসাররূপী চিত্র আপনার বিলাসের জন্য নির্ম্মাণ করিলেন। যেমন স্বপ্নে অথবা কল্পনায় কোন মনুষ্য দেহ নির্ম্মাণ করে আর উহাকে (দেহকে) আমি মনে করিয়া—উহার দ্বারা ব্যবহার করে সেইরূপ মহেশ্বর স্থূল সংসারকে উৎপন্ন করিয়া উহার উপর 'আমির ভাব' অর্থাৎ সংসারই আমি এই ভাবই রাখেন। পরশুরাম, যেমন তোমার এই স্থূল দেহ, স্বপ্নে লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া তোমার যথার্থ স্বরূপ নহে সেইরূপ প্রলয়কালে সংসারের লোপ হয় বলিয়া সংসার ঈশ্বরের দেহ বলা যায় না। তুমি যেমন দেহাদি হইতে ভিন্ন—কেবল চিন্ময়—হও, সেইরূপ ঈশ্বরও সংসার রহিত, চৈতন্যস্বরূপ আর নির্ব্বিকার হন। উনি এই সংসারচিত্রকে আপনাতেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা হইতে ভিন্ন কেউ কোথাও নাই। অতএব এই চিত্র অন্যের উপরে কিরূপে অঙ্কিত করা যায়। চৈতন্য বিনা কখনও কোথাও কি হইতে পারে? যেখানে চৈতন্য নাই তথায় দেশেরই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যখন এইরূপ

বলা হইবে যে চৈতন্যই নাই তখন উহা অন্য আধারে সিদ্ধ হইতে পারে, সারাংশ এই যে সংসারের গ্রাসক পূর্ণ আর অন্তিম মহাসত্তা চৈতন্যই হন। যেমন সমুদ্র বিনা তরঙ্গ অথবা সূর্য্য বিনা উহার তেজ থাকিতে পারে না সেইরূপ সংবিদ্‌রূপ আত্মা হইতে ভিন্ন সংসারের সত্ত্বা থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে সৃষ্টির প্রারম্ভে এক শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ মহাদেব ভরা (অর্থাৎ ব্যাপক মহাদেব) ছিলেন। আর উহাতেই এই চরাচর সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। এই সংসার উহাতে রহিয়াছে (অর্থাৎ উহাতে স্থিতি) আর অন্তে উহাতে লয় ও হইয়া যায়। ইহাই বেদের আশায়; ইহাতে সংশয় করা উচিত নহে। যেখানে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায় না সেইখানে বেদের প্রমাণকেই সত্য বলিয়া মানা উচিত। বেদ বলিতেছেন এই ঈশ্বর সংসার উৎপত্তির পূর্ব্বে সব সাধন রহিত হইয়া সারা সংসারকে উৎপন্ন করেন। উনি পূর্ণ, স্বতন্ত্র আর অত্যন্ত শুদ্ধ হন। উনি স্বাত্মচৈতন্য দেওয়ালে অখিল সংসারচিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা সম্ভব নহে যে এই সংসারচিত্র অন্য কোন আধারে আছে। কারণ ঈশ্বর পূর্ণব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য স্থানই নাই। অন্যস্থানে সংসারের স্থিতি সিদ্ধ হয় না। অতএব এই কথা যুক্তিসঙ্গত হয় যে আদর্শের প্রতিবিম্বের মত এই সারা সংসার সেই পরমেশ্বরের স্বরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। পরশুরাম, তুমি কি ইহা জান না, যে তোমার স্বপ্নসৃষ্টিতে অনেক জীব, জড়পদার্থ আদি মনেই উৎপন্ন হয়, মনেই থাকে আর অন্তে মনেই লয় হয়? ইহা যেরূপ মনোময় সেইরূপ পরমেশ্বরের সংসার উৎপন্ন হওয়াও মনোময়।

উহা কেবল চৈতন্যস্বরূপ হন। চৈতন্যই সর্ব্বসাক্ষিণী ত্রিপুরা দেবী। উহাতে অনন্তশক্তি একত্রিত আছে। উহা সর্ব্বমর্য্যাদাশূন্য অর্থাৎ পূর্ণ-ব্যাপক। ব্যবহারে মর্য্যাদা (সীমাবদ্ধতা) দুইপ্রকারে—দেশ ও কাল দ্বারা হয়। উহার মধ্যে দেশ আকারাত্মক আর কাল ক্রিয়াত্মক হয় কিন্তু যখন আকার ও ক্রিয়া উভয়েই চৈতন্যের আশ্রয়ে আশ্রিত পদার্থ হয় তখন চৈতন্যের উপর মর্য্যাদার (অর্থাৎ সসীমতার) প্রভাব কি করিয়া বিস্তার করিতে পারে? চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানকলা সব স্থানেই ও সব সময়েই আছেন। যাহার অনুভবই হয় না উহা আছে কিরূপে? পদার্থের হওয়া মানে প্রকাশিত হওয়া চাই, অস্তিত্বই প্রকাশ হয়। প্রকাশই চৈতন্য। প্রকাশের অর্থ ভাণ, অনুভব হয়। ইহাই মুখ্যবস্তু। জড়পদার্থ ইহার সঙ্গতিতে (সহবাসে বা সাহায্যে) প্রকাশিত হইতেছে। জড় স্বয়ং প্রকাশিত হয় ন কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য কাহারও সহায়তা বিনা (নিরপেক্ষ) আপনি (স্বয়ং) প্রকাশিত হন। এখন যদি ইহা বলা যায় যে প্রকাশিত না হইলেও পদার্থের অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে পুনরায় ব্যবহারে "আছে" ও "নাই" এর কোনও অর্থও থাকিবে না। যাহা "নাই" তাহাকেও "আছে" বলিতে হইবে। অস্তিত্ব চৈতন্যেরই প্রকাশ হয়। যেমন আদর্শের অস্তিত্বই প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব হয় সেইরূপ চৈতন্যই সংসারের অস্তিত্ব হন। এইজন্য সারা সংসার চৈতন্যই হন। ইহা সত্য যে সংসারের বিশেষ আকার দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহা (বিশিষ্ট আকারতা) চৈতন্যের অঙ্গভূত, ঘনতা আর নির্ম্মলতার কারণ দেখা যাইতেছে—

আকারের স্বতন্ত্র সত্তার কারণ নাই। যেখানে কোন প্রতিবিম্ব দেখা যায় সেখানে সেই পদার্থের অঙ্গের কঠিনতা আর নির্ম্মলতার কারণেই দেখা যায়। যে ধর্ম্ম যেমন যেমন ন্যূনাধিক থাকে তেমন তেমনই সেই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট দেখায়। দর্পণে এই দুই ধর্ম্ম (কঠিনতা ও নির্ম্মলতা) থাকার জন্য উহাতে সেই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়। জলে নির্ম্মলতা থাকে কিন্তু কঠিনতা কম থাকে অতএব অস্পষ্ট দেখা যায়। আকাশে নির্ম্মলতা আছে কিন্তু কঠিনতা একেবারে নাই বলিয়া উহাতে কোনও প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। আদর্শ জড় হয় আর স্বতন্ত্র নয় বলিয়া এই জন্য উহার উপর প্রতিবিম্ব হইবার জন্য বাহ্য বিম্বের আবশ্যক হয় কিন্তু চৈতন্য পূর্ণ স্বতন্ত্র হন এইজন্য উহার বিম্বের আবশ্যকতা হয় না। চৈতন্যে কোনও মল নাই অতএব উহার নির্ম্মলতা স্বয়ং সিদ্ধ হয়। অন্য পদার্থের মল লাগিতে পারে কিন্তু যখন চৈতন্য একলা (অদ্বিতীয়) অখণ্ডিত হন তখন তাঁহার উপর মল অথবা দোষ লাগার সম্ভব নাই। কিন্তু উঁহার সর্ব্বব্যাপকতার কারণ উঁহার শুদ্ধতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জানা যায়। যে স্বয়ং ভাসিত না হইয়া অন্যের অনুসঙ্গতে (সাহায্যে) ভাসিত হয় উহাকে প্রতিবিম্ব বলা হয়, সংসার এইরূপই কারণ উহা স্বয়ং কখনও ভাসিত হয় না—উহা চৈতন্য, জ্ঞান অথবা অনুভবের আশ্রয়েই ভাসিত হয়। ইহাতে সংসারের তুলনা প্রতিবিম্বতে ভালরূপে করা যাইতে পারে। চৈতন্য দর্পণের মত হয় কারণ যদ্যপি উঁহাতে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র ভাব

দেখা যায় তথাপি দর্পণের মত উহা নিজ স্বরূপ হইতে অল্প ও চ্যুত হয় না ; উহা পুনরায় প্রতিবিম্ব দেখাইবার জন্য সিদ্ধ থাকে। আর দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণ হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপই চিদাত্মার প্রতিবিম্ব (সংসার) ও চিদাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। দর্পণে প্রতিবিম্ব অন্য বিম্বের কারণে .পড়ে কিন্তু চৈতন্যে এই সংসাররূপী প্রতিবিম্ব উঁহারই (চৈতন্যেরই) স্বতন্ত্রতার কারনে পড়ে। পরশুরাম, তুমিও চেতন—তুমি স্বয়ং অনুভব করিয়া দেখ। আপনার সঙ্কল্পের বলে, আপনাতে, কোনও বিম্ব বিনা আর কোনও নিমিত্ত বিনা অনেক প্রকারের ভাব প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই সঙ্কল্পের বলই স্বতন্ত্রতাব স্থূলস্বরূপ হয়। নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় চৈতন্য সম্পূর্ণ স্বচ্ছরূপে থাকেন। শুদ্ধ একরূপী চৈতন্যে যে মহৎ স্বতন্ত্রতা আঁছে উহা যখন সংসারের উৎপত্তির পূর্ব্বে সঙ্কল্পের স্বরূপধারণ করে তখন সেই প্রতিবিম্বাত্মক সংসার ভাসিত হয়। যখন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা হয় উহা (সংসার) চিরস্থায়ী দেখায়, উহা সকলের সদৃশ্য দেখায়। ইহাতে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বতন্ত্রতাই কারণ হয়। জীবের স্বতন্ত্রা সীমাবদ্ধ হয় সেইজন্য জীবের মনোময় সংসার উহার (জীবের) একলা একলাই দেখা যায়। মণি, মন্ত্র, ঔষধ ইত্যাদির সহায়তায় অভ্যাসবশে জীবের অপূর্ণতা যেমন যেমন কম হইতে থাকে তেমন তেমন উঁহার সঙ্কল্পের সামর্থও বাড়ে। উদহরণার্থ ইন্দ্রিয়জাল বিদ্যা দ্বারা কিছুও সামগ্রী না থাকিলেও কেবল সঙ্কল্পবলে সৃষ্টি দেখা যায়। উহা (সঙ্কল্প) সকলে সমান দেখে, স্থির দেখে আর উহাতে সত্যবস্তুর মত ব্যবহার হয়। আর অন্য উদাহরণও লও। যোগীগণের মন

সৃষ্টিকে দেখ। আপনার সঙ্কল্পের বলে অন্যকে উহার স্পষ্ট অনুভব করাইয়া দেয়। উহা অধিকাংশে চিরস্থায়ী থাকে কিন্তু যোগীর শক্তি ও পরিমিত হয় এইজন্য উহার সৃষ্টি বাহ্য পদার্থের উপর স্থাপিত করা যায়। কিন্তু চৈতন্যনাথ পরমাত্মার সামর্থ্য অপরিমিত এজন্য উহার সৃষ্টি তাঁহার স্বতন্ত্ররূপেই প্রকট হয়। সারাংশ এই হয় যে দর্পণ বিনা প্রতিবিম্বের ভিন্ন অস্তিত্ব হইতে পারে না তেমনি চৈতন্য বিনা সংসারের অস্তিত্ব নাই। এই বিচারে সংসার মিথ্যা সিদ্ধ হয়। সত্য যে হয় সে নিজ স্বভাব ছাড়ে না; যে অসত্য হয় সে নিজস্বভাব ত্যাগ করে। পরশুরাম, এই সংসার বড় চঞ্চল অর্থাৎ ক্ষণিক হয়। তুমি দর্পণ আর উহার (দর্পণের) প্রতিবিম্বের মত ইহার স্বরূপের স্পষ্ট বিচার কর। দর্পণ অচল অর্থাৎ স্থির হয়, প্রতিবিম্ব চল বা চঞ্চল হয়। এইরূপ সংসার চঞ্চল হয় আর উহার আধার চৈতন্য স্থির হন। সংসারের সব অবস্থা কালের গতিতে বদলাইয়া যাইতেছে কিন্তু এক সময়ে ও সর্ব্বত্র একরূপে থাকে না। সংসারের সব ভাব অনিশ্চিত হয়। দেখ, সূর্য্যের প্রকাশ সব পদার্থকে প্রকাশিত করিতেছে, কিন্তু ইহা মনুষ্যের বিচার হয় অর্থাৎ মনুষ্যেরাই এইরূপ দেখে। পেঁচাদি দিবান্ধ হয় অতএব উহাদের বিপরিত অন্ধকার বোধ হয় অর্থাৎ সূর্য্যকে অন্ধকার দেখে। অতএব ইহা বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করা যায় না যে ইহা প্রকাশ হয় আর উহা অন্ধকার হয়। এইরূপই বিষকে বুঝ। ইহা কাহারও কাছে বিষ হয় আর অন্য কাহারও কাছে—উহা হইতে উৎপন্ন হয় যে সব

পোকা তাহাদের জন্য—উহা জীবন হয়। অল্পশক্তি মনুষ্যের উহা (বিষ) মৃত্যুর জনক হয় কিন্তু গুহাকাদি যোগীদিগের উহা জীবন নাশ করে না। দেয়াল মানুষকে প্রতিরোধ করে কিন্তু গুহকাদিযোগীকে প্রতিরোধ করে না। কাল ও প্রদেশকে মনুষ্য বড় বিস্তৃত মানে, কিন্তু দেবতাদের ও যোগীদের এইরূপ বুঝায় না। অতএব দর্পণে দেখা যায় যে দৃশ্যের প্রতিভাস যেমন কেবল আদর্শ হয় বলিয়া ব্যর্থ অর্থাৎ অস্থির হয়, সেইরূপ এই সংসারের রূপও বিচার করিলে অস্থির বোধ হইবে। এই জন্যই বলা যায় যে সর্ব্বাশ্রয়ভূত-চৈতন্য বিনা কোনও বাহ্য বস্তু নাই। যাহার অস্তিত্ব বুঝা যাইতেছে সে সব শুদ্ধ চৈতন্যই হয়।

পরশুরাম, এইরূপে সংসার কেবল চৈতন্যরূপই হয়—অন্য কিছু নাই।

দ্বাদশ প্রকরণ

গুহায়

নির্মায় ভাবনাযোগাল্লোকমস্মিন্ মহাশ্মনি ॥
সমুদ্রবলয়াং পৃথ্বীং শাস্তি নিত্যং স্তুতস্ত্বয়ম্ ॥৬৪॥

সংসারের তাত্ত্বিক স্বরূপের এই বর্ণনা শুনিবার পর পরশুরামের

আরো সন্দেহ উৎপন্ন হইল। সে শ্রীদত্তাত্রয়কে বলিতে লাগিল—"ভগবান্, আপনার সংসার সম্বন্ধে বিচারও আমি শুনিয়াছি। উহা ঠিক হয়, উহাতে কিছু দোষ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এই সংসার সত্যের মত কেমনে বোধ হইতেছে? আর অন্য বুদ্ধিমান পুরুষেরও উহাকে (সংসারকে) সত্য কি করিয়া বলিতেছে? আমিও আপনার নিকট শুনিলাম যে সংসার সত্য নহে তথাপি আমার উহা সত্যের মতন কি কারণে বোধ হইতেছে? গুরুবর, আমার সংশয় দূর করুন!" এই প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীগুরু কহিতে লাগিলেন:—"পরশুরাম! শুন, আমি এই ভ্রমের কারণ দেখাইতেছি। উহা বড় পুরাতন হয়। সত্য বস্তু যাহা তাহাকে গ্রহণ না করিয়া উহাকে অন্য কিছু বলিয়া বুঝিয়া লইয়া এবং উহার (আর কিছুর) দৃঢ় ভাবনা করিয়া লওয়াই ঐ ভ্রমের মূল হয়। দেখ, জীব আপনার শুদ্ধস্বরূপকে ভুলিয়া স্থূল শরীরকেই "আমি" বলিতে থাকে কিন্তু যথার্থ দেখিলে মাংস, রক্ত, আর হাড় কোথায় থাকে আর অত্যন্ত নির্ম্মল চিদাত্মা কোথায় থাকিয়া যায়! কিন্তু কেবল দৃঢ় ভাবনা করিয়া লইবার জন্যই আত্মা শরীররূপ হইয়া যান। এই পর্য্যন্ত হয় যে আত্মাকে কেবল চৈতন্যস্বরূপ মানিলেও বার বার শরীর ভ্রম হয়। এইরূপ কেবল দৃঢ় ভাবনার কারণ সংসার সত্য বলিয়া বোধ হয়। যখন ইহার বিপরীত সংসারকে মিথ্যা বলিয়া ভাবনা করিলে তখন ঐ ভ্রম (সত্যত্ব ভ্রম) নিবৃত্ত হয়। যে যেমন ভাবনা করে উহার সংসার সেই সেইরূপেই দেখায়। আমি তোমাকে এই বিষয়ে এক গল্প শুনাইতেছি।

বাংলার সুন্দরপুর নামক এক বড় সহর ছিল। প্রচীনকালে তথায় সুষেণ নামক এক প্রখ্যাত-রাজা ছিল। সে বড় বুদ্ধিমান ছিল। মহাসেন নামে তাহার এক ছোট ভাই ছিল। রাজা সুষেণ এক সময় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিল। সেই সময় সে যজ্ঞের জন্য যে ঘোড়া ছাড়িয়াছিল উহার রক্ষার জন্য উহার পরাক্রমী পুত্র সেনা সহিত ঘোড়ার সঙ্গে ছিল। পথে ঘোড়াকে ধরিবার-জন্য যে যে অসিয়াছিল তাহাদিগকে সেই বলবান রাজপুত্র নিজ পরাক্রমে হারাইয়াছিল। উহা (অশ্ব) আগে চলিতে লাগিল, ইরাবতীর তীরে আসিল। তখন সে তপনিধি রাজর্ষি তঙ্গণকে দেখিল। সে অভিমান বশে তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া—উহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আগে চলিতে লাগল। যখন তঙ্গণের পুত্র দেখিল যে পিতার অপমান হইল তখন উহার ক্রোধ হইল। সে ঘোড়াকে কাড়িয়া লইল আর রাজপুত্রকে কর্কশ বাক্যে ভৎর্সনা করিল। রাজপুত্র চারিদিক হইতে উহার উপর কঠোর আক্রমণ করিল কিন্তু উহা দেখিতে দেখিতে তঙ্গণপুত্র ঘোড়াকে সঙ্গে লইয়া টেক্ড়ীর এক গুহাতে প্রবেশ করিল। রাজকুমার ক্রোধের আবেশে শস্ত্র এরূপ বর্ষণ করিল যে, সেই পাহাড় নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া ফাঁটিয়া গেল। পাহাড় ভাঙ্গিয়া যাইলে সেই তঙ্গণসুত বহু সেনার সহিত বাহিরে আসিয়া রাজকুমারের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজপুত্রের অধিকাংশ সেনা মারা গেল আর বহু পরাজিত হইল। উহাদের বাধিয়া মুনিপুত্র পুনরায় গুহায় চলিয়া গেল। যে সৈনিক বাঁচিয়াছিল সে রাজা

সুষেণের নিকট যাইয়া সব কথা বলিল। রাজা বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ নিজ ভাইকে কহিল:—"বৎস তুমি তঙ্গণমুনির আশ্রমে যাও। তপস্বীর বড় সামর্থ হয়। মুনিকে প্রসন্ন করিয়া যজ্ঞের ঘোড়াকে ও পুত্রকে লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। এই বসন্তকালেই যজ্ঞ করা উচিত ইহা অমনি না চলিয়া যায়। তপস্বীর সহিত দাঙ্গা করিলে কাজ সফল হইবে না। ক্রুদ্ধ হইলে সে এক্ষণেই সংসার ভস্ম করিয়া দিবে। উঁহাকে প্রসন্ন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে।"

রাজাজ্ঞা পাইয়া মহাসেন তঙ্গণমুনির আশ্রমে পৌঁছায়। মুনি সমাধিস্থ চিলেন। উঁহার শরীর কাঠের মত হইয়াগিয়াছে। মন আর সব ইন্দ্রিয় শান্ত ছিল। উঁহার অহংভাব নির্ব্বিকল্পদশার অপার সমুদ্রে লীন হইয়া গিয়াছিল। উঁহাকে দেখিয়াই মহাসেন আদরপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া এবং জোড়হাতে স্তুতি করিয়া সেই মুনীশ্বরকে প্রসন্ন করিবার প্রযত্ন করিতে লাগিল। স্তুতি করিতে করিতে তিন দিন কাটিয়া গেল। পিতার প্রতি স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া পুত্র বাহিরে আসিয়া মহাসেনকে বলিতে লাগিল:—"রাজা, তোমার স্তুতিতে আমার বড় সন্তোষ হইয়াছে। তোমার মনোরথ বল, আমি তাহা শীঘ্র পূরণ করিব। আমি এই মহামুনির পুত্র। এখন আমার পিতার কথা কহিবার সময় হয় নাই। ইহার অন্তঃকরণ সমাধিতে লীন এবং বার বৎসর সমাধিতে থাকিবেন। পাঁচ বৎসর হইয়া গিয়াছে, সাত বৎসর আরো বাকী আছে। উনি এই সব কথার ইঙ্গিত প্রথমেই

করিয়াছেন। আমাকে বল তোমার কি চাই, আমি পূরণ করিব। তুমি ইহা মনে করিও না যে আমি ছোট বালক। আমি আমার পিতার সমানই তপস্বী হই, সংসারে তপস্বী পুরুষের কিছুই অসম্ভব নাই।"

এই কথা শুনিয়া মহাসেন মুনিকুমারকে প্রণাম করিল এবং বলিতে লাগিল:—"মুনিপুত্র, আমার ত এই ইচ্ছা যে আপনার পিতা সমাধি হইতে জাগৃত হউন আর আমার সহিত বাক্যালাপ করুন। যদি সত্যই কৃপা করিবেন ত আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিন। রাজার এই কথা শুনিয়া মুনি-পুত্র কহিতে লাগিলেন:—"রাজন, তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করা একেবারে অসম্ভব।

কিন্তু আমি তোমাকে একবার ইচ্ছা পূরণ করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছি অতএব আমি আর না বলিতে পারিব না। তুমি একটু অপেক্ষা কর আমার যোগমার্গের অদ্ভূত সামর্থ্য দেখ। এখন আমার পিতা পরমপাবনপদে বিশ্রান্তি লইতেছেন। তাঁহাকে বাহ্য প্রযত্নের দ্বারা কেহই জাগাইতে পারিবে না। আমি সূক্ষ্ম যোগমার্গে যাইয়া ইহাকে সজাগ করিতেছি, দেখ।" ইহা বলিয়া তিনি তথায় আসন করিয়া ও ইন্দ্রিয়কে পূর্ণ নিরোধ করিলেন। প্রাণবায়ুর সহিত আপান বায়ুর সংযোগ করিয়া সেই মুখ্য প্রাণের দ্বারা বাহিরে আসিয়া আপনার পিতার শরীরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর নিজ পিতার তল্লীন মনকে (ব্রহ্মোলীন মনকে) সমাধান (সজাগ) করিয়া শীঘ্র নিজ শরীরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে সেই মুনি জাগৃত হইলেন। সম্মুখে রাজা নম্রতার সহিত স্তুতি

করিতে লাগিলেন। তিনি যোগদৃষ্টিতে রাজার মনোরথ জানিলেন। উঁহার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া মুনিরাজ নিজপুত্রকে বলিতে লাগিলেন—'বৎস, এইরূপ আর করিও না। ক্রোধ তপের ঘাতক। যখন রাজাই লোকদিগকে রক্ষা করেন—সুব্যবস্থা করেন—তখনই তপস্যা নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়। এজন্য রাজার কার্য্যে বিঘ্ন করা অযোগ্য হয়। উহা (বিঘ্ন করা) দৈত্যেরই স্বভাব মুনির ধর্ম্ম নহে। অতএব রাজদ্বেষ ত্যাগ করিয়া ঘোড়া ও রাজপুত্রকে ইহাকে ফিরাইয়া দাও। ইহাকে শীঘ্র যাইতে দাও তা না হইলে যজ্ঞের সময় অতীত হইবে।" পিতার কথা শুনিয়া মুনিপুত্রের ক্রোধ শান্ত হইয়া গেল। গুহায় যাইয়া সে শীঘ্র ঘোড়া ও রাজপুত্রকে আনিয়া প্রীতিপূর্ব্বক মহাসেনকে সমর্পণ করিল। মহাসেন উহাদের উভয়কে ঘরের দিকে যাইতে আদেশ করিল। তাহার পর সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল :—"ভগবন! পাহাড়ের গর্ভে আমার ভাইপো আর ঘোড়া এতক্ষণ কিরূপে ছিল? আমি এই কথা বুঝিতে চাইতেছি। কৃপা করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিন।"

এইরূপ প্রশ্ন করিলে তঙ্গণমুনি কহিতে লাগিলেন :—"রাজা, শুন! আগে আমি রাজা ছিলাম। বহুবৎসর পর্য্যন্ত আমি এক বিস্তৃত রাজ্য চালাইয়াছিলাম। এক সময় আমার তুর্য্যাত্মক ঈশ্বর-চিৎস্বরূপের জ্ঞান হয়। সুতরাং আমার সব লোক ব্যবহার তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি রাজ্যকে পুত্রের অধীন করিয়া এই বনের আশ্রয় লই। আমার স্ত্রীও সঙ্গে আসিল। তখন হইতে তপস্যা করিতে করিতে অর্ব্বুদ সংবৎসর

অতীত হইয়াছে। আমার সেবা করিয়া আমার স্ত্রীও পূর্ণস্থিতিতে পৌঁছাইল। কিছুদিন পরে এক সময় ভবিষ্যৎকালীন নিয়তির অচিন্ত প্রভাবের কারণ আমার স্ত্রীর সমাধি অবস্থায় হঠাৎ কামেচ্ছা উৎপন্ন হইল। সে কামাতুর হইয়া আমার নিকট আসিল। আমার সহিত সম্ভোগ হইবার পর গর্ভ হইয়া গেল। সময়ে উহার এই ছেলে হইল। ছেলে হইলেই সে তাহাকে আমার কোলে রাখিয়া দিল এবং ইহার পরেই সে প্রাণত্যাগ করিল। এই সব আমার সমাধি অবস্থায় হয়। যখন আমি দেখি যে বালক আমার কোলে বসিয়াছে আর স্ত্রী পরমপদে লীন হইয়া গিয়াছে তখন আমার ছেলের উপর দয়া হইল। আমি উহাকে পোষণ করি। একবার প্রসঙ্গ বশতঃ যখন বালক শুনিল যে আমি রাজ্যও চালাইয়াছি তখন হইতে উহার রাজ্য চালাইবার ইচ্ছা হয়। সে আমার নিকট প্রার্থনা করে, অনন্তর আমার উপদেশে সে উৎকৃষ্ট যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় এখন সে কেবল ভাবনা বলে এই পাহাড়ে এক জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লইল আর সে সব প্রদেশের রাজ কার্য্য করিতেছে। সেই রাজ্যে সে ঘোড়া ও রাজকুমারকে বাধিয়া রাখিয়াছিল।"

এই কথা শুনিয়া মহাসেন কহিতে লাগিল :—"ইহা বড় আশ্চর্য্য। ভগবন্, সেই স্থানকে দেখিবার আমার ইচ্ছা হইয়াছে। কৃপা করিয়া আমায় দেখাইয়া দিন।" এই প্রার্থনা শুনিয়া মুনি নিজপুত্রকে বলিলেন যে এই রাজাকে আপনার রাজ্যবিস্তার সব দেখাইয়া দাও। এই বলিয়া মুনি সমাধি মগ্ন হইয়া গেলেন। উহার পুত্র

রাজাকে লইয়া পাহাড়ে চলিয়া গেল। সে নিজে ভিতরে যাইতে লাগিল কিন্তু রাজা ভিতরে যাইতে সক্ষম হইল না। সে মুনি-পুত্রকে ডাকিল। মুনিপুত্র উহাকে ভিতর হইতে ডাকিতে লাগিল কিন্তু যখন দেখিল যে রাজা ভিতরে আসিতে পারিতেছে না তখন স্বয়ং বাহিরে আসিয়া কহিতে লাগিল :—"রাজা সত্যই তুমি যোগা-ভ্যাসী নহে অতএব তোমার ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব। যোগজ্ঞান বিনা এই পাহাড় প্রত্যেকের জন্য ঘনরূপ—স্থূলরূপ হয়। কিন্তু আমার ত পিতার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। অতএব তোমাকে ভিতরে আসিতেই হইবে। অতএব তুমি আপন স্থূল শরীরকে এই ঘাসের স্তূপের উপর রাখিয়া আর কেবল লিঙ্গদেহ ধারণ করিয়া আমার সহিত ভিতরে চল!" ইহা শুনিয়া রাজা কহিতে লাগিল :— "মুনিপুত্র, দেহ হইতে বাহিরে বাহির হইবার সামর্থ আমার নাই। স্থূল শরীরের ত্যাগ কিরূপে হইবে? শরীরকে পৃথক রাখা কি মরা নহে?"

মুনিপুত্র হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন :—"ওরে, ইহার যোগের জ্ঞান নাই। আচ্ছা, তুমি চোখ বন্ধ কর!" সে চোখ বন্ধ করিলে যোগশক্তিদ্বারা মুনিপুত্র রাজার শরীরে প্রবেশ করিল। উহার লিঙ্গ শরীরকে বাহিরে বাহির করিয়া উহার স্থূল শরীরকে গর্ত্তয় রাখিয়া দিল। সেই লিঙ্গ শরীরের সহিত সে সেই গুহায় প্রবেশ করিল। এই সময় রাজা সাবধান ছিল না, মুনিপুত্র শীঘ্র এক অপর শরীর নির্ম্মাণ করিল আর তাহাকে (রাজাকে) তাহাতে প্রবিষ্ট করাইয়া জাগাইল। জাগিলে সে দেখিল যে মুনিপুত্র

উহাকে লইয়া আকাশে জোরে চলিতেছে। আশপাশে আর উপর নীচে মর্য্যাদারহিত অর্থাৎ অসীম আকাশকে ব্যাপ্ত দেখিয়া সে ভীত হইয়া কহিতে লাগিলঃ—"মুনিপুত্র আমাকে এখানে যেন ছেড়ে দিও না। নতুবা পাড়িয়া আমি চুরমার হইয়া যাইব!"

রাজাকে ভয়াকুল দেখিয়া মুনিপুত্র পরিহাসছলে কহিতে লাগিলঃ—"রাজা, ভয় কোর না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। ধৈর্য্য ধর আর গুহায় আমার নির্ম্মিত সারা প্রদেশকে দেখ।" রাজা ধৈর্য্য ধরিল আর সে দেখিতে লাগিল, উহার দূরের আকাশ বিকট অন্ধকারগ্রস্ত দেখাইল। তখন নক্ষত্র বিদ্যমান ছিল। তাহা হইতে আগে যাইতে যাইতে উহার চন্দ্রমণ্ডল মিলিল। সে ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হইয়া গেল কিন্তু মুনিপুত্র উঁহাকে রক্ষা করিল। আগে সূর্য্যমণ্ডল মিলিল। উহার উষ্ণতায় সে জ্বলিতে লাগিল। পুনরায় যোগের সামর্থ্যে মুনিপুত্র শীতলতা প্রদান করিল। কিছুক্ষণে উহারা উভয়েই মেরুশিখরে পৌঁছায়। রাজা তথায় সব দেখিতে লাগিল। দূরের বস্তু দেখিবার জন্য মুনিপুত্র তাহাকে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক দৃষ্টি দিয়াছিল। ইহার সহায়তায় সে লোকালোক পর্ব্বতের বিস্তৃত প্রদেশকে দেখিল। উহার আগে ঘোর অন্ধকার ছিল ফের সুবর্ণের ভূমি ছিল। অনেক সমুদ্র, নদী আর পর্ব্বতে ভরা সপ্তদ্বীপ, সব ভুবন, ইন্দ্রাদি দেবতা, দৈত্য, মনুষ্য, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নরাদি সব সেই রাজা দেখিতে পাইল। তথায় সত্যলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাসাদি স্থানও ছিল। মুনিপুত্র স্বয়ং বিষ্ণু, মহেশ আর ব্রহ্মাদেবের রূপ ধারণ করিয়া তিন পৃথক পৃথক নামরূপে তথায় নিবাস করিতে

ছিলেন। সেই রাজা মুনিপুত্রের সার্ব্বভৌম শাসনকরিতেও দেখিল।

মুনিপুত্রের এই অদ্ভুত যোগমার্গ দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া গেল। পুনরায় মুনিপুত্র উহাকে কহিতে লাগিলঃ—"মহাসেন, তুমি কি ইহা বুঝিতে পারিয়াছ যে নূতন স্থান দেখিতে দেখিতে কত বর্ষ অতীত হইয়াছে? এখানে এখন একদিনই হইয়াছে, কিন্তু বার অর্ব্বুদ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। চল, এখন আপনার ভূঃদেশে যাই। সেইখানে আমার পিতা আছেন, তথায় যাইয়া দেখি।"

এইরূপ বলিয়া আর রাজাকে সঙ্গে লইয়া মুনিপুত্র তথা হইতে আকাশে উড়িয়া আর দুইজনে আগেকার মত বাহিরে থাকিল।

ত্রয়োদশ প্রকরণ

অদ্ভুত স্বপ্ন।

—০—

তস্মাদিদং দৃশ্যজালং স্বপ্নদৃশ্যসমং স্থিতম্।
দীর্ঘকালোঽপি হি স্বপ্নে ভাসতে নির্বিশেষতঃ॥ ৭৭॥

গুহা হইতে বাহিরে আসিবার সময় রাজাকে নিদ্রিত করিয়া আর উহার লিঙ্গ শরীরকে সঙ্গে লইয়া মুনিপুত্র বাহিরে আসিলেন আর উহার সূক্ষ্ম শরীরকে উহার পূর্ব্ব স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। ফের তিনি সাবধান অর্থাৎ সচেতন করিয়া দিলেন।

জাগিয়া মহাসেনের বাহ্য ভূপ্রদেশ, তথায় ভূমি, ঝাড়, মনুষ্য, নদী, পুষ্করিণী ইত্যাদি সব বস্তুকে সম্পুর্ণ নূতন দেখাইতে লাগিল। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুনিপুত্রকে কহিতে লাগিলঃ—"মহাত্মন্! আপনি আমাকে এই কোন প্রদেশ দেখাইলেন? পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা হইতে ত ইহা ভিন্ন হয়। ইহা কি চমৎকার?"

মুনিপুত্র কহিতে লাগিলেনঃ—"রাজন্, ইহা সেই প্রদেশ যেখানে আমি পূর্ব্বে বাস করিতেছিলাম। বহুদিন অতীত হইবার কারণ ইহার স্বরূপ বদলাইয়া গিয়াছে। পাহাড়ী গুহার প্রদেশে যখন আপনি একদিন কাটান তখন এইখানে বার অর্ব্বুদ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এখানকার আচারপদ্ধতি আর ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সময়ের গতিতে লোকস্থিতি এইরূপই বদলাইয়া যায়। আমি ত এইরূপ কয়েকবার দেখিলাম। দেখ আমার সামর্থ্যবান্ পিতা এখানে সমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তুমি পূর্ব্বে এই স্থানে আমার পিতার স্তুতি করিয়াছিলে। দেখ, ইহা সেই পাহাড়। আমি তোমাকে আমার ভিন্ন সৃষ্টি ইহাতে দেখাইয়াছি। এই সময় পর্য্যন্ত তোমার ভাইয়ের বংশ হাজার ধাপ হইয়াছে। বাঙ্গালায় তোমার সে সুন্দর নগর ছিল তথায় আজ জন্তুতে ভরা জঙ্গল হইয়াছে। তোমার ভাইয়ের বংশে আজকাল বীরবাহু রাজা আছে। সে মালবদেশে ক্ষিপ্রা নদীর তীরে বিশাল নামক নগরে রাজ্য করিতেছে। তাম্রপণী নদীর তীরে বর্দ্ধন নামক নগর উহার রাজধানী। এইরূপে সংসারের স্থিতির সদাই পরিবর্ত্তন হয়। অল্প সময়ে ইহা নূতন জগৎ নির্ম্মিত হইয়া গেল। ভবিষ্যৎকালেও

এইরূপে কিছু সময় অতীত হইলে এই পর্ব্বত, নদী, পুষ্করিণী আর ভূমণ্ডল সব বদলাইয়া যাইবে। সংসারের এই নিয়ম। কালের গতিতে পর্ব্বতের স্থানে সমুদ্র আর সমুদ্রের স্থানে পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়া যায়। শুষ্ক ও নির্জ্জল প্রদেশ জলে ভরিয়া যায়; আর উর্ব্বরা জমি মরুভূমি হইয়া যায়; রত্ন পাথর হইয়া যায় আর কাঁকর রত্ন হইয়া যায়। লোনা জল মিষ্ট হইয়া যায় মিষ্ট লোনা হইয়া যায়; কোথাও মনুষ্যের গোষ্ঠী, কোথাও পশুর সংখ্যা আর ক্রিমি কীটাদিসমূহ বাড়িতেছে। এই রকমে সময় পাইয়া সংসারের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হয়। এই জন্য তুমি এই কথা ঠিক ঠিক স্মরণ রাখ যে আমার পূর্ব্বপ্রদেশেরই এই দশা হইরা গিয়াছে।

মুনিপুত্রের এই কথা শুনিয়া রাজা মহাসেন অত্যন্ত শোকাকুল হইল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। অজ্ঞান হইবার পরেই অতিশয় দুঃখিত হইয়া সে দীন মনুষ্যের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। আপন ভাই উহার পুত্র ও আপন স্ত্রী পুত্রাদিকে স্মরণ করিয়া শোকাভিভূতি হইল। ইহাকে মোহবশে শোক করিতে দেখিয়া মনিপুত্র বুঝাইতে লাগিলেন:— 'রাজা, তুমি বুদ্ধিমান, ফের তুমি কাহার জন্য আর কি বুঝিয়া কাঁদিতেছ? জ্ঞানী পুরুষ নিঃস্ফল (বৃথা) কর্ম্ম কখনও করেন না। যে ফলের বিচার না করিয়া কিছু উদ্যোগ আরম্ভ করে তাহাকে মূর্খ বলা হয়। অতএব তুমি আমাকে বুঝাও যে তুমি কাহার জন্য আর কেন শোক করিতেছ?'

মুনিপুত্রের এই প্রশ্ন শুনিয়া মহাসেন বড় দুঃখের সহিত বলিতে লাগিল:—'মুনি, তুমি কি আমার শোকের কারণ

দেখিতেছ না? সর্ব্বস্ব ডুবিয়া যাইলেও তুমি শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? কোন এক আধজন আত্মীয়ে বিয়োগ হইলেই মনুষ্যের দুঃখ হয় আর আমার সর্ব্বস্ব নাশ হইবার পরেও তুমি আমার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছে। তোমাকে আর কি বলিব?'

মুনিপুত্র হাসিয়া ফেলিল। সে কহিতে লাগিল:—'রাজন্ এই কি তোমার কূল ধর্ম্ম? আমি ত তাহা জানিতাম না। যদি এইরূপই হয় ত শোক করা ঠিকিই হয় নতুবা বড় অনর্থ হইবে। তুমি কি ইহা বুঝিয়াছ যে যাহা কিছু চলিয়া গিয়াছে উহা শোক করিলে পুনয়ায় মিলিবে? ধৈর্য ধরিয়া বিচার কর, যে দুঃখ করিলে এখন আর কি লাভ হইবে। যদি তুমি ইহা বুঝিয়া শোক করিতেছ যে তোমার স্বজন নষ্ট হইয়া গিয়াছে তবে তোমার পূর্ব্বপুরুষাদি কবে মরিয়া গিয়াছে উহাদের জন্য তোমার সদাই শোক করা উচিত, কিন্তু ইহা কি রকম যে এই সময়ের পূর্ব্বে তুমি শোক করিতে ন। আরো আমার বুঝাও যে সে কাহার ভাই ছিল? সে কি তোমার ভাই ছিল? উহার সহিত তোমার বন্ধুতা কি করিয়া হইল? যদি তুমি বল যে উহার আর তোমার বাপ মা একই ছিল তাহা হইলে মাতা পিতার বিষ্ঠার যে ক্রিমি (পোকা) থাকে সেও দেহ সম্বন্ধী হয়, তাহা হইলে সেই ক্রিমি কি তোমার ভাই নহে? তুমি উহার জন্য ত শোক কর না? রাজা প্রথমে তুমি এই কথা বিচার কর যে তুমি স্বয়ং যথার্থ কি হও আর যাহাকে নষ্ট বুঝিয়া তুমি শোক করিতেছ সেই বা কি হয়? তুমি কি শরীরই অথবা শরীর হইতে ভিন্ন কিছু হও? শরীর জড় পদার্থের সমুদয়

(সমষ্টি) হয়। সব সমুদয়ের অথবা উহার কোন অঙ্গের নাশকে নাশ কহিতেছ? ফের দেহের অংশের নাশ ত প্রত্যেক ক্ষণেই হইতেছে। মল, মূত্র, কফ, নখ, চুল আদির সর্ব্বক্ষণ নাশ হইতেছে। অতএব তোমার সদাই কাঁদা উচিত। যদি শরীরের সর্ব্বাংশেরই নাশকে নাশ বল আর তাহার জন্য দুঃখ কর ত সর্ব্বাত্মনা শরীরের নাশ কখনও হয় না। ইহা সত্য যে তোমার ভাইএর শরীরের অংশ মাটি আদি পদার্থরূপে রহিয়াছে। যদি ইহা বল যে উহারও (পৃথ্বি আদি চার ভূতের ও) নাশ হয় ত শেষে অবিনাশী ও শুদ্ধ আকাশ থাকিয়া যায়। কিন্তু এই সব কথা ছাড়িয়া দাও। মুখ্য কথা এই যে তুমি দেহ নহ—কিন্তু দেহী হও। কারণ তুমি যেমন 'ইহা আমার কাপড় হয়' বল সেই রূপই 'ইহা আমার শরীর হয়' বল, তাহা হইলেই বুঝাও তুমি কি করিয়া দেহ হইতে পার? যখন তুমি তোমার দেহ হইতে ভিন্ন হও তখন অন্যের দেহতে তোমার কি সম্বন্ধ? যেমন তোমার ভাইএর কাপড়ে তোমার অল্প ও সম্বন্ধ নাই, সেইরূপই উহার দেহের সহিত ও তোমার কোনও সম্বন্ধ নাই। সেইরূপ বস্ত্র হয় সেইরূপ শরীর হয়। তাহা হইলে উহার শরীর নষ্ট হইয়া যাইবার পর তোমার শোক কেন হইবে? আমার শরীর, আমার প্রাণ, আমার মন ইত্যাদি যে তুমি বল সেই তুমি অর্থাৎ বক্তা তুমি স্বয়ং কি স্বরূপের হও?

মুনিপুত্রের এই কথা শুনিয়া মহাসেন কিছুক্ষণ ধরিয়া বিচার করিতে লাগিল। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর না মিলিবার জন্য

শেষে সে দীনতায় কহিতে লাগিল, 'ভগবান, ইহা আমি একেবারেই বুঝিতে পারিতেছি না যে আমি কি হই। সত্যই আমি শোক করিতেছি কিন্তু কেন যে শোক করিতেছি তাহার কারণ জানিতেছি না। আমি অজ্ঞানী, আপনার শরণাগত। অতএব বলুন যে ইহার গুহ্য তত্ত্ব কি হয়। কোনও আত্মীয় মরিলে সকলেই শোক করে। সে স্বয়ং কে হয় অথবা অন্যই বা কে হয় এই মর্ম্ম জানে না কিন্তু কেবল শোকই করে। ভগবন, আমি আপনার শিষ্য, আমাকে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন।'

ইহা শুনিয়া মুনিপুত্র কহিতে লাগিলেন :—'রাজা, শুন! মায়ায় কারণ সব লোক মূঢ় হইয়াছে। নিজস্বরূপের পরিচয় বিনা বৃথা শোক করে। যতক্ষণ না মনুষ্য আপন স্বরূপকে না জানে ততক্ষণ যে দুঃখ পায় কিন্তু উঁহাকে (নিজস্বরূপকে) জানিলে সে কখনও দুঃখী হয় না। লোকে নিদ্রার মোহে বশীভূত হইয়া (অর্থাৎ স্বপ্নে) আপনাকে ভুলিয়া যেমন দুঃখ করিতে থাকে অথবা ইন্দ্রিয়-জাল-বিদ্যার নির্ম্মিত সর্পের ভয়ে ভীত হয় সেইরূপ মায়ায় পাগল হইয়া মনুষ্য বৃথা দুঃখ পায়। কিন্তু স্বপ্ন হইতে জাগিলে অথবা ইন্দ্রিয়-জাল-বিদ্যার স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া পরে যেমন সে ভীত হয় না আর অন্যকে ভীত হইতে দেখিয়া উল্টা হাসিতে থাকে সেইরূপ আত্মস্বরূপকে যাহারা সুস্পষ্ট জানে তাহারাই মায়া হইতে মুক্ত হইয়া দুঃখ রহিত হয়, আর তোমার মত মায়ায় মোহিত পাগলকে দেখিয়া হাসে। এইজন্য এই আত্মস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া

দুস্তর মায়া হইতে মুক্ত হও আর বিবেকের বলে এই মোহ জনিত শোককে দূর কর।'

ইহা শুনিয়া মহাসেন কহিতে লাগিল:—'ভগবন, আপনার দৃষ্টান্ত এখানে লাগিতেছে না কারণ স্বপ্ন আর ইন্দ্রজালের বিষয় কেবল মিথা হয় কিন্তু জাগৃত অবস্থা অনুভবে আসে এই সংসার সত্য হয় সবই যেন প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহার কখনও লোপ হয় না। ইহা স্থির। তাহা হইলে হইলে ইহা স্বপ্নের মত (মিথ্যা) কি করিয়া হইতে পারে?'

ইহার উত্তরে সেই বুদ্ধিমান মুনিপুত্র কহিতে লাগিলেন:— 'শুন! তুমি কহিতেছ যে দৃষ্টান্ত খাটিতেছে না। ইহা তোমার এক অন্য মোহ উৎপন্ন হইল। যেমন কোন মনুষ্যের স্বপ্নরূপ এক ভ্রম হইতে স্বপ্নের দড়িতে সাপ দেখা রূপ আরো অন্য ভ্রম হইয়া যায় সেইরূপই তোমার দর্শা হইয়াছে। স্বপ্নের বৃক্ষাদি স্বপ্নের সময় কি প্রত্যক্ষ কার্য্যের কি সাধন করে না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বলিয়া দেখে না? স্বপ্নের পথিক রাস্তায় চলিবার সময় কি তাপের কষ্ট হইতে বাচিতে চায় না? স্বপ্নে পুরুষকে ফলাদি দিয়া কি উহাকে সন্তোষ করে না? স্বপ্ন—সৃষ্টি কি কখন স্বপ্নে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়? স্বপ্নে কি কথন ইহা বুঝা যায় যে ইহা (স্বপ্ন প্রপঞ্চ) স্থির নহে—ক্ষণিক, তবে যদি তুমি ইহা বলিতে চাও যে 'জাগিলেই এই সব মিথ্যা হইয়া যায় তাহা হইলে কি এইসব জাগৃত প্রপঞ্চ ও নিদ্রাকালে নষ্ট হয় না? যদি তাহাতেও পুনবার শঙ্কা কর যে 'ইহা (জাগৃত প্রপঞ্চ) পরদিনে ফের অনুভাবে আসে এইজন্য

নষ্ট হয় না' তাহা হইলে ত স্বপ্নের বিষয়ও কি পরদিনের অনুভবে আসে না? যদি বল যে 'তাহা পুনরায় অনুভবে আসে না' তবে সেই পদার্থই জাগৃত অনুভাবে কবে আসে? অন্য নূতনের মতই বোধ হয়। যদি তুমি এই ভেদ বল যে পদার্থের নূতন বোধ হইলেও পৃথ্বিআদি পঞ্চভূত সেই সেই বোধ হইতেছে তাহা হইলে স্বপ্নে ও সেই সেই পুত্রকলত্রাদি অনুভব পুনঃ পুনঃ হয়। তুমি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখ। যদি সেই অনুভবকে কল্পিত বল তাহা হইলে জাগ্রতের অনুভবকে ও মিথ্যা কেন না বলিবে? জাগ্রত অবস্থায় দেহ, বৃক্ষ, নদী, দ্বীপআদি যে পদার্থ ভাসিত হয় সে সব পদার্থ প্রতিক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহা হইলে ইহা কি করিয়া বলা যায় যে সম্পূর্ণ সেই যেমন পূর্ব্বক্ষণে ছিল তেমনি অপারিবর্ত্তনীয়ভাবে অনুভবে আসে? পর্ব্বতের ন্যায় পদার্থের ও স্বরূপ দ্বিতীয় ক্ষণে যেমন তেমনি থাকে না। উঃ; ঝরণা, নালা আদি দ্বারা বদলাইয়া যায়। এইরূপে সমুদ্র আর ভূমণ্ডল প্রতিক্ষণে বদলাইতেছে। তাহা হইলে পুনরায় কি করিয়া বল যে ইহা যেমন ছিল তেমনি ফের অনুভবে আসে? রাজা, আমি এখন ইহা আরো স্পস্ট করিয়া বলিতেছি, একটু সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে দেখ। কেবল বিশিষ্ট স্থানে আর বিশিষ্ট পদার্থের অনুভব স্বপ্ন জাগরণে সমান রূপেই হয়। সব দেশে ও সব সময়ে কোন পদার্থের অনুভব হওয়া অত্যন্ত দুর্লভ হয়। এই দুই কথা হইতে পারে না। যদি ইহা বল যে পদার্থের অনুভব পদার্থরূপে (কার্য্যরূপে) নয় কারণ রূপে হয় তাহা

হইলে কারণের অর্থ হয় পৃথিবী আদি পঞ্চভূত। ইহাদের অনুভবও স্বপ্নেও হয়। তাহা হইলে আর পৃথক কি হইল? যদি ইহা বল যে "স্বপ্নের ব্যর্থতা জাগৃতে হয়, কিন্তু জাগৃতের ব্যর্থতা কখন জানা যায় না।" তাহা হইলে এখন বিচার কর, ব্যর্থতা কাহাকে বলে। পদার্থের ভান না হওয়াই অর্থাৎ না দেখাই উহার ব্যর্থতা হয়। ইহা অনুভবের কথা যে নিদ্রায় কিছু সারা সংসারের ভান হয় না তবে কি করিয়া বলা যায় যে জাগ্রতের ব্যর্থতা হয় না.?

এখন যদি এই বল যে পদার্থের ভান না হওয়া ব্যর্থতা নহে কিন্তু, ইহা জানা যে পদার্থের মিথ্যা হওয়াই ব্যর্থতা হয়, তবে তোমার মত ভ্রান্ত লোকের এইরূপ জানিবার শুদ্ধ দৃষ্টি কোথায়? সেই দৃষ্টি সেই লোকেরই হয় যিনি জ্ঞেয় বস্তু পুরাপুরি জানিয়াছেন। এইজন্য তোমার একটিও আক্ষেপ বিচারের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্যই আমি বলিতেছি যে এই সব দৃশ্যজাল স্বপ্নসৃষ্টির সমান। জাগ্রতের মতনই স্বপ্নেও দীর্ঘকালের অনুভব হয়। অর্থাৎ স্বপ্নসৃষ্টিও স্বপ্নকালে বাধিত হয় না, সমস্ত ব্যবহার করে আর স্থির থাকে বলিয়া জাগ্রতের সম্পূর্ণ সমান। জাগ্রত অবস্থায় আমি জানি যে আমি জাগিয়া রহিয়াছি। আর স্বপ্নস্থিতিতেও এইরূপই মনে হয় অর্থাৎ স্বপ্নেও মনে হয় যে আমি জাগিয়া দেখিতেছি। তাহা হইলে স্বপ্নে ও জাগরণে অন্তর কোথায় হয়? আর তুমি স্বপ্নের সম্বন্ধীর বা আত্মীয়ের জন্য শোক কেন করিতেছ না? এই সংসার কেবল

ভাবনা সামর্থ্যের কারণ সত্য বোধ হইতেছে। শূন্যতার ভাবনা করিলে সব শূন্য হয় অর্থাৎ খোলা আকাশ হইয়া যাইবে। যদি দৃঢ় নিশ্চয়ে ইহা ভাবনা করা যায় যে এই সব মিথ্যা হয় তাহা হইলে সর্ব্বত্র এই আত্মভাবের অনুভব হইতে থাকিবে। কারণ তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলে যে আমার রাজ্য এই গুহায় দেখা গিয়াছিল। যদি ইচ্ছা হয় ত চল এই পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে পুনরায় একবার ঘুরিয়া আসি।"

এই বলিয়া মুনিপুত্র মহাসেনকে লইয়া চলিল। দুইজনে পাহাড় প্রদক্ষিণ করিল। ফিরিয়া আসিবার পর সেই বুদ্ধিমান মুনিপুত্র মহাসেনকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন:—'রাজা, পাহাড় দেখিলে? কেবল ৩।৪ মাইল পরিধি হয়। ইহার ভিতর তুমি এখন বড় বিস্তৃত প্রদেশ দেখিয়াছিলে। ফের ইহা জাগৃত কি স্বপ্ন হয়? বল, ইহা সত্য হয় কি মিথ্যা হয়? পাহাড়ে তুমি এক দিন অতীত করিয়াছ। তখন পর্য্যন্ত এইখানে বার অযুত বৎসর অতীত হইয়াছে। তাহা হইলে এখন সত্য ও মিথ্যার নির্ণয় তুমিই স্থির কর। যেমন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন হয় সেইরূপই এখানে হয়। সেইজন্য ধ্যান রাখিও অর্থাৎ মনে রাখিও যে এই সংসারে ভাবনাই সার হয়। ভাবনাকে ছাড়িয়া দিলে এই সংসার এক্ষণেই লয় হইয়া যাইবে। এই সংসারকে স্বপ্ন বলিয়া বুঝিয়া শোক ত্যাগ কর। এই স্বপ্ন চিত্রের আধার দর্পণের ন্যায় সৎ চিৎস্বরূপ কেবল আত্মা হন। এই তত্ত্ব জানিয়া তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি থাক। এই সংসার-চিত্রের দর্পণ চিৎরূপ আত্মাকে

বুঝিয়া একবার আপনার অন্তঃকরণকে পরমানন্দে পূর্ণ হইতে যাইতে দাও।”

চতুর্দ্দশ প্রকরণ

সঙ্কল্পের সামর্থ্য।

দেশঃ কালোঽথবা কিংচিত্তথা যেন বিভাবিতম্ ॥
তথা তৎ তত্র ভাসেত দীর্ঘসূক্ষ্মত্বভেদতঃ ॥ ৮৩ ॥

মুনিপুত্রের কথা শুনিয়া মহাসেন শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা আরো বিচার করিল। অন্তে সংসারের দশাকে স্বপ্নের সমান বুঝিয়া শোক করা ছাড়িয়া মানষিক স্বস্থতা প্রাপ্ত হইয়া সে মুনিপুত্রকে কহিতে লাগিলঃ—“ভগবন্, আপনি বড় বুদ্ধিমান আর প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শী আপনার অজানা কিছুই নাই। অতএব আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করিতেছি উহার উত্তর কৃপা করিয়া দিন। আপনি বলিতেছেন যে এই সব সংসার ভাবনা প্রধান আর ভাবনার বলেই আপনি এই পাহাড়েতে স্বতন্ত্র সংসারও নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যেরূপ ভাবনা করি সেইরূপ অনুভব আমার বাহিরে কেন হয় না? আরো কথা এই যে একই সময়ে একই স্থানে

দুইরূপে কি করিয়া দেখা গেল? ইহার মধ্যে পুনরায় সত্য কে হয় আর মিথ্যা কে হয়? ইহা বুঝাইয়া দিন।"

মুনিপুত্র উত্তর দিতে লাগিলেন ঃ—"ভাবনার অর্থ হয় সঙ্কল্প। ভাবনা দুই প্রকারের হয়: এক সিদ্ধ ভাবনা আর অন্য অসিদ্ধ ভাবনা। যে ভাবনায় উহার বিরুদ্ধ বিকল্পের সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় না অর্থাৎ মন নিজ ধ্যেয় (বস্তু) হইতে অল্পও চঞ্চল হয় না উহাকে সিদ্ধ ভাবনা কহে। এই সংসার চিত্র ব্রহ্মদেবের ভাবনার কারণ নির্ম্মিত হইয়াছে আর সব জীবের ভাবনার দৃঢ়তার জন্য ইহার সত্যতা মিলে অর্থাৎ এই সংসারকে সত্য বলিয়া দেখে। ব্রহ্মার সংসারের মত তোমার সঙ্কল্প জন্য সংসারের সম্বন্ধে কাহারও সত্যতার ভাবনা নাই। এই বিকল্প মনে আনিবার কারণ তোমার ভাবনা অসিদ্ধ থাকে। সেই ভাবনা জন্য সিদ্ধি কয়েক প্রকারের হয়। কাহার এই জন্মেই প্রাপ্ত হয়। কাহার প্রযত্নের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। কাহার ঔষধির সহায়তায়, কাহার যোগমার্গের দ্বারা, কাহার তপস্যার দ্বারা, কাহার মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া লইবার পর আর কাহার বর পাইবার পর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার জন্ম হইতেই সিদ্ধি মিলিয়াছে, যক্ষ রাক্ষসের সিদ্ধি প্রযত্নের দ্বারা মিলিয়াছে। দেবতার ঔষধির দ্বারা, অমৃত দ্বারা—মিলিয়াছে। যোগমার্গ জন্য সিদ্ধি যোগীগণের মিলে। তপস্বীর সিদ্ধি তপে, আর মান্ত্রিক লোকের সিদ্ধি মন্ত্রে হয়। বিশ্বকর্ম্মাদির বরের দ্বারা সিদ্ধি মিলিয়াছে। এইজন্য যেমন যেমন, অনুভবের আবশ্যকতা হয় তেমন তেমন সঙ্কল্প করা চাই।

সঙ্কল্প করিতে করিতে যখন এই ভাবনা ভুলিয়া যাইবে যে "আমি সঙ্কল্প করিতেছি" তখন সেই সঙ্কল্প সিদ্ধি হইবে। এই রকমে যখন পূর্ব্বেকার অন্য স্মরণ ছুটিয়া যাইবে আর নির্ব্বিকল্প ভাবনা সম্পূর্ণ দৃঢ় হইয়া যাইবে তখন প্রযত্ন বিনাই বিকল্প হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে তখন সেই ভাবনা সিদ্ধ হইয়া যাইবে আর পুনরায় ইচ্ছা অনুসারে সব মহৎকার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইতে থাকিবে। রাজা, ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় যে বিকল্প তাহার কারণ তোমার ভাবনা এখন পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। যদি তোমার অভিপ্রায় ভিন্ন সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিবার হয় তাহা হইলে আপন ভাবনাকে শীঘ্র সিদ্ধ করিয়া লও। তাহা হইলেই তোমার আমার মত প্রত্যক্ষ অনুভব হইবে।"

"অন্য কথা দেশ কালের দ্বিবিধতার সম্বন্ধে হয়। উহা কি করিয়া জানা যাইবে তাহাই আমি বলিতেছি, শুন! তুমি এই লোক ব্যবহারের স্বরূপকে ঠিক ঠিক বুঝ নাই তাহারই জন্য তোমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে; আচ্ছা, এখন আমার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুন। অনেকরূপে ভাসিত হওয়া এই সংসারের স্বভাব হয়। সূর্য্যের প্রকাশ একই রূপ হয় কিন্তু উহার অনুভব দুই রকমই হয়—পেঁচক পক্ষীর অন্ধকার আর অন্য লোকের উজ্জ্বল (আলো)। মনুষ্য ও পক্ষীর শ্বাস লইতে জল বাধা দেয় কিন্তু মৎস্যকে বাধা করে না। অগ্নি সব জীবকে ভস্ম করে কিন্তু চকোর পক্ষী অগ্নিকেই ভক্ষণ করে। অগ্নি জলে নিবিয়া যায় কিন্তু কোথায় কুণ্ডে (কুয়াতে) ফুটন্ত গরম জল পাওয়া যায়।

সারাংশ এই হয় যে সংসারের সব ভাব দ্বিবিধ হয়। ইহা সেই পদার্থের দশা যাহার প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। কিন্তু এইরূপও শত সহস্র পদার্থ আছে যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও পরস্পর অনুভবের বিরুদ্ধ। আমি ইহারই উপপত্তি (যুক্তি) বলিতেছি। এই সব অনুভব চক্ষু ইন্দ্রিয়ে অবলম্বিত। নেত্রের বিকৃতিই ইহার স্বরূপ। নেত্রের বাহিরে এই দৃশ্যের একও অংশ কোথাও নাই। যে মনুষ্যের চক্ষু পিত্ত দোষে বিকৃত হইয়াছে সে বাহিরে সর্ব্বত্র হলদেই দেখে; এই হলদত্ব যথার্থ বাহিরের বস্তুতে থাকে না। তিমির রোগগ্রস্ত মনুষ্য প্রত্যেক বস্তুকে দুই প্রকারে দেখে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দোষে নেত্র দূষিত হইয়া যাইবার কারণ সব লোক এই সংসারের অনুভব ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে করে। পূর্ব্ব সমুদ্রে করণ্ডক নামক এক দ্বীপ আছে। সেখানকার মনুষ্যরা সব পদার্থ লাল রংএর দেখে। এইরূপ রমণক দ্বীপের নিবাসীগণ সব পদার্থ উল্টা—(নীচের ভাগ উপরে আর উপরের ভাগ নীচে)—দেখে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক আপন আপন নেত্রেন্দ্রিয়ের রচনার অনুসারে সদা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখে। যদি উহাদের সবের মত উল্টা না দেখিলে—সোজা দেখিলে ঔষধদ্বারা আপনার নেত্রের দোষ শোধরাইয়া পূর্ব্বের মত লাল অথবা উল্টা পদার্থ দেখিতে থাকে। ইহা করিলে তাহাদের সন্তোষ হয়। সারাংশ এই যে এই সংসারে নাভারোগে দূষিত মনুষ্যের মত নেত্রে সেইরূপ সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যেমন যেমন নেত্র দেখাইয়া দেয়। এই দশা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়েরও হয়। ইহার গন্ধাদি পদার্থ কেবল ঘ্রাণ মাত্র হয়। উহাদের অস্তিত্ব ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন নহে।

এইরূপ মানাসিক ভাব কেবল মন হয়। ব্যাবহারে পদার্থের যে ক্রম আর পরস্পর সম্বন্ধ ভাসিত হয় উহা সব ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের বাহিরে কিছুই নাই। রাজন্, দেখ, এই সংসারে যে কিছু "বাহিরে" ভাসমান হইতেছে উহা এই সংসারের মূল হয়; সংসাররূপী চিত্রের উহা দেওয়ালের মত, আধার হয়। কিন্তু উহাকেও 'বাহির' বলিবার ও নিশ্চিত আধার অল্পও নাই। ইহা বুঝা যায় না যে উহা কাহার বাহিরে হয়। যদি আমি এইরূপ উপাদান খুঁজিতে লাগি তাহা হইলে কদাচিৎ শরীর হইতে পারে—অন্য কিছু মানা যায় না। কিন্তু যথার্থততঃ শরীরও বাহিরে ভাসিত হইতেছে। ফের এই সংসারকে বাহিরে বুঝাবার জন্য উপাদান কি হইতে পারে? 'পর্ব্বতের বাহিরে' কহিলে পর্ব্বত বাহিরে হয় না। এইজন্য ঘটের মত শরীরও বাহিরে বুঝাইতেছে, এখন যদি বল যে 'ইহার যে ভাসক হয় তাহার বাহিরে' তাহা হইলে ইহাও ঠিক বলা যায় না। কেন না যে দীপের অথবা সূর্য্যের প্রকাশের বাহিরে অর্থাৎ অন্ধকারে হইবে উহা কখনও ভাসমান হয় না। এইজন্যই ইহাই বলা উচিত বোধ হয় যে যখন এই সারা সংসার ভাসমান হইয়া রহিয়াছে তখন উহা ভাসকের ভিতরেই আছে। এখন বিচার করা চাই যে এই ভাসক কে হন? দেহাদিকে ভাসক বলা যায় না। কেন না পর্ব্বতাদির মত দেহও ভাস্য বস্তু হয়। অতএব যে ভাস্য হয় উহাকে ভাসক বলা সম্পুর্ণ অযোগ্য, ভাসকের ভাস্য হইয়া যাইবার পর ভাসকতা থাকিতেই পারে না। স্বয়ং ভাসক ও স্বয়ং ভাস্য হইলে কর্ত্তৃকর্ম্ম বিরোধ হয়। অতএব ইহা ঠিক নয়। যে ভাসকতত্ত্ব হয় উহা

অত্যন্ত শুদ্ধ,একই রূপের,কেবল প্রকাশরূপ পরিপূর্ণ আর এক রসাত্মক হওয়া চাই। দেশ ও কাল উহার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। কারণ ইহারা (দেশ ও কালও) সেই ভাসকের জন্য ভাসিত হইতেছে। এইজন্য সেই ভাসকতত্ত্ব পরিপূর্ণ হন। ইহা ভিন্ন যাহার ভাসকের সহিত তাদাত্ম্য (একতা) হয় না উহা ভাসমানও হয় না। এই কারণে সেই ভাসকের ভিতর অন্য কেহ নাই—কেবল উহা প্রকাশক হইয়া এক রসে পরিপূর্ণ। অতএব ভিতরে ও বাহিরে যে যে পদার্থ ভাসমান হইতেছে সেই সব উঁহাতেই থাকে। পর্ব্বতের শিখর যেমন পর্ব্বতের বাহিরে বলা যায় না সেইরূপ বাহিরে ভাসিত হয় যে এই ভাস্য সংসার ভাসকের বাহিরে বলা যায় না। এইরূপে এই প্রকাশস্বরূপ ভাসক সব প্রপঞ্চকে গ্রাস করিয়াছে। সেই আত্মরূপ ভূমি স্বতন্ত্রতাপূর্ব্বক সব সময় ও সব স্থানে ভাসমানা হইয়া রহিয়াছ। ইহারই নাম পরমচৈতন্যস্বরূপ ত্রিপুরাদেবী। ইহাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলেন, শৈব শিব বলেন, বৈষ্ণব বিষ্ণু বলেন আর শাক্ত শক্তি বলেন। এই চিৎস্বরূপের অতিরিক্ত যে কিছু বলা যায় তাহা অপূর্ণ হয়। পূর্ণরূপ উনিই হন, যেমন সব প্রতিবিম্ব দর্পণে ব্যাপ্ত থাকে সেইরূপই এই চিদ্‌শক্তিতে সব ব্যাপ্ত আছে। উঁহাতে যে ভাসকতা তাহা ভাস্যের অপেক্ষায় আছে বস্তুতঃ নাই। উহাতে (চিদ্‌শক্তিতে) ভাসকতা নাই অর্থাৎ ভাস্যের অপেক্ষায় ভাসকতা, নিরপেক্ষায় নাই। দর্পণে দৃশ্যনগরের মত সব ভাস্যপদার্থ ভাণরূপে অভিন্ন। দর্পণের নগর যেমন দর্পণ হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপই পূর্ণ ও একরস চৈতন্যে ভাসিত হয় যে এই সংসার তাহা চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে। দর্পণে ভাসিত নগর

যেমন দর্পণ হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ করা যায় না সেইরূপ পূর্ণ ও এক রস চৈতন্যে ভাসিত হয় যে এই সংসার তাহা উহা (চৈতন্য) হইতে ভিন্ন নহে। আকাশ অবকাশ হয় আর উহার স্বরূপ শূন্য হয় ফলতঃ আকাশেতে উহা হইতে ভিন্ন যে সংসার তাহাও তাহাতে (আকাশেতে) থাকিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সৎরূপ তথা একরস চৈতন্যে দ্বিতীয়ত্বের সামন্য চিহ্নও থাকিতে পারে না। সারাংশ এই হয় যে শুদ্ধ সংবিদ্ দর্পণের মত স্বচ্ছ হন। উঁনি আপন অদ্বিতীয় স্বরূপে আপনার স্বতন্ত্রতার বলে সব চরাচর সংসারকে ভাসিত করিতেছেন। এই রীতিতে নিমিত্ত আর উপাদান কারণ বিনাই এই অত্যন্ত আশ্চর্য্যপূর্ণ দ্বৈত প্রকটিত হইয়াছে। দর্পণে অনেক আকার ব্যক্ত হইলেও উহার (দর্পণের) একতা অল্পও পরিবর্ত্তন হয় না ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এইরূপ সংসারের অদ্ভূত ভাস ভাসমান হইলেও ঐ সবে মিলিয়া থাকে যে এক চিৎতত্ত্ব তাহা নির্দ্দোষই (নির্লেপই) থাকেন। রাজা তুমি আপন মনোরাজ্যকে সূক্ষ্ম বিচার কর। তথায় (মনে) ও স্পষ্ট দেখা যাইবে যে কেবল চৈতন্যই ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র আকার ধারণ করিতেছেন। অতএব যেমন প্রতিবিম্ব পড়িলে অথবা না পড়িলে দর্পণ শুদ্ধই থাকে সেইরূপই এই চিৎস্বরূপ সৃষ্টিকালে আর প্রলয়কালে নির্বিকল্পই থাকেন। আপনার স্বতন্ত্রতার দ্বারা এই একরস চৈতন্য স্বতই আপনার স্বরূপকে বাহির করিয়া ভাসিত করেন ইহাই প্রথম উৎপত্তি। ইহাকেই অবিদ্যা কহে। কেউ ইহাকে তম কহে। পরিপূর্ণ ব্যাপক চিদ্রূপে অংশাত্মকের মত যে ভাণ হয় উহাকে বাহ্য ভাণ কহে। অহমাত্মস্বরূপ পূর্ণ চৈতন্যে

অহং এর স্ফুরণ না রহিবার কারণ অনহং ভাবনা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যাহাতে অহং তত্ত্ব নাই তাহা জড়ই হয়। এই জড়তত্ত্বকে অব্যক্ত কহে। মনুষ্য ও আপনাতে অহং ভাব ধারণ করে শরীরের হাতপাদি অংশেতে উহার অহং ভাব থাকে না এইরূপ জড় অব্যক্ত তত্ত্বে শুদ্ধ চৈতন্যের, অহংএর স্ফূরণ হয় না। উক্ত (অব্যক্ত তত্ত্ব) উহার (চৈতন্যের) বিরাট শরীরই হয়। এই স্থানে (বিরাট শরীরে) যে চৈতন্য সসীম অর্থাৎ সীমাবদ্ধ-ভাবে ভাসিত হইতেছেন উহাকে 'শিবতত্ত্ব' কহে। ইহা সেই শিবতত্ত্ব যিনি প্রলয়কালে জড়স্থষ্টির লয় হইয়া যাইবার পর চৈতন্যের নির্ব্বিকল্পক শুদ্ধস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন। আর যাহা বাহ্যভাস অর্থাৎ অহংএর স্ফুরণ—যাহা চৈতন্যের সবিকল্প স্বরূপ—উহাকে শক্তি বলে; উহা জীবতত্ত্ব হয়। আর "বাহিরে" শূন্য আকাশে যে পদার্থের কল্পনা হইতেছে উহাতে "ইহা আমি হই" এই ভাব যে রাখে তাহার স্বরূপকে "সদা শিব" কহে। এই তৃতীয় তত্ত্বতে 'ইহা আমি হই' এর 'ইহা' জড় তত্ত্বের বিচার করিবার সময় উঁহাকে ঈশ্বর নাম দেওয়া হয়। ইহাকে চতুর্থ তত্ত্ব বুঝা উচিত। সদাশিব আর ঈশ্বর এই দুই তত্ত্বে যে ভেদাভেদ পূর্ব্বক সংবেদন হয়—যে ঐ দুই এর অনুগত হইয়া সামান্যরূপে ভাসিত হন—উহা শুদ্ধ বিদ্যা নামক পঞ্চম তত্ত্ব হয়; এই পর্য্যন্ত জড় শক্তির বিকাশ হয় না; এসব আত্মতত্ত্বেরই অভাবে হয় অতএব এই পাঁচ তত্ত্বকে 'শুদ্ধ তত্ত্ব পঞ্চক' কহে। তাহাই হউক, ইহার পর

যখন ভেদ সঙ্কল্প চিৎস্বাতন্ত্রের মাহাত্ম্যে বর্দ্ধিত হয় তখন চৈতন্য জড়শক্তির ধর্ম্ম হইয়া যান আর জড়শক্তি ধর্ম্মী হইয়া যায়। সেই সময় সেই জড়শক্তিকে মায়া বলা হয়। ভেদ সঙ্কল্পের প্রবলতা হওয়ার জন্য যে বিশিষ্ট ভেদ নিশ্চয়াত্মক অবস্থা—উহাই মায়া। যখন চিতি এই ভেদ ভাবনাতে ব্যাপ্ত হন তখন সঙ্কোচ পাইয়া অর্থাৎ সঙ্কুচিত হইয়া উহাতে পঞ্চ কঞ্চুকের—আবরণের—যোগে পুরুষরূপ প্রাপ্ত হন। কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি পঞ্চ কঞ্চুক হয়। এই পঞ্চশক্তি শিবে পূর্ণ-রূপে আর জীবে অংশতঃ থাকে। জীবের পাঁচ লক্ষণ এই হয়—(১) কিছু সীমা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে পারে অর্থাৎ কর্ম্ম করার ও তাহার সীমা আছে (সীমাবদ্ধ কর্ম্ম) (২) সীমাবদ্ধ জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ নহে। (৩) সীমাবদ্ধ ইচ্ছা (৪) সীমাবদ্ধ স্থিতি অর্থাৎ কিছু সময় থাকা (৫) কিছু কথায় স্বাবলম্বী হওয়া। অনাদি কাল হইতে জীব ভাল মন্দ কর্ম্ম করিতেছে। এই কর্ম্মের সংস্কার সমুদয়কে প্রকৃতি কহে। কর্ম্মের ফল তিন প্রকারের হয়—সুখ, দুঃখ আর মোহ। অতএব প্রকৃতিও তিন প্রকারের হয়। উহারই (সংস্কাররূপ প্রকৃতিরই) এক বিশিষ্ট অবস্থাকে চিত্ত কহে। সুষুপ্তির স্থিতিকে প্রকৃতি কহে। এই স্থিতির অন্ত হইলেই উহার নাম চিত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ সুষুপ্তির স্থিতির অন্তে জাগৃত ও স্বপ্ন স্থিতিকে চিত্ত কহে। উহার নাম অব্যক্ত হয়। পুরুষ ভেদে চিত্ত কয়েক প্রকারের হয় কিন্তু সব জীবের মূল স্বরূপ একই হওয়ার কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় জীব (প্রাজ্ঞ) সদা একরূপই

থাকে। অতএব ঐ সময় (সুষুপ্তিতে) উহাকে প্রকৃতি কহে; জাগরণে পুনরায় চিত্ত হইয়া যায়। চৈতন্যের প্রধানতার কারণ উহাকে (চিত্তকে) পুরুষ কহে, অব্যক্তের (জড়তার) প্রধানতায় উহা (চিত্ত) প্রকৃতি হইয়া যায়। ক্রিয়া ভেদে চিত্ত অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি তিন নামে তিন প্রকারের হয়। ইহার পরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর পাঁচ জ্ঞানেন্দ্র উৎপন্ন হয়। পুনরায় শব্দাদি বিষয় পঞ্চ আর আকাশাদি সূক্ষ্ম ও স্থূল পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়।'

মুনিপুত্র পুনরায় কহিতে লাগিলেন:—রাজা, মহাসেন, সেই শুদ্ধ—আর সর্ব্বসাক্ষী পরম সংবিদ্ এই ক্রমে বাহিরে আভাস প্রকট করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। এই সবের মূল শক্তি ত্রিপুরা দেবী। ত্রিপুরা দেবী সৃষ্টিকালের আরম্ভে হিরণ্যগর্ভ আর ব্রহ্মদেবকে আপন ভাবনা বলে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহারই (ব্রহ্মারই) ভাবনায় এই সংসার প্রকট হইয়াছে। আমি, তুমি ইত্যাদি রূপে সে সংবিদ, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আর অনুভব রূপে ভাসিত হইতেছে উহা সেই পরম চৈতন্য শক্তি হন। উঁহার মূল স্বরূপে ভেদ নাই—উপাধির জন্যই ভেদ দেখায়। এই উপাধির জন্ম ব্রহ্মার ভাবনার জন্য হইয়াছে আর উহার (উপাধির) সংহার হইলে ভেদ থাকে না। চৈতন্যের ভাবনার সামর্থ্য তোমাতে মায়ার জন্য আবৃত হইয়া গিয়াছে। "আমি এক ক্ষুদ্র জীব হই"—হৃদয়ের এই দৃঢ় গ্রন্থি সেই মায়ার স্বরূপ হয়। সেই মায়ার আভরণ নষ্ট হইলেই তোমার সেই শক্তি সিদ্ধ হইয়া যাইবে। দেশ ও কাল যাহা কিছু হউক

না কেন, ভাবনার অনুসারে ইহা অল্প অথবা বিস্তৃত বোধ হইতেছে। আমি একাদনের ভাবনা করিয়াছিলাম অতএব একদিন হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে ব্রহ্মা বার অর্ব্বুদ বর্ষের ভাবনা করিয়াছিলেন। এই জন্যে এই ছোটবড়র অনুভব হইয়াছে। ব্রহ্মার নির্ম্মিত তিন চার মাইলের পাহাড়ে আমি অনন্ত প্রদেশের ভাবনা করিয়াছিলাম; অতএব উহাতে অনন্ততা উৎপন্ন হইয়া গেল। সত্য কহিলে এইসব কথা সত্যও হয় আর মিথ্যা বলিলে মিথ্যাও হয়। কারণ এই সব সম্পূর্ণ তোমার ভাবনায় অবলম্বিত হয়। তুমি ইচ্ছা করিলে তুমিও এক দুই মাইলের প্রদেশ আর অল্প কাল লইয়া অনন্ত যোজন লম্বা প্রদেশের আর দীর্ঘ কালের ভাবনা করিতে পায়। ভাবনায় সিদ্ধি হইলেই অর্থাৎ চিত্ততে বিরুদ্ধ বিকল্পের উদয় হওয়া বন্ধ হইলেই তোমার উহা প্রত্যক্ষ অনুভব হইবে। সারাংশ এই যে বাহ্য জগৎ কেবল ভাবনামাত্র হয়। অর্থাৎ এই চিত্রময় জগৎ অব্যক্ত নামক দেওয়ালে অব্যক্ত এক স্বরূপে ভাসিত হইতেছে। এই অব্যক্ত দেওয়াল চৈতন্য হন। এই জন্যই সামান্য মনুষ্যের যেখানে যাইতে কয়েক যুগ লাগে সেই দূর দেশেও যোগী এক ক্ষণে যাইয়া পৌঁছান। মহাসেন, এইজন্য ইহা নিশ্চয় পূর্ব্বক জানিও যে দূর অথবা নিকট আর বিলম্ব অথবা শীঘ্রের সিদ্ধতা ভাবনার বলে হয় আর ভাবনার আশ্রয় চৈতন্যরূপ হন; তুমি শুদ্ধচিৎ ভবনার সহায়তাতে সব ভ্রান্তিকে ছাড়িয়া দাও; তাহা হইলে তুমিও আমার মত সর্ব্ব সামর্থবান হইয়া যাইবে।"

এই কথা শুনিয়া কিছু বিচার করিয়া মহাসেনের সব ভ্রম দূর হইয়া গেল। সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থকে জানিয়া লইবার কারণ উহার অন্তঃকরণও শুদ্ধ হইয়া গেল। সমাধির অভ্যাস করিয়া সে ভাবনা সামর্থ প্রাপ্ত হইল। আর সর্ব্ব সামর্থবান হইয়া পৃথিবীতে বহুকাল পর্য্যন্ত বিহার করিল। শরীরের অহং ভাবকে নষ্ট করিয়া শুদ্ধ চিৎস্বরূপের আশ্রয়ে অন্তে সে পরম নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়া গেল।

দত্তাত্রেয় কহিতে লাগিলেনঃ—পরশুরাম, এই সংসার কেবল সত্যতার ভাবনার কারণেই সত্যরূপে ভাসিত হইতেছে। তুমি ইহার ঠিক ঠিক বিচার কর তোমর চিত্তের সব ভ্রম বিচারের সহায়তাতে সারিয়া যাইবে।

পঞ্চদশ প্রকরণ

সমুদ্রান্তপ্যন্ত।

জিজেয় বারুণির্বিপ্রান্ বিতণ্ডা জল্পবর্ত্মনা ॥
সিন্ধৌ নিমজ্জিতাস্তেন শতশস্তে সহস্রশঃ ॥ ৪৫ ॥

সঙ্কল্পের সামর্থের অদ্ভুত কথা শুনিয়া পরশুরামের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। উনি শ্রীগুরুর কথার খুব বিচার করেন আর

শুদ্ধবুদ্ধিতে মনে কিছু নিশ্চয় করেন। অনন্তর উনি দত্তাত্রেয়কে পুনরায়ও এক প্রশ্ন করিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন :—

'ভগবন্! আপনি যে অনেক বোধপ্রদ কথা বলিয়াছিলেন উহার সম্বন্ধে আমি বহু বিচার করিয়াছি। আমার এই বহু বিচারের সার সিদ্ধান্ত এই হয় যে সংবেদন, চৈতন্য অথবা জ্ঞানই এক সত্যতত্ত্ব হয়। সংবেদ্য অথবা জ্ঞেয়ভাব উহার (জ্ঞানের) আধারে কল্পিত হয়। দর্পণে ভাসিত নগরের ন্যায় উহা (জ্ঞেয় ভাব) মিথ্যা কল্পনা হয়। সেই চৈতন্যই পরম-সমর্থ সংবিদ্রূপ পরমেশ্বর হন। স্বস্বরূপের দেওয়ালে (আধারে) বাহ্য পদার্থ এই বহুবিধ সংসারচিত্রকে উনি (সংবিদ্রূপ পরমেশ্বর) ভাসিত করিতেছেন। উনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন অতএব এই কাজে অর্থাৎ সংসারচিত্র ভাসিত করিতে কোন অন্য সামগ্রীর আবশ্যকতা হয় না। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি। কিন্তু সংবিত্তিকে আপনি বস্তুতঃ বেদ্য রহিত অর্থাৎ নির্বিকল্প বলিতেছেন সেইজন্য আমার উহাকে (নির্বিকল্প সংবিদ্‌কে) পাওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না উহা সদাই সংবেদ্য-ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে। তবেই নির্বিকল্প স্থিতিকে—বেদ্য রহিত সংবিত্তকে কি করিয়া জানা যাইবে? আর নির্বিকল্প জ্ঞান হইবার পর যদি মোক্ষ হয় ত মুক্ত হইয়া যাইবার পর ব্যবহার কেমন করিয়া করা যাইবে? জ্ঞানী লোকও ব্যবহার করেন দেখা যায়। তবেই ব্যবহারকালে উনি পুন নির্বিকল্প অবস্থায় কি করিয়া থাকিতে পারেন? ইহা বুঝিতে পারিতেছি না, যে শুদ্ধনির্বিকল্প অবস্থায় ব্যবহার কি করিয়া করা যাইবে। অন্য কথা এই যে জ্ঞান একই

প্রকারের হয় উহার ফল মোক্ষ ও একই প্রকারের হইবে। তাহা হইলে সংসারে জ্ঞানীদিগের ভেদ কি করিয়া পাওয়া যায়? বহুজ্ঞানী শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করেন, বহু জ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভক্তি করেন। কেউ ইন্দ্রিয়কে সংহার করিয়া সমাধিতে নিমগ্ন হন। কেউ তপ করিয়া শরীরকে জ্বালাতে থাকেন। কেউ শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ করিতে থাকেন। কেউ দণ্ডনীতি মার্গ স্বীকার করিয়া রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন। কেউ সভায় প্রতিপক্ষের সহিত বিবাদ করিতে থাকেন। কেউ সদাই পাগলের মতন থাকেন। কেউ লোকনিন্দাবৃত্তিতেই জীবন অতিবাহিত করেন। আর ফের এইসব লোককে সংসারে জ্ঞানী বলা হয়, তাহা হইলে সাধন ও ফলের ভেদ না থাকিলেও স্থিতির ভেদ কেন হয়? আর ইহাদের জ্ঞান সমান থাকে না ন্যূনাধিক থাকে? আমার উপর আপনার বড় কৃপা। এই সব কথা আমায় বুঝাইয়া দিন।"

প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীদত্তাত্রেয় প্রসন্ন হইলেন। উহাকে যোগ্য দেখিয়া তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন—"পরশুরাম, সত্যই তুমি বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সদ্বিচার তৎপর হইবার কারণ তুমি তত্ত্ব-জ্ঞান শুনিবার যোগ্য পাত্র। সদ্বিচার তৎপরতা ঈশ্বরের কৃপার চিহ্ন, ভগবৎকৃপা বিনা কাহারও পরমকল্যাণ হইতে পারে না। আত্ম-দেবের কৃপা হইবার কারণ তোমার সদ্বিচার নিত্য বাড়িয়া যাইতেছে। তোমার যে তত্ত্ব বুঝা হইয়াছে তাহা ঠিকই, ভুল হয় নাই। কিন্তু তোমার শুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ এখন পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক বোধগম্য হয় নাই। এইজন্য পুনরায় প্রশ্ন করিতে হইতেছে। পরশুরাম,

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তটস্থ (পরোক্ষজ্ঞানে) থাকিয়া ব্রহ্মের পরিচয় না করা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উঁহার সম্যক্ জ্ঞান হয় না। কেন না উহার নিশ্চিত জ্ঞান হইয়া যাইবার পর আসনে তটস্থ বসিয়া আসিবার আবশ্যকতা থাকে না। তটস্থ (ধ্যানস্থ) থাকিয়া ব্রহ্মকে জানা স্বপ্নের জ্ঞানের মত ক্ষণিক--নিত্য নহে কারণ উত্থান হইলেই উহা নষ্ট হইয়া যায়। স্বপ্নের অর্থ জাগরিত হইবার পর যেমন নিরুপযোগী হয় অর্থাৎ কোন কাজে লাগে না সেই দশা তটস্থ জ্ঞানের হয়। উহা মুখ্য ফল মোক্ষ দিতে পারে না। এই বিষয়ে তোমাকে প্রথমে এক সুন্দর ইতিহাস শুনাইতেছি। পূর্ব্বকালে বিদেহ দেশে জনক নামক বড় বুদ্ধিমান্ ও অত্যন্ত ধর্ম্মাত্মা রাজা ছিলেন। উঁহার স্বরূপের জ্ঞান হইয়াছিল। একবার বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া উঁনি আত্মস্বরূপকে পূজা করেন। সেই সময় তিনি বহু ব্রাহ্মণ, বিদ্বান্, তপস্বী, কলাকুশল, বৈদিক, যাজ্ঞিক আর অন্যান্য লোক একত্রিত করেন। সেই সময় বরুণ অন্য এক যজ্ঞারম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু জনকের প্রতি বিশেষ প্রেম হইবার জন্য ব্রাহ্মণগণ বরুণের নিকট গেল না। তখন ব্রাহ্মণগণকে লইয়া যাইবার জন্য বরুণের এক তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান্ পুত্র স্বয়ং কপটি ব্রাহ্মণের রূপে জনকের যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিল। সভাসদ্ আর রাজাকে দেখিতে দেখিতে সে সভার সব পণ্ডিতকে বড় অপমান করে। রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে কহিতে লাগিল :—"রাজা, তোমার যজ্ঞমণ্ডপে যথেষ্ট শোভা নাই। যেমন সমুদ্রতীরে কাক সমবেত হয় সেইরূপ দশা এইখানে হইয়াছে। কমল সরোবরের শোভা হংসতে

হয় আর সভার সুন্দরতা বিদ্বান্ হয়। এখানে আমি একটিও বিদ্বান্ দেখিতেছি না। তাহা হইলেও তোমার কল্যাণ হউক। আমি এখন যাইতেছি, এখানে আমার থাকা হইবে না। মূর্খে ভরা এই সভায় আমি কি করিয়া থাকিব ?"

বরুণপুত্রের কথা শুনিয়াই সব সভাসদ্ খুব ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা কহিতে লাগিল :—"কেরে ব্রাহ্মণ, তুই সকলকে অপমান করিতেছিস্ ? তোর নিকট এমন কোন বড় ভারি বিদ্যা আছে যাহার জন্য তুই আমাদের সকলকে পরাস্ত করিতে পারিস্। ওরে মূর্খ, তুই বৃথা দম্ভ করিতেছিস্। আগে আমাদের জিতিয়া নে, তাহার পর চলিয়া যাইবি। এখানে প্রায় সারা সংসারের সব বিদ্বান্ উপস্থিত আছেন। কিরে মূর্খ, তুই কি সারা ভূলোককে জিতিতে সাহস করছিস্। বল, তোর নিকট কোন বিদ্যা আছে ?"

সভার বিদ্বানেরা এইরূপে আহ্বান করিলে বরুণপুত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল আর উহার আনন্দবোধ হইতে লাগিল। ফের সে সভাসদকে কহিতে লাগিল :—"অধিক কথায় কি লাভ ? আমি পণ করিয়া বলিতেছি যে তোমাদের সকলকে এককক্ষণে জিতিয়া লইব যদি আমি হারিয়া যাই তাহা হইলে আমায় সমুদ্রে ডুবাইয়া দিবে ; তাহা না হইলে আমি যাহাকে যাহাকে জিতিব উহাদের সমুদ্রে লইয়া গিয়া ডুবাইয়া দিব। বল, এই কথা স্বীকার হয়, তবে বিবাদ আরম্ভ কর।"

সব সভাসদ্ এই সর্ত্তে স্বীকৃত হইলে বড় প্রচণ্ড বিবাদ আরম্ভ হইল। বরুণপুত্র বহু ব্রাহ্মণকে বিতণ্ডাবাদে পরাস্ত

করিল। সর্ত্তানুসারে সে শত সহস্র ব্রাহ্মণকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দিল, নিমজ্জিত ব্রাহ্মণদের বরুণের সেবক বরুণের যজ্ঞতে লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। বরুণের আদর সৎকার পাইয়া এইসব ব্রাহ্মণ আনন্দপূর্ব্বক উহার যজ্ঞকার্য্য করিল। এইরূপ সে একবার কহোল ঋষিকে ডুবাইতে আসিল। তাহার পুত্র অষ্টবক্র সযুক্তিক আর বিতণ্ডা দুই প্রকারের বিবাদ করিতে প্রবীন ছিল। আপনার পিতাকে ডুবাইয়া দিতেছে শুনিয়া সভায় সে শীঘ্র পৌঁছায় আর বারুণীকে বিবাদের জন্য আহ্বান করিল। বারুণী হারিয়া গেল; উহাকে ডুবাইয়া দিবার পর তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ বেশ ত্যাগ করিয়া আপনার মূল স্বরূপ প্রকট করিল। বরুণলোকে গিয়া সে সব ব্রাহ্মণগণকে ফেরত আনিয়া জনকের সভায় পৌঁছাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিলে অষ্টবক্র আপনার বিবাদ বিত্থার বড় দম্ভ করিতে লাগিল। যে ব্রাহ্মণদিগকে বড় বড় কথা কহিতে লাগিল। উহার এই অপমান সূচক আচরণে ব্রাহ্মণেরা দ্বেষ করিতে লাগিল। এই সময় তথায় এক তপস্বিনী আসিলেন। ব্রাহ্মণের দশা দেখিয়া তপস্বিনী উহাদের আশ্বাস দিলেন। তিনি একবার সভায় গেলেন। উহার শরীরে কাষায় বস্ত্র ছিল। মস্তকে সুন্দর জটা ছিল। যোগাভ্যাসের জন্য শরীর কান্তিময় হইয়াছিল। দর্শকের উহার প্রতি পূজ্যভাব হইতেছিল। সভাতে আসিলেই জনক খুব আদরপূর্ব্বক সৎকার করিলেন। প্রসঙ্গ দেখিয়া তিনি অষ্টবক্রকে এক প্রশ্ন করিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেনঃ—"বালক, তুমি বড় বুদ্ধিমান, তুমি

বরুণপুত্রকে জিতিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ছাড়াইয়াছ—বড় ভাল কাজ করিয়াছ। আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সরলতায় আর বিতণ্ডাবাদ ছাড়িয়া উত্তর দাও। তুমি কি সেই পরমপদকে জান যাঁহাতে সর্ব্বত্র একই অমৃততত্ত্ব ব্যাপ্ত হওয়া সিদ্ধ হয়? সেই পদ বুঝিলে সব সন্দেহ নষ্ট হইয়া যায়; জানিবার জন্য কিছু বাকী থাকে না আর ইচ্ছারও কিছু শেষ থাকে না। ইহাও নহে যে উহা স্বয়ং জানা যায়। যদি তোমার সেই পদ জানা থাকে ত আমায় বল।"

তপস্বিনীর প্রশ্ন শুনিয়া অষ্টবক্র কহিতে লাগিল:—"আমি সেই পদকে জানি। বহুলোককেও আমি বুঝাইয়াছি। তোমাকেও বলিতেছি। শুন! এই সংসারে এমন কিছুও নাই যাহা আমি জানি না। তোমার এই প্রশ্ন আর কি? আমি সব শাস্ত্রকে বার বার উল্টেপাল্টে দিয়াছি। তুমি যে পদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ উহা সারা সংসারের মূল হয়। উহার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুও নাই। উহা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ নহেন আর শুদ্ধ তথা অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ হন। উহা সেই পরমপদ হন যাহার উপর এই সংসার দর্পণে নগর সদৃশ বিরাজমান হয়। উহার জ্ঞান হইলে অমৃততা মিলিয়া যায়। সেই পদ বিদিত হইলে পুরুষের সেই দশা হয় যেমন দর্পণকে বুঝিলে হয়। দর্পণকে বুঝিয়া লইবার পর প্রতিবিম্বকে আলাদা জানিবার বাকী থাকে না, উহার সম্বন্ধে কিছু সন্দেহও শেষ থাকে না। আর কোন রকম আশাও করিতে হয় না। উহার জ্ঞাতা

উঁহা হইতে অন্য কেহ নাই অতএব উহা বস্তুতঃ অজ্ঞেয়ই হন। তপস্বিনী, শাস্ত্রেতে এই তত্ত্বের নির্ণয় এইরূপই করা হইয়াছে।"

অষ্টাবক্রের কথা শুনিয়া তপস্বিনী পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—"ঋষিপুত্র তুমি ঠিক বলিয়াছ। তোমার কথা যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ উত্তম আর সর্ব্বসম্মত হয়। কিন্তু তুমি বলিতেছ যে জ্ঞাতা কেহ অন্য নাই বলিয়া সে অজ্ঞেয় হয়। আর তুমি ইহাও কহিতেছ যে উহার জ্ঞান হইবার পর অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব তোমার এই কথা (যুক্তি) সুসঙ্গত কি করিয়া হইতে পারে? যদি সে অজ্ঞেয় হয় তাহা হইলে তোমার কহা উচিত যে তুমি তাঁহাকে জান না। যদি সে অজ্ঞেয় না হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় হয় ত তোমার বলা উচিত যে তুমি উহাকে জান আর তাহা হইলে তাহাকে জ্ঞেয় কহ। তুমি শাস্ত্রের নির্ণয় বলিতেছ ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে তুমি সেই পদকে স্বয়ং বুঝ নাই আর তোমার উঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হয় নাই। যদি তুমি সব প্রতিবিম্বকে যেমন তেমনি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তাহা হইলে তোমার দর্পণ প্রত্যক্ষ কেন না দেখিতেছ? তুমি এইরূপ কথা জনকের সভায় করিতেছ? ইহা কি তোমার পাগলামী বলিয়া বুঝিতেছ না?"

অষ্টবক্র চুপ করিয়া রহিল, সে লজ্জিত হইল। সে কিছুক্ষণ শান্ত থাকিয়া বিচার করিল কিন্তু কিছুও উত্তর না মিলায় সে কহিতে লাগিল :—"তপস্বিনী, দুঃখের বিষয় যে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না, আমি এখন তোমার শিষ্য হইলাম।

তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও যে শাস্ত্রে এইরূপ বিরোধী নিরুপণ কি করিয়া করিয়াছে ? আমি মিথ্যা বুঝাইতেছিলাম না। আমি জানি যে মিথ্যা বলিলে পুণ্যের নাশ হইয়া অনর্থ হয়।"

অষ্টবক্রের আন্তরিক উত্তর শুনিয়া তপস্বিনী সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সব সভাসদের সম্মুখে তিনি বলিতে লাগিলেন :—"এই মর্ম্ম না বুঝিবার জন্য বহু লোক মোহের বশ হইয়া যায়। ইহা কেবল তর্কদ্বারা জানা যায় না। শাস্ত্র উহা গূঢ়ই অর্থাৎ গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। এখানেও ইহা আমি ও জনক ব্যতীত অন্য কেহই জানে না। সব জায়গায় বাদ বিবাদ হয় কিন্তু তার্কিক বিদ্বানের মণ্ডলীতে এই প্রশ্ন আর তাহার উত্তর প্রায় নির্ণয় হয় না। কুশাগ্র বুদ্ধি হইলেও কেবল তর্কের দ্বারা অর্থাৎ সদগুরুর সেবা বিনা আর ঈশ্বরের কৃপা বিনা ইহা ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। তুমি সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বিচার কর—আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। বিচার না করিলে শুধু শুনিলেও বুঝা যাইবে না। এই জ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অন্তর্মুখ হইয়া না বুঝা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যে সহস্রবার শুনাইলে আর স্বয়ং সহস্রবার শুনিলেও সব নিরর্থক হয়। মনুষ্য আপনার গলায় হার ভ্রমে ভুলিয়া গিয়া মনে করে যে চোরে লইয়া গিয়াছে। যদি উহাকে কেউ বলে যে সেই হার তোমার গলাতেই আছে তাহা হইলেও আপনার গলা প্রত্যক্ষ দেখা বিনা বড় বিচারশীল হইলেও উহা পাইতে পারে না। এইরূপ যদি শুনিয়াও লয় যে আত্মা স্বস্বরূপ হন আর যে শুনে সে যদি বড় বুদ্ধিমানও হয় তাহা হইলেও প্রত্যক্ষ অন্তর্মুখ হইয়া দেখা বিনা উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দীপ অন্য বস্তুর উপর

প্রকাশ দেয় অর্থাৎ অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে কিন্তু স্বয়ং অন্য দীপের প্রকাশ্য হয় না। অন্যের অপেক্ষা বিনা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। সূর্য্যোদয়েরও এই দশা। প্রকাশ কবে যে অর্থাৎ প্রকাশক অন্য পদার্থেরও ঐ অবস্থা হয়। তাহা হইলে কি ইহা বলা ঠিক হইবে যে দীপাদি কোন অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না অতএব উহা অস্তিত্বহীন হয় অথবা প্রকাশহীন হয়? তাহা হইলে তোমার এই কথায় সন্দেহ কেন হয়? যে শুদ্ধচিদ্‌তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশ আর সংবেদ্য (প্রকাশ্য) না হইয়াও প্রকাশমান হন? অষ্টবক্র, তুমি অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে বিচার কর। এই চিদ্‌শক্তি পরম শ্রেষ্ঠ আর সবের আধার। সবকে প্রকাশিত করেন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশক যিনি তিনি কখনও কোথাও অপ্রকাশিত হন না। যদি উহা অপ্রকাশিত হইত তাহা হইলে ফের প্রকাশিত কি হইতেছে? যখন অন্য কাহারও প্রকাশ হয় বা না হয়, তখন এই চিদ্‌শক্তি প্রকাশিতই থাকেন। কারণ প্রকাশের অভাবও যে শক্তিতে ভাসিত হয়, উহা স্বয়ংই ভাসিত কেন না হইবে? এখন ইহার বিচার কর যে উহা কি করিয়া ভাসিত হইতেছে? এখানে বিদ্বান্ পণ্ডিতের বুদ্ধিও হার মানিয়া যায়। অন্তর্দৃষ্টিতে কাজ লওয়া বিনা সে মোহতে ফাঁসিয়া যায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দৃষ্টি বাহিরের প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া শান্ত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তর্মুখতা প্রাপ্ত হয় না আর অন্তর্দৃষ্টি হওয়া বিনা স্বরূপদর্শন হইতে পারে না। মনের নিঃসংকল্প হওয়াই অন্তর্দৃষ্টি। তাহা হইলে ফের সঙ্কল্প থাকিলে অন্তর্দৃষ্টি কি করিয়া হইতে পারে? এইজন্য সব সংকল্পকে ত্যাগ করিয়া তুমি স্বস্বরূপের আশ্রয় লও। তথায়

অর্থাৎ স্বস্বরূপে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া পুনরায় সেই বিচারও অর্থাৎ স্বস্বরূপে আছি এই চিন্তাও ছাড়িয়া দাও। অনন্তর ঐ অবস্থার কেবল স্মরণ ধরিয়া রাখ অর্থাৎ ঐ অবস্থার স্মরণে তন্ময় হইয়া যাও। তাহা হইলে তোমার ইহা বুঝা হইবে যে সেই তত্ত্ব জ্ঞেয় কি করিয়া হয় আর অজ্ঞেয় কি করিয়া হয় অর্থাৎ নিঃসংকল্প অবস্থায় জ্ঞেয় আর সংকল্প বিকল্প অবস্থায় অজ্ঞেয়। এই রকমে পরমপদকে জানিয়া তুমি অমৃতাবস্থায় পৌঁছাইবে।"

সেই তপস্বিনী শেষে পুনরায় কহিতে লাগিলেন :—"মুনিপুত্র, আমি তোমাকে এই সব বুঝাইলাম। নমস্কার; এখন আমি যাইতেছি। একবার শুনিলে তুমি ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে না এইজন্য এই মহাবুদ্ধিমান্ রাজা জনক তোমাকে তত্ত্ববোধ করাইবেন। উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও—উনি তোমার সব সংশয়কে নষ্ট করিয়া দিবেন।

ইহা বলিয়া সেই তপস্বিনী চলিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা জনক উঁহার বহু সৎকার করিলেন। সভাসদ্ উঁহাকে প্রণাম করিল। ইহার পর তিনি অন্তর্ধান হইলেন।

দত্তাত্রেয় কহিতে লাগিলেন :—"পরশুরাম, আমি তোমায় স্বস্বরূপ প্রাপ্ত করিবার এই উপায় বলিলাম। ইহাতে তুমি বুঝিবে যে নির্বিকল্প চিৎস্বরূপ অর্থাৎ বেদ্যরহিত সংবিত্তের অর্থাৎ বিষয়হীন জ্ঞানের অনুভব কি করিয়া হয়। অর্থাৎ চিত্তের নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় স্বয়ং প্রকাশ বেদ্যহীন সংবিদ্ স্বয়ং অনুভূত বা প্রকাশিত হন।

ষোড়শ প্রকরণ

নিদ্রাকেই কি ব্রহ্ম কহে ?

অতঃ সুষুপ্তিরেব স্যাৎ জড়দর্শনসংগতা।
সমাধৌ ভাসমানা যা চিতিঃ সা ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৯২ ॥

এই কথা শুনিয়াও পরশুরামের তৃপ্তি হইল না। আরো অধিক শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় তিনি ফের কহিতে লাগিলেন :— "ভগবন্, এই কথা বড়ই বিচিত্র। অতএব আমাকে এই সব বুঝাইয়া দিন যে অষ্টাবক্র রাজা জনককে যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন আর রাজা জনক যাহা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এইরূপ আনন্দদায়ক আখ্যান আমি কোথাও শুনি নাই।

তখন দত্তাত্রেয় কহিতে লাগিলেন :—"পরশুরাম, তাহার পর কি হইয়াছিল তাহাই শুন। তপস্বিনী চলিয়া যাইবার পর ব্রাহ্মণগণের সহিত অষ্টাবক্র রাজা জনকের নিকট পুনরায় আসিয়া তিনি সেই মহত্বপূর্ণ বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন করিয়া কহিতে লাগিলেন :—"রাজা বিদেহাধিপতে তপস্বিনী জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ের যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপ হইবার জন্য আমার ভালরকমে বুঝা হয় নাই। আপনি সেই সৎতত্ত্বকে সরল রীতিতে বুঝাইয়া দিন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা জনক রহস্যছলে কহিতে লাগিলেন :— 'অষ্টাবক্র, বলিতেছি, শুন। তোমার প্রশ্ন এই কি সেই পদ জ্ঞেয়

আর অজ্ঞেয় কিরূপে হয় ? তুমি এইরূপ বুঝ যে সেই তত্ত্ব সর্ব্বথা অজ্ঞেয় নহে আর সর্ব্বদা জ্ঞেয়ও নহে। যদি তুমি এইরূপ বুঝ যে সেই তত্ত্ব সর্ব্বদা অজ্ঞেয় হইতেন তাহা হইলে সৎগুরু উঁহার সম্বন্ধে উপদেশ কি করিয়া দিতে পারেন ? কিন্তু সদ্‌গুরু উপদেশ অবশ্য দেন এইজন্য এই বিষয়ে অর্থাৎ উপদেশের জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতেই হয়। এই পরমপদকে জানা অত্যন্ত সরলও হয় আর অত্যন্ত কঠিনও হয়। যাঁহার দৃষ্টি বাহ্য পদার্থ হইতে বিরত হইয়া গিয়াছে উহার জন্য উহা সুলভ হয় আর যাঁহার দৃষ্টি বাহিরেই থাকে উহার অর্থাৎ বহির্মুখের জন্য উহা (সেই পরমপদ) দুর্লভ হন

সত্যকথা বলিলে উঁহা না ত জানিবার যোগ্য হন কিম্বা নিরুপণ করিবার যোগ্য হন অর্থাৎ উহা অনির্ব্বচনীয় আর আনিরুপনীয় হন। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ রীতিতে তাহা জানা ও যায় আর বুঝাও যায়, তুমি যে দৃশ্য দেখিতেছ উহা জানিতে পার বলিয়া উহাকে বেদ্য বলিতে পার এইজন্য তুমি উঁহারই সূক্ষ্ম বিচার কর যাহা তোমার ভাসমান হইতেছে। উহা ভাণশক্তি, জ্ঞান-কলা অথবা ভান ভাসিত হয় যে অনেক আকারে তাহা হইতে ভিন্ন হন আর সব প্রকারের সাকার ভাণের উহা আশ্রয়ও হন অর্থাৎ অনেক আকারের ভাসিত ভানের ভাসক হইতে ভিন্ন। উহাই পরমপদ হন। অষ্টাবক্র ঠিক ঠিক বুঝ; যাহা জ্ঞেয় হয় তাহা জ্ঞান হয় না কারণ উহা (জ্ঞেয়) স্বয়ং প্রকাশিত হয় না। বেদ্য অথবা জ্ঞেয় পদার্থ যাহার সহায়তায় জানা যায় সেই সংবিদ্ বেদ্য নহে—এই বেদ্য হইতে উহা ভিন্ন হন।

বেদ্যের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হয় কিন্তু ইহার জন্য সংবিতে কোথাও কোনও ভেদ উৎপন্ন হয় না; সেইপদ সব আকারে এক রূপেই থাকেন।

ভেদ বেদ্যের স্বভাব হয় উহা সংবিদ্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না। বেদ্যতে অনেক আকার ভাসিত হয় এইজন্য আকার রহিত সংবিদ্‌কে বেদ্য পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া তুমি খোঁজ কর। এই সংবিদ্‌ বেদ্যত্বকে দূর করিবার পর নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় বেদ্য—অনুভবগম্য—হইয়া যাইবে। নতুবা উঁহার অনুভব হইতে পারে না। প্রতিবিম্বের অনুকরণকারী দর্পণের মত সেই শুদ্ধচিতি দৃশ্যের আকার ধারণ করিয়া অনেকরূপ হন। কিন্তু যে জানে তাহার অর্থাৎ জ্ঞাতা সংবিদ্‌স্বরূপ হওয়ার কারণ জ্ঞেয় অর্থাৎ জানার যোগ্য—নহে। এইজন্য প্রথমে তুমি এই প্রকারে আপন স্বরূপকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে খোঁজ কর। প্রথমে ইহা দেখ যে তুমি শরীর নহ, প্রাণ নহ, আর মনও নহ কারণ এই যে ইহারা অস্থির ও অনিত্য হয়। তুমি নিত্য হও। সপ্তাতুর পিশু কিন্তু এই শরীর তোমার স্বরূপ কি করিয়া হইতে পারে? আর যখন ইহা "আমার" রূপে অন্য বিষয়* হইয়া ভাসিত হইতেছে তখন উহা (শরীর) অহং ভাবনা হইতে মুক্ত থাকে। অর্থাৎ "আমার শরীর" কহিবার সময় উহার উপর অহংভাব থাকে না। বিচার করিলে এই কথা প্রাণ ও মন সম্বন্ধেও বলা যায় অর্থাৎ প্রাণ ও মনের উপর অহংভাব থাকে না। কিন্তু পরমচৈতন্য অহংএর স্ফুর্তিকে কখনও ছাড়েন না। অতএব ঐ সংবিদ্‌ সর্ব্বজ্ঞ হন।

যিনি উত্তম বুদ্ধিমান হন তিনি তত্ত্বের উপদেশের সময়েই স্বস্বরূপের দর্শন করিয়া লন। এই দৃষ্টির অর্থ চর্ম্মচক্ষু নহে—মনশ্চক্ষু হয়। যাহার দ্বারা স্বপ্ন দেখা যায় উহা মুখ্য চক্ষু হয়। এখন আমি এই বুঝাইতেছি যে মনশ্চক্ষুর অন্তমুর্খতার কি অর্থ হয়। যতক্ষণ না চক্ষু অন্তর্মুখ হয় ততক্ষণ ব্যবহারেও কিছু দেখা যায় না। যদি কিছু দেখিতে হয় ত অন্য পদার্থ হইতে চক্ষুকে সরাইয়া সেই বস্তুর উপর লাগানর দরকার তবেই স্পষ্ট দেখা যায়। নতুবা সামনে আসিলেও বস্তু দেখা যায় না অর্থাৎ ভাসিত হইলেও উহার উপর চক্ষু না রাখিবার জন্য অভাসিতই হইয়া যায়। এইরূপ কান, জীভ আদির দশা হয়। মনে যে সুখ-দুঃখ হয় তাহাও এইরূপ। যদি ইহার উপর মন না যায় তাহা হইলে এই সুখ-দুঃখ জানা যায় না। অতএব জান যে সেই বস্তুর উপর একরূপতা (তন্ময়তা বা একাগ্রতা) হওয়ার নামই দৃষ্টির অন্তমুখতা হওয়া। অন্তর্মুখ শুদ্ধচিত্ত স্বস্বরূপের পরিচয় করিয়া দেয়। এই বিষয়কে অধিক স্পষ্ট করিয়া পুনরায় বুঝাইতেছি; ধ্যানপূর্ব্বক শুন। চিদাত্মা মনের গোচর আর অগোচরও হন। এই কথা বুঝিতে বেদশাস্ত্রে যে বিচার করে এমন পণ্ডিতেরও ভুল হয়। কোনও বাহ্য পদার্থের মনোগোচর হওয়ার জন্য দুই ক্রিয়া হয়; প্রথম অন্য পদার্থ হইতে মনকে সরান আর দ্বিতীয় সেই পদার্থে মনকে লাগান। অন্য পদার্থ হইতে কেবল মনকে সরাইলে তটস্থ (ধ্যানস্থ) অবস্থায় ইপ্সিত পদার্থ দেখা যায় না, উহাকে দেখিবার জন্য উহার উপর তৎপর হওয়া

অত্যন্ত আবশ্যক। এইরূপে সব পদার্থ এই দুই ক্রিয়ার যোগে অর্থাৎ ত্যাগ ও গ্রহণের দ্বারা ভাসিত হইতেছে কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য সীমাহীন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হন বলিয়া অতএব উঁহার দর্শন এই প্রকারে হইতে পারে না। অন্য পদার্থ হইতে ভাবকে (মনকে) সরাইয়া লইবার পর আর কিছু অধিক ক্রিয়াবিনাই অর্থাৎ ক্রিয়া না করিয়াই উঁহাকে জানা যায়। উদাহরণার্থ সম্মুখস্থিত দর্পণে কিছু প্রতিবিম্ব দেখিতে হইলে অন্য পদার্থকে সরাইয়া সেই বিশিষ্ঠ পদার্থকে সম্মুখে আনিতে হয়; কিন্তু যদি দর্পণে আকাশকে দেখিতে হয় ত অন্য পদার্থকে কেবল দূর করিলেই অর্থাৎ সরাইলেই—কোন অন্য পদার্থকে সম্মুখে আনিবার আবশ্যকও হয় না আকাশ দেখা যায় কারণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবার জন্য আকাশ দর্পণে থাকেই—অন্য প্রতিবিম্বে আচ্ছাদিত হইবার কারণ কেবল উহাকে দেখা যায় না, সকলের অনুগত আর সকলের আশ্রয় হয় বলিয়া অন্য পদার্থকে দূর করিলেই উহাকে (আকাশকে) দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বগত, সর্ব্বাধার আর সর্ব্বকালে একরূপ শুদ্ধ চৈতন্য দর্পণে আকাশের মত হৃদয়ে পূর্ণরূপে ভরিয়া রহিয়াছেন। মনকে অন্য পদার্থ হইতে সরাইলেই উঁহার অনুভব হইতে থাকিবে। কোন অন্য পদার্থকে মনের সামনে আনিবার আবশ্যকতা থাকে না আর এই কারণে উহা কোন পদার্থের মত বিশিষ্ঠাকারে বেদ্য নহেন। উহা স্বভাবতই শুদ্ধমনের অনুভবে আছে অতএব উহাকে বেদ্যও বলা যাইতে পারে। মনের অন্য আকার—সঙ্কল্পের নষ্ট হওয়াই মনের শুদ্ধি হয়। স্বস্বরূপের প্রত্যক্ষ

অনুভব করিবার জন্য ইহাই মুখ্য সাধন। যতক্ষণ না চিত্ত শুদ্ধ ততক্ষণ জ্ঞান কি করিয়া হইতে পারে? আর শুদ্ধ অন্তঃকরণে জ্ঞান প্রকট হওয়া বিনা অর্থাৎ প্রকটিত না হইয়া কি করিয়া থাকিতে পারে? এই তত্ত্বের খোঁজ বা সাধন করিলে অন্য সব উপায় ক্ষীণ হইয়া যায়। কর্ম্ম, উপাসনা, বৈরাগ্য আদি মার্গ চিত্তশুদ্ধির জন্য নির্ম্মিত (কল্পিত) হইয়াছে, ইহাদের অন্য উপযোগ কিছুই নাই। অষ্টাবক্র শুদ্ধচিত্তেই সেই পরমপদের অনুভব হইতে পারে।"

ইহা শুনিয়া অষ্টাবক্র পুনরায় কহিতে লাগিল:—"মহারাজ, আপনি বলিতেছেন যে অন্য পদার্থ হইতে মনকে কেবল সরাইলে সেই পরম চৈতন্যের অনুভব হইতে থাকে; তাহা হইলে ত নিদ্রায় ও মন সেইরূপ অন্য পদার্থ হইতে সরিয়া থাকে। নিদ্রায় আপনাআপনি অনুভব হওয়া চাই। তাহা হইলে অন্য উপায় (সাধন) করিবার কি আবশ্যকতা হয়? মনুষ্য নিদ্রা যাইয়াই কৃতার্থ হইতে পারে।

এই উল্টা প্রশ্ন শুনিয়া রাজা জনক কহিতে লাগিলেন:— "অষ্টাবক্র, তুমি শান্তচিত্ত হইয়া শুন। নিদ্রায় মন সর্বথা পরাবৃত্ত থাকে অর্থাৎ নিদ্রায় মনে স্থূল কোন বিষয় থাকে না। ইহা সত্য। কিন্তু সেই সময় মনের মনত্ব তমদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। অতএব সেই মন সেই স্বরূপকে কি করিয়া ব্যক্ত করিবে? কখনও করিতে পারে না। দর্পণে কাজল বা কালী লেপিয়া অন্য পদার্থকে সরাইয়া দিলেও আকাশ দেখা যায় না।

এইরূপ নিদ্রায় লিপ্ত হইয়া যাইবার পর বাহ্য পরাবৃত্ত মন চৈতন্যের অনুভব করে না। নতুবা তোমার কথানুসারে চৈতন্যের অনুভব কাষ্ঠেরও কেন না হইবে? ইহাতে সিদ্ধ হয় যে স্বরূপদর্শন কেবল নিঃসঙ্কল্প মনেই হইতে পারে ইহা ভিন্ন চৈতন্য ভাসিত হন না। সদ্যজাত শিশুরও স্বস্বরূপ ভাসমান হয় না; ইহার কারণ মন-পটে তমের লেপই হয়। আরো ঠিক ঠিক বুঝিয়া লও। কাজল-লিপ্ত দর্পণে কাজলের প্রতিবিম্ব পড়ে। উহা কেহ না দেখিলেও ইহাতে ইহা বলা যায় না যে উহা (কাজলের) প্রতিবিম্ব নাই। সম্মুখের পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করাই দর্পণের স্বভাব। অন্য কথা যে উপরে কাজল লিপ্ত থাকায় উহাকে (প্রতিবিম্বকে) দেখা যায় না। এইরূপ সুষুপ্তিতে মন নিদ্রামগ্ন হইলে বস্তুতঃ অন্য পদার্থ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে না যাহার জন্য উহা চৈতন্যকে ব্যক্ত করিতে পারে না। এই কারণে জাগৃত হইলেই নিদ্রার স্মরণ হইতে থাকে। ইহা ভিন্ন সেই অবস্থায় অজ্ঞানেরও অনুভব হয় এই বিষয় একাগ্রচিত্তে বিস্তারপূর্ব্বক শুন। মনের দুই রকম স্থিতি—(১) প্রকাশ অবস্থা (২) বিমর্ষাবস্থা। যখন মন বাহ্য পদার্থ হইতে বিশ্রান্তি লয় অর্থাৎ সর্ব্বসংকল্পরহিত হয়। তখন প্রকাশ অবস্থা হয় আর যখন উহার সম্বন্ধে সংকল্প উঠিতে থাকে তখন বিমর্ষাবস্থা হয়। প্রকাশ অবস্থায় পদার্থের কোনও ভেদ জানা যায় না, এই সময় মন নির্ব্বিকল্প স্থিতিতে থাকে। বিমর্ষাবস্থায় পদার্থের বিমর্ষ অথবা বিচার হইতে থাকে। এই সময় মনের সবিকল্প স্থিতি হয়। "ইহা অমুক হয়"

এই ভেদ উৎপন্ন না হইলে চিৎপদার্থের দর্শনরূপী প্রকাশ নির্ব্বিকল্প থাকে ; আর এই অবস্থার আধারে প্রকটিত হয় যে অর্থাৎ প্রকট্য "ইহা অমুক হয়" এর ভেদাত্মক বিমর্ষ সবিকল্পক হয়। বিমর্ষ দুই প্রকারের হয় :—এক অভিনব আভাস হয় আর অন্য স্মৃতিরূপ হয়। প্রথমের (অভিনব আভাসের) স্বরূপ নবনব অনুভবে পাওয়া যায়। অন্য (স্মৃতিরূপ) পূর্ব্ব অনুসন্ধানাত্মক হয়। ইহার স্বরূপ সেই আকার হয় যাহা পূর্ব্বসংস্কার বশে মনে উৎপন্ন হয়। এই রকমে মন সদাই এই দুই শক্তির সহিত যুক্ত থাকে। নিদ্রাকালে যে নির্বিবকল্প জ্ঞান থাকে উহা সুষুপ্তি হয়, সুষপ্তি অবস্থার নির্ব্বিকল্পতা অতিশয় তমাচ্ছন্ন (অস্পষ্টতা পূর্ণ) এই জন্য উহাকে মূঢ়দশা কহে। উহা দীর্ঘকালিক হয়। জাগ্রত অবস্থায় অনেক সবিকল্প ভাণ হয় অতএব ইহাকে অমূঢ়দশা কহে। এইজন্য বিদ্বানেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে যদ্যপি দীপে পূর্ণ প্রকাশভরা থাকে তথাপি উহাতে বিমর্ষ না হওয়ার কারণ অর্থাৎ উহার জ্ঞান না হওয়ার কারণ উহা মূঢ়দশায় থাকে। শুদ্ধচৈতন্যে প্রথম প্রকটিত হয় যে বাহ্য ভাস—অব্যক্ত তত্ত্ব অথবা মহাশূন্য নিদ্রস্বরূপ হয়। "কিছুই নাই" এর সর্ব্বসামান্য ভাবনা দৃশ্যভাসের অভাবেই—সুষুপ্তিও নির্ব্বিকল্পতা। জাগৃত অবস্থায় পদার্থের দর্শন হইবার সময়েও সেই সময় পর্য্যন্ত মন নির্বিকল্প অবস্থায় থাকে। কিন্তু পরক্ষণে বিকল্প প্রকট হইবার কারণ সেই অবস্থা (নির্বিবকল্প অবস্থা) নষ্ট হইয়া যায়। বিবেকী পুরুষ বলেন যে সুষুপ্তি—অবস্থায় অব্যক্ত শক্তির

নির্ব্বিকল্পতার দৃঢ়তার কারণ 'মন বিলীন হইয়া যায়" নতুবা পদার্থকে দেখিতে থাকিলেও মন সেই সময়ের জন্য লীনই থাকে। অষ্টাবক্র, আমি তোমায় আপন অনুভাবের রহস্য বুঝাইতেছি। এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারবান্ পণ্ডিতও মূঢ় হইয়া যান। (১) নির্ব্বিকল্প সমাধি (২) সুষুপ্তি (৩) পদার্থদর্শন তিনই নির্ব্বিকল্প দৃষ্টিতে একই প্রকারের সমান হয়। এক পদার্থকে ছাড়িয়া অন্যের উপর যাইবার সময় মন যদ্যপি গতিদশায় থাকে তথাপি একই পদার্থে লাগিয়া থাকার কারণ উহা বিকল্পরহিতই হয়। অতএব সংসারে দেখা যায় যে তিন ভেদ তাহা স্বরূপতঃ ভাসকের না হইয়া ভাস্যের ভেদের কারণ হয়, সমাধিতে কেবল চৈতন্য ভাসিত হন, সুষুপ্তিতে অব্যক্তের অনুভব আর পদার্থ দর্শনকালে মর্য্যাদিত অর্থাৎ সীমাবদ্ধ আকারের জ্ঞান হয়। তাৎপর্য্য এই হয় যে ভাস্যই তিন প্রকারের হইয়া যায়। কিন্তু এই ভেদ হইবার পরেও জ্ঞান—কেবল জ্ঞান অথবা শুদ্ধ চৈতন্য—স্বয়ং নির্ব্বিকল্পই হন। এইজন্য উহাকে "প্রকাশনিবিড়" কহে। ইহার অর্থ নির্ব্বিকল্পতাতে পূর্ণ ব্যাপ্ত হওয়া।' ইহার মধ্যে সমাধিও সুষুপ্তি স্থিতির অধিক সময় পর্য্যন্ত ভাসিত হইবার কারণ সব লোকের ইহার স্পষ্ট জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু পদার্থদর্শন সম্পূর্ণ ক্ষণিক হইবার জন্য সকলের উহা স্পষ্ট বোধ-গম্য হয় না। যদি সমাধি ও সুষুপ্তির স্থিতিও এইরূপ ক্ষণিক হইত তাহা হইলে উহাদেরও জানা যাইত না। যদি সুষুপ্তি ক্ষণিক হইত তবে সূক্ষ্মদৃষ্টিবান্ পুরুষ দীর্ঘ সুষুপ্তির অনুভবের আধারে উহাকে জানিতে পারিত; কিন্তু পরিচয় না থাকার জন্য লোক সূক্ষ্ম সমাধিতে

জানিতে পারে না। ব্যবহার দশায়ও সবপ্রাণীর অল্প কালিক সমাধি অবশ্য প্রাপ্ত হয় কিন্তু পরিচয় না থাকার জন্য লোকেরা উহা জানিতে পারে না। জাগৃত অবস্থার যে বিমর্ষশূন্য—সঙ্কল্পশূন্য অবস্থা আসে উহাকে সমাধি কহে। বিমর্ষের যে নাশ উহাই সমাধি হয়। এইজন্য সুষুপ্তির অবস্থায় আর পদার্থ দর্শন অবস্থায় সমাধির স্থিতি থাকে। কিন্তু উহাদিগকে মুখ্য সমাধি বলা যায় না। কারণ ভেদের অনুভব করায় যে বিমর্ষের সংস্কার সেই সময়ে গর্ভে থাকে অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়ের অগোচরে থাকে আর এই অবস্থার অনন্তর সংস্কার-রূপে উদয় হয়। জাগৃতিতে যে সব পদার্থের ভাণ হয় তাহাও অবিমর্শ স্বরূপ অর্থাৎ নিঃসংকল্প হইয়া থাকে। তুমি ইহা হইতে আরো অধিক স্পষ্ট রীতিতে বুঝিয়া লও। সর্ব্বপ্রথমে “কিছু ও নাই” এইরূপে প্রকট হয় যে অব্যক্ত তত্ত্ব যাহার সামান্য স্বরূপ হয় উহার ভাণ অত্যন্ত অভাবরূপ নাস্তিতাই হয়। চৈতন্যের যে এই জড় শক্তি উহাই সুষুপ্তি অবস্থা হয়। সুষুপ্তিতে “কিছুও নাই” এর যে স্থিতি ভাসমান হয় উহার কারণ সুষুপ্তিতে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান থাকিলেও উহা জড়সিদ্ধ হয়। কিন্তু সমাধিতে ভাসমান হয় যে চৈতন্য তাহা ব্রহ্মস্বরূপ হন। সেই তত্ত্ব সর্ব্বদেশকালের মর্য্যাদাতে রহিত অর্থাৎ দেশকালের দ্বারা অনবছিন্ন আর “কিছুও নাই” এই ভাসের ও নাশক সর্ব্বথা অস্তিত্বরূপ হন। অষ্টাবক্র, ফের নিদ্রাকেই ব্রহ্ম কি করিয়া বলা যায়? তোমার কথানুসারে কেবল নিদ্রিত হইয়া মনুষ্য কখন ও কৃতার্থ হইতে পারে না।

সপ্তদশ প্রকরণ

জনকের সানুভব।

অস্মান্নিরোধনে কিং স্যাৎ অহমানন্দনির্ভরঃ।
সমাধাবসমাধৌ বা সত্যপূর্ণস্বভাবকঃ ॥ ১০৩।

পরশুরাম. রাজা জনক এইরূপ অষ্টাবক্রকে বুঝাইলেন। সব কথা শুনিয়া অষ্টাবক্র রাজা জনককে আরো কিছু প্রশ্ন করিতে লাগিল। উহা তুমি সাবধানে শুন। সে কহিতে লাগিল :—

"মহারাজ আপনি বলিলেন যে ব্যবহার করিবার সময়েও ছোট ছোট সমাধি হয় এতএব বলুন যে এই নির্ব্বিকল্প সমাধিগুলি কোন কোন অবসরে হইতে থাকে।

প্রশ্ন শুনিয়া মহাত্মা জনক কহিতে লাগিলেনঃ— বলিতেছি শুন। যাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্তি আছে তাহার সর্ব্বপ্রথমে দেখা হইলে অর্থাৎ মিলনে গাঢ় আলিঙ্গন করিবার সময় বাহিরে ও ভিতরে কিছুও ভাসমান হয় না আর নিদ্রারই অবস্থায় থাকে। এইজন্য এই স্থিতিকে সমাধি কহা যাইতে পারে। অথবা যদি বহুদিনের কোন বস্তুর বড় ভারি ইচ্ছা হয় আর মনে এই ভাব হইয়া গিয়াছে যে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না সেই সময় সেই বস্তু অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইবার পরে ও প্রত্যেক মনুষ্যের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইবে। অথবা—মনে কোন বস্তুর কল্পনা পর্য্যন্ত না থাকিলে তথা আনন্দের সহিত আর

পূর্ণ নির্ভয় হইয়া পথে যাইবার সময়ে অকস্মাৎ যদি কালের সমান ব্যাঘ্রআদি ভয়ঙ্কর প্রাণী দেখিতে পাইলে চিত্তের যে স্থিতি উৎপন্ন হয় উহা সমাধিই হয়। অথবা যদি ইহা শুনা যায় আমার অত্যন্ত প্রেমাস্পদ ও সারা সংসার প্রতিপালনকারী হর্তাকর্তা পুত্র হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে তাহা হইলেও মন নির্বিকল্পক সমাধিতে পোঁছায়। এই অবস্থায় অন্তর বাহ্য কোন ভাণ থাকে না আর নিদ্রাও থাকে না। অতএব উহাও সমাধি হয়। সমাধির আরও অনেক অবসর বার বার আসিতে থাকে। এই সমাধিগুলি জাগৃতি, স্বপ্ন আর সুষুপ্তির সন্ধিকালে হয়। যখন বহুদূরের বস্তুকে সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা দেখিতে হয় তখন মন দূরে চলিয়া যায়। শরীরের উপর থাকিবার সময় মন দেহাকারে থাকে আর যখন যে পদার্থে যায় তখন মন তদাকার হইয়া যায়। কিন্তু দুইএর মধ্য অবস্থায় উহা নির্বিকল্প থাকে। বেশ এই অবস্থাকে সদাই ধ্যানে রাখিলে সব কার্য্য সিদ্ধি হইয়া যায়। অধিক বলিবার কোন আবশ্যক নাই, ব্যবহারের কোন ভাণে মন অখণ্ড একাকার থাকে না—অনেক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডিত ভাণগুলি—জ্ঞানের সমূহে পারিণত হইয়া ব্যবহার হইতে থাকে। এইজন্য সুগত কণাদ আদি মতবাদী বলে যে আত্মা আর বুদ্ধি প্রতিক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে। এই ক্ষণিক অথবা খণ্ডজ্ঞানের মধ্যে—অর্থাৎ চিত্ত হইতে এক পদার্থ সরিয়া অন্য পদার্থ আসা পর্য্যন্ত—নির্বিকল্প অবস্থার অনুভব হইতে থাকে। অষ্টাবক্র, যে বিচার করিয়া জানে যে উহার জন্য প্রতিক্ষণ সমাধি নাই তাহা

হইলে খরগোশের সিংএর মত উহা কোথাও নাই। অধিক আর কি বলিব।

এই শুনিয়া অষ্টাবক্র পুনরায় কহিল :—"রাজন, যখন ব্যবহারে সকল লোকের সমাধি প্রাপ্ত হইতে থাকে তখন এই সংসার এখনও কি করিয়া চলিতেছে? ইহা লোপ কেন হয় নাই? সুষুপ্তি অবস্থায় অনুভবে আসে যে নিৰ্ব্বিকল্প জ্ঞান তাহাতে জড় অব্যক্তের ভাণ হয় অতএব উহার দ্বারা মোক্ষ মিলে না। কিন্তু নির্ব্বিকল্প জ্ঞানেই কি শুদ্ধ চৈতন্যের অনুভব হয় না? তাহা হইলে পুনরায় নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইলেও এই সংসার সমাপ্ত (লোপ) কেন হয় না? নির্ব্বিকল্প সমাধি মোক্ষের মূল আর সব অজ্ঞানের নাশক শুদ্ধ জ্ঞান হয়। ফের ইহা কি? রাজন, আমাকে কেবল এত পর্যন্ত বুঝাইয়া দিন। আমার সব সংশয় নষ্ট হইয়া যাইবে।"

তখন রাজা জনক কহিতে লাগিলেন :—"শুন, আমি তোমাকে সব পরমরহস্য বুঝাইয়া দিতেছি। এই সংসার অনাদিকাল হইতে অজ্ঞানে প্রবৃত্ত আছে। সুখ দুঃখের অনুভবে উহার (সংসারের) প্রবাহ বরাবর সমানভাবে চলিতেছে। সব জীব সদাই স্বপ্নের মত উহার অনুভব করিতেছে উহার (অজ্ঞানের) নাশ জ্ঞানের দ্বারা হয়। কিন্তু অজ্ঞানকে নাশ করে যে জ্ঞান তাহা সবিকল্প হওয়া চাই, নির্বিকল্প জ্ঞানে অজ্ঞান দূর হয় না। নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্বয়ং কাহারো বিরোধি নহে। সবিকল্প জ্ঞানের আশ্রয়ে নানা আকারে ভাসমান হইবার জন্য উহা (নির্বিকল্প

জ্ঞান) অধিষ্ঠান হয়। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের অর্থ কেবল জ্ঞান। বিকল্প উৎপন্ন হইবার পর উহা সবিকল্প জ্ঞান হইয়া যায় এই দৃষ্টিতে অজ্ঞানও সবিকল্প জ্ঞানই হয়। কার্য, কারণাদিরূপে উহা (অজ্ঞান) অনেক প্রকারের হয়। আত্মস্বরূপের বিস্মরণ কারণকে—অজ্ঞান কহে। চিদাত্মা পরিপূর্ণরূপে ভরিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ বিভূ ব্যাপক—উহাতে কোন সীমার বন্ধন নাই। সীমাকারক দেশকালাদিরও সিদ্ধি উঁহার দ্বারা (চিদাত্মার দ্বারা) হয়। এইরূপ চৈতন্যের যে অপূর্ণ ভাণ হয় অর্থাৎ যখন এইরূপ বোধ হয় যে "আমি এই হই, এখন এখানে থাকি" উহার কারণ—অজ্ঞানের স্বরূপ হয়। পুনরায় দেহাদির সত্বতে উহার ভান হওয়ার কারণ অজ্ঞানেরই শাখা হয়। এই কার্য্য—অজ্ঞান হয়। এই অজ্ঞানের নিবারণ হওয়া ভিন্ন সংসার লয় হয় না। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ বিভূ আত্মার শুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান দূর হয় না। আত্মস্বরূপের জ্ঞান দুই প্রকারের হয়—পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান সদ্‌গুরু আর শাস্ত্রের দ্বারা হয়। কিন্তু এই পরোক্ষ জ্ঞান মোক্ষরূপী পুরুষার্থের প্রাপ্তি করিয়া দিতে সাক্ষাৎ কারণ হয় না। তোমার পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট হয় যে শাস্ত্র দ্বারা আর শ্রদ্ধায় প্রাপ্ত হইয়াছে যে পরোক্ষ জ্ঞান তাহা ফলদায়ক হয় না। প্রত্যক্ষ অথবা সাক্ষাৎ জ্ঞান সমাধির পরিপাক হইলে উৎপন্ন হয়। ইহা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান অজ্ঞান আর অজ্ঞান জন্য সংসারের নাশ করিতে সমর্থ। উহা মহাশুভ ফল প্রাপ্ত করিয়া দিতেও সমর্থ। সেই

ফল জ্ঞানপূর্ব্বক সমাধিতে মিলে। যদি অজ্ঞ পুরুষের সমাধি হইয়া যাইলেও কোন লাভ হয় না। উদাহরণার্থ, রত্ন চিনিবার যাহার জ্ঞান নাই অর্থাৎ যিনি জুহুরী নহেন এমন অজুহুরীর নিকট প্রত্যক্ষ রত্ন দেখিতে থাকিলেও কিন্তু সে অজ্ঞনতা বশতঃ জানিতে পাবে না যে সে রত্ন দেখিতেছে। যাহার রত্নের জ্ঞান আছে অর্থাৎ জুহুরী সে উহা দেখিলেই বুঝিতে পারে। মনুষ্য যত বড় চতুর হউক, রত্ন পরীক্ষকই হউক আর রত্ন সম্মুখে আসিলেও উহার দিকে ধ্যান না হইলে অর্থাৎ উহার প্রতি মনযোগ না করিলে উহাকে জানিতে পারে না। অষ্টবক্র, এইরূপ যদি অজ্ঞানের কারণ বিজ্ঞান জন্য মহাফল মূর্খের না মিলিলে ত কি করা যাইতে পারে? কোনও পণ্ডিতে এই বিষয়ের বহুমনন কবিলেও, কিন্তু এ বিষয়ে সত্য আস্থা (বিশ্বাস) না থাকিবার কারণ উহারও এই জ্ঞান হয় না। সেও মূর্খ বা অজ্ঞানী হইয়া থাকে। উদাহরণার্থ, কোন মনুষ্য আকাশকে ত প্রত্যক্ষ দেখে কিন্তু সে ইহা জানে না যে সে অমুক তারা দেখিতেছে সে ত উহার চিহ্ন জানে না অথবা সে জানিয়াও জানে না। শুকতারার কথা ধর। যদি কেহ চায় যে ইহা সে দেখুক তাহা হইলে সে ইহা জানিয়া লয় যে উহা কোন দিকে থাকে কত বড় ইত্যাদি আর পুনরায় উহার প্রতি অনুসন্ধান করিয়া উহার শীঘ্র পরিচয়ও করিয়া লয়। সারাংশ এই হয় যে অজ্ঞানের জন্য আর নিরুৎসকতার জন্য, বরাবর নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইলেও, মূর্খলোক আত্মস্বরূপকে জানিতে পারে না। নিকটস্থ নিধিকে

বা অর্থকে ভুলিয়া দুর্ভাগ্যবশে ভিক্ষা করিতে থাকে, ভিকারীর মত ভড়কাইতে ভড়কাইতে হাস্যাস্পদ হয়। ফলতঃ ব্যবহারের সময়ে অনুভাবে আসে যে ক্ষণিক সমাধি সব অবস্থায় সংসারমুক্তির নিরুপযোগী হইয়া যায়। এইজন্য নির্বিকল্পস্থিতিতে থাকিলেও অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না।

অষ্টাবক্র, আত্মস্বরূপকে চিনিবার জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক হয় তাহা সবিকল্পক হওয়া চাই। সংসারের বীজরূপে অজ্ঞানকে উহাই (সবিকল্পক জ্ঞানই) দূর করিতে পারে। যখন অনেক জন্মের পুণ্য উদয় হয় তখন সংসার হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়, নতুবা কোটীকল্পও অতীত হইয়া যায়। প্রথমতঃ প্রাণীতে জন্মমেলা অত্যন্ত কঠিন; তাহার পর মনুষ্য জন্মমেলা বড়ই দুর্লভ। ফের সূক্ষ্মবুদ্ধি মেলা আরো অধিক দুর্লভ। এই সংসারে স্থাবরের একশতাংশেও চেতন দেখিতে পাওয়া যায় না আর মনুষ্যের সংখ্যা সমস্ত প্রাণী হইতে একশতাংশের কম হয় আর ফের ইহার মধ্যে পশুতুল্য মনুষ্যকোটী হয়। তাহারা না ভালমন্দ জানে আর না পাপপুণ্যকেই জানে। শেষ ক্রোড় লোক বিষয়সুখের পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকে। পাণ্ডিত্যের ভ্রমে অভিমান করিয়া উহারা বার বার জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। উহাদের মধ্যে বুদ্ধিমানও আছে। কিন্তু উহাদের চিত্তের মলিনতা সম্পূর্ণ নষ্ট না হইবার কারণ উহাদের অদ্বৈত আত্মপদ "কিছুই নাই" বলিয়া বুঝে আর তাহারা নাস্তিক হইয়া যায়। ইহা ঠিকও হয় যে অদ্বৈত পরম পদ ঈশ্বরের মায়ায় আচ্ছাদিত হয়; ফের উহার মায়ায় অন্ধ হইয়া হতভাগ্য লোক উহাকে কি করিয়া পাইবে? এই পরম-

পদ মায়ামুগ্ধ পুরুষের বুদ্ধিতে আসে না। কেউ কেউ এইরূপ বর্ণ সংকর হয় যে সেই পদকে বুঝিয়াও এক নিজের মতের অভিমান করিয়া কুতর্ক করিতে থাকে। আহা! এই মায়া এত প্রবল যে লোক এই পদ দেখিয়াও কুতর্ক করিয়া হস্তস্থিত চিন্তামণিকে ফেলিয়া দেয়। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া সদ্বিচার আর শ্রদ্ধার আশ্রয় লয় উহার অদ্বৈতপদে নিষ্ঠা হইলে পরমপাবনপদ মিলিয়া যায়। অষ্টাবক্র, তুমি ইহার ক্রম একাগ্রতায় বুঝিয়া লও। অনন্ত জন্মের পুণ্যের দ্বারা দেবতার প্রতি ভক্তি হয় যাহা দ্বারা উহার আরাধনা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হইতে পারে। ফের দেবতার কৃপায় বিষয়সম্বন্ধে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। পুনরায় সেই পদকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠা—তৎপরতা—হয়। অনন্তর বিষয়বৈরাগ্যের আর পদপ্রাপ্তির সত্য (আসল) উৎকণ্ঠার শোভা দেওয়ার যোগ্য শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবার পর প্রসঙ্গ বশতঃ (কালক্রমে) সদ্গুরুর সাক্ষাৎ হয়। উহার উপদেশে অদ্বৈত পরমপদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান পরোক্ষেই হয়। অর্থাৎ এই সময় কেবল এই ভাবনা উৎপন্ন হইয়া যায় যে অদ্বৈতপদ অবশ্য আছে। ফের সাধকের সেই অদ্বৈত আত্মস্বরূপের সম্যক্ বিচার করিতে হয়। অনন্তর সুবিচারের সহায়তায় ক্রমে ক্রমে উহার উপপত্তি (যুক্তি) জানা যাইতে থাকে। আর সব সন্দেহ নষ্ট হইয়া যায়। পুনরায় নিশ্চয় করা হইয়াছে যে আত্মস্বরূপ অদ্বৈততত্ত্ব তাহার বড় দৃঢ় নিশ্চয়ের দ্বারা নিদিধ্যাসন করিতে হয়। দীর্ঘ প্রযত্ন আর বলৎকারের দ্বারা চিত্তকে একাগ্র আর তদাকারে রাখিতে হয়। পুনরায় "সেই তত্ত্ব আমিই হই" ইহার প্রকাশপূর্ণ সবিকল্পজ্ঞানে

যখন নিদিধ্যাসন পূর্ণ হইয়া যায় তখন এই সংসারের কারণ অজ্ঞান অবশ্য নষ্ট হইয়া যায়। যখন বিকল্পরহিত জ্ঞান ধ্যানসাধ্য হইয়া সমাধি পর্য্যন্ত পরিপক্ক থাকে তখন অদ্বৈত সাক্ষাৎকার হয়। ইহার পরে কেবল স্মৃতি হইতেই সেই পদের প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে থাকে। "সেই অদ্বৈত পরমাত্মা আমিই হই" এইরূপ সবিকল্পজ্ঞান যখন প্রত্যক্ষ অনুভবে আসে তখন সারা অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। বিকল্প না হওয়াই ধ্যানের পরিপক্ক দশা। বিকল্প কয়েকপ্রকারের হয় নির্বিকল্পস্থিতি একাকারে থাকে। অন্য ভাবনার উদয় হওয়া ছুটিলে বিকল্পের অন্ত হইয়া যায়। বিকল্পের অন্ত হইয়া যাইবার পর নির্বিকল্প অবস্থা হওয়া স্বয়ং সিদ্ধ হয়। বিকল্পের ত্যাগেরই অর্থ নির্বিকল্প শুদ্ধ আত্মস্বরূপ সম্পত্তি। এই বিষয়ে মায়ার প্রবলতার কারণ বড় বড় বিদ্বান্ ও মূঢ় হইয়া যায় কিন্তু উত্তম বুদ্ধিমানের এই পদের অনুভব এক মুহূর্ত্তেই হইয়া যায়। অষ্টাবক্র, অধিকারী পুরুষ উত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ঠ তিনপ্রকারের হয়। উত্তমলোক উপদেশের সময়েই এই আত্মস্বরূপকে চিনিতে পারেন। উহার বিচার আর ধ্যান উভয়েই শুনিতে শুনিতে হয়। এইরূপ অধিকারীর সেই পদের প্রাপ্তিতে কষ্ট হয় না। তুমি এখন আমারই ইতিহাসকে শুনিয়া লও :—

"গ্রীষ্মকাল ছিল, ভূতলে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ছিল। আমি এক রমণীয় বাগানে এক পালঙ্কের উপর আপনার পত্নীর সহিত বসিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি আকাশে অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধী সিদ্ধগণের মধুরবাক্য শুনিতে পাইলাম। আমি সেই পদ "অদ্বৈততত্ত্ব"

সেই সময়ে বুঝিতে পারিলাম। অষ্টাবক্র, আমি ঐ সময়ের মধ্যে বিচার করি, ধ্যান করি আর অন্তে আত্মস্বরূপকে জানিয়াও লই। এইরূপে অর্দ্ধমুহূর্ত্তে সেই পদ ধ্যানে আসিবার পর ফের পরে এক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার নির্বিকল্প সমাধি হইল। আমি আনন্দসমুদ্রে ডুবিতে উঠিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সাবধান হইয়া আমি মনে মনে কহিতে লাগিলাম:—"আহা! পরমানন্দে ভরা এই অদ্ভুত আর অপূর্ব্ব স্থান আমার আজ মিলিল। আমি পুনরায় উহাতে প্রবেশ করিব। ইন্দ্রাদির স্বর্গীয় সুখও ইহার একাংশের তুল্য নহে। সারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখ ইহার সম্মুখে কিছুই নহে। আমার এতদিন বৃথায় কাটিয়াছে। নিজকোষকে (তহবিলকে) না জানিয়া মূর্খ যেমন ভিক্ষা করিতে থাকে সেইরূপ লোক পরমানন্দকে না জানিয়া ভ্রান্তিতে—যত পরিশ্রম করে—আর এক কড়ি মূল্যের বাহিরে বিষয়সুখ সম্পাদন করে। ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি বাহিরের ক্ষুদ্র সুখের জন্য বহু শ্রম করিয়াছি। এখন আমি অসীম আনন্দ ভোগ করিবার জন্য সম্পূর্ণ তৎপর থাকিব। বাহিরে ব্যবহার বহু হইয়া গিয়াছে। এখন পিষ্টপেষণ করিয়া কোন লাভ নাই। পুনঃ পুনঃ সেই অন্ন, সেই পুষ্পমালা, সেই বিছানা, ইহাতে নূতনত্ব কি আছে? ফের ইহাতে স্বাদ কি আছে? অলঙ্কার আর স্ত্রী-ভোগেরও সেই কথা। পূর্ব্বেও উহাদের সেবন করিয়াছি আর এখনও উহাদের সেবন করিতেছি। ইহাতে কি অর্থ হয়? সারা পৃথিবী এই পথে চলিতেছে অতএব আজ পর্য্যন্ত আমার ইহার উপর ঘৃণা বোধ হইল না। বাঃ রে মোহ!"

অষ্টাবক্র, এইরূপে এই বাহ্য সংসারকে তিরস্কার করিয়া ফের অন্তর্মুখ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। সেই সময়ে আমার আর একটি শুভ বিচার মনে পড়িল। আমার এইরূপ বোধ হইতে লাগিল যে:—"আমার চিত্তের এইরূপ মোহ কি করিয়া হইল? আনন্দে পরিপূর্ণ আত্মা ত আমিই হই, তবে ফের কিছু করিবার বিচার (চিন্তা) মনে আমি কেন করিতেছি? এখন আমার কি প্রাপ্ত করিবার আছে? পূর্ব্বে আমার কি অপ্রাপ্যই বা কি ছিল? আর উহা এখন কোথায় মিলিবে? আর কি করিয়া মিলিবে? যদি যাহা আজ অপ্রাপ্ত আছে তাহার প্রাপ্তি কাল হইলেও কি হইবে?—উহা স্থির কিরূপে থাকিবে? দেহ ইন্দ্রিয় আর মন ত স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়। সেইরূপ আমি যখন অখণ্ড একরস চিদাত্মা হই ত এই সবই আমারই ত। ফের এক অন্তঃকরণকে নিরুদ্ধ করিলে কি হইবে? আর নিরুদ্ধ না হয় যে মন অর্থাৎ অনিরুদ্ধ মন কি কোন অন্যের হয়? উহা ত আমারই হয়। সংসারের নিরুদ্ধ আর অনিরুদ্ধ সবই মন আমাতে ভাসিত হইতেছে। ফের একই মনের নিরোধ করিবার আমার ইহা কি মোহ হইয়াছে? কেবল আমার স্বরূপ এইরূপ হয় যে সর্ব্ব মনের নিরোধ করিলেও আমার নিরোধই হইতে পারে না। আমি মহাকাল হইতে বিস্তৃত হই, আমার নিরোধ কোথা হইতে পারে? এইরূপে আমার পূর্ণ আনন্দ স্বরূপে সমাধি কিরূপে হইবে? চিদানন্দে ভরা আকাশ হইতেও পূর্ণ আমার আত্মার শুভ অথবা অশুভ করিতে পারে এমন

কোন ক্রিয়া আছে কি? উহা কি করিয়া হইতে পারে?
আমারই সামর্থ্যে (শক্তিতে) দোহাত্মত্বের কোটিভাস হইতেছে।
যদি উহা হইতে অধিক আভাসাত্মক ক্রিয়া ভাসমান হইতে
থাকিলে ত কি হইবে আর না হইলে বা কি হইবে? আমার
কোনও কর্ত্তব্য নাই আর অকর্ত্তব্য নাই। ফের নিরোধে কি
লাভ? সত্য ও পূর্ণ স্বভাববান আমাতে সমাধি অথবা উত্থান
অবস্থায় সদাই আনন্দপূর্ব্বক থাকি, তাহা হইলে পুনরায় শরীর,
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সব পূর্ব্ব সংস্কারের স্বভাবতঃ যে কর্ম্মে
বিষয়ে অথবা বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছে উহাতে উহাদের প্রবৃত্ত
হইতে দাও, সে যাহা হইতে স্বভাবতঃ নিবৃত্ত হইতেছে সেই
কর্ম্ম বিষয় বা বিচার হইতে উহাদের নিবৃত্ত হইতে দাও।
মনের প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিতে আমার নিঃসঙ্গ চিদানন্দ পূর্ণ আর
সর্ব্বগামী আত্মার কি লাভ অথবা ক্ষতি হইতে পারে?"

অষ্টাবক্র, এইরূপে স্বস্বরূপের অনুসন্ধান শেষ করিবার পর আমার
সদাই স্বস্থতা আর পরমানন্দ মিলিতেছে। আমার প্রকাশের
অন্ত নাই, আমি অত্যন্ত পরিপূর্ণ আর সর্ব্বসঙ্গ রহিত হই।
আমি তোমাকে এই উত্তম অধিকারীর স্থিতি বলিলাম। মধ্যম
অধিকারীর ক্রমশঃ শ্রবণ, মনন আর নিদিধ্যাসন করিতে হয়।
তাহা হইলে তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কনিষ্ঠ অধিকারীর
সাধন পূর্ণ হইলে অনেক জন্মে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ
জ্ঞানযুক্ত সমাধি দুর্ল্লভ হয়। অতএব জ্ঞান রহিত এইরূপ শত
সমাধি হইতে কিছুই হয় না। উহার কোন উপযোগ নাই। ব্যবহারেও

দেখা যায় যে রাস্তায় চলিতে চলিতে মনের নির্ব্বিকল্প অবস্থায় অনেক পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয় কিন্তু মনে উহার কল্পনা না হইবার কারণ উহাকে দেখিলেও উহার সম্বন্ধে অজ্ঞান যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়। এইরূপে ছোট বড় সমাধিগুলি আত্মস্বরূপের পরিচয় না হইবার জন্য বিফল হইয়া যায়। বিকল্প রহিত কেবল নির্ব্বিকল্প জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ হন। সব সসীম ভাসের আশ্রয় হওয়ার জন্য সদাই ভাসমান হইলেও উহা বিকল্পের আচ্ছাদনের কারণ ভাসিত হইতেছে না বলিয়া মনে হইতেছে। বিকল্পের নিবারণ হইবার পর ভাসমান থাকে যে সেই আত্মস্বরূপ পুনরায় ভাসিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ নিরাকার জ্ঞান আর সেই আধারের উপর ভাসিত হয় যে সাকার জ্ঞেয়ের ভেদকে না জানিবার কারণ আত্মস্বরূপ অজ্ঞাত থাকে উহা পরে জ্ঞাত হইয়া যায় আর কিছু অন্য পদার্থ মিলে না। সারাংশ আত্মজ্ঞান হইবার ব্যবস্থিত ক্রম তুমি পুরাপুরি শুনিয়াছ। এখন তুমি বিচারের দ্বারা এই ক্রমের অভ্যাস করিতে পার। যখন তোমার আত্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে তখন তুমি কৃতার্থ হইয়া যাইবে।"

এইরূপে উপদেশ দিয়া রাজা জনক অষ্টাবক্রকে আদর-পূর্ব্বক বিদায় দেন। অষ্টাবক্র চলিয়া গেলেন। মনন ও নিদিধ্যাসনের সহায়তায় উনি পরমানন্দ স্বরূপকে জানিলেন। উহার সব সংশয় শেষে নষ্ট হইয়া গেল আর উনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ প্রকরণ

—০—

তাৎপর্য্যই বুঝা যাইতেছে না।

—০—

ভগবন্! ভবতা প্রোক্তং দুর্ঘটং প্রতিভাতি মে।
চেত্যং চিদাত্মকমিতি নানুভুতিং সমারূহেৎ॥ ৪২॥

দত্তাত্রেয় কহিতে লাগিলেন :—"পরশুরাম, আমি তোমাকে ইহা বুঝাইয়া দিতেছি যে "বেদ্যবন্দ্যা" অর্থাৎ বেদ্য পদার্থ রহিত শুদ্ধ সংবিতের অনুভব কি করিয়া হয়। এই জ্ঞান পাইবার সুযোগ ব্যবহারেও বহুবার মিলে —কিন্তু লোকে মায়ায় মোহিত হইবার কারণ উহার স্পষ্ট জ্ঞান হয় না। সেই পরম উচ্চস্থিতির জ্ঞান সূক্ষ্ম দৃষ্টিবান্ পুরুষের হয়—অন্যের নহে। এখন অধিক আর না বলিয়া তোমায় সার বুঝাইতেছি। সব বেদ্যবস্তু মনে জানা যায়। মন বেদ্য নহে। বেদ্যপদার্থের ভাণ না থাকিলেও মন বিদ্যমান থাকে। অতএব মনকেই বেদ্যরহিত শুদ্ধ সংবিত কহে। উহার স্বরূপ প্রকাশ অথবা জ্ঞান হয় অতএব উহাতে সদাই জ্ঞান থাকে। যদি বলা যায় যে উহাকে পাইবার জন্য অন্যের আবশ্যকতা হয় তাহা হইলে ইহার অর্থ ইহা হইবে যে পুনরায় উহার অন্যের আবশ্যকতা হইবে। ফলতঃ এই মার্গের শেষ না মিলিলে অনবস্থা স্থিতির দোষ হইবে। ফের কাহারও প্রকাশ না থাকায় সর্ব্বত্র অন্ধকার হইবে অথবা অন্য দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখ—কোন পদার্থ প্রকাশিত (ভাসিত) হইবার

সময় তুমি স্বয়ং কি ভাসিত হও না ? যদি তুমি ভাসমান না হইতে ত ফের "তুমি নাই" হইয়া যাইতে। তাহা হইলে পুনরায় তোমার এই প্রশ্নই কোথায় থাকিত ? যদি তোমার অভাব হয় অর্থাৎ যদি তুমি না থাক তাহা হইলে তুমি স্বয়ং স্বহিত মোক্ষের ইচ্ছা কি করিয়া করিতেছ ? আর আমি এই অভাবরূপ আত্মার অনুভব কি করিয়া করিতে পারিতাম ? পরশুরাম, যদি তুমি এই কথা বল যে "সামান্য রীতিতে ভাসমান হয় ষে অর্থাৎ ভাসিত হয় যে আমি বিশেষ রীতিতে আপন স্বরূপকে জানি না" তাহা হইলে সামান্যতঃ ভাসমান হওয়াই তোমার শাশ্বতঃ স্বরূপ। তুমি কি জান না যে তোমার বিশেষ ভাবের লেশমাত্রও নাই ? তুমি জানিয়াও বৃথা ভ্রমে পড়িতেছ, পদার্থের ভাসমান করে অর্থাৎ প্রকাশিত করে যে জ্ঞান তাহা বিশেষ আকারের হয়। কিন্তু তুমি স্বয়ং সামান্য রূপই হও আর আপনার সহায়তায় অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ হইয়া ভাসমান হইয়া রহিয়াছ। তুমি শরীরাদির যোগেও ভাসিত হও না কারণ যদি এইরূপ হইত ত চিত্তে শরীরাদির সঙ্কল্প উৎপন্ন হওয়া বিনা তুমি ভাসমান হইয়া যাইতে। সূক্ষ্মবিচারে নিজ অনুভাবের স্মরণ কর। শরীরকে ছাড়িয়া অন্য সঙ্কল্পের সময় কি তোমার শরীরত্ব ভাসিত হয় ? না, হয় না ; ঐ সঙ্কল্পের যে অন্য বিষয় হয় তাহাই ভাসিত। তাহা হইলে ফের তাহাও তোমার শরীর হইয়া যাইবে। তাহা হইলে পুনরায় এই অর্থ হইল যে যাহা যাহা তোমার সঙ্কল্প সেই সেই তোমার স্বরূপ হয়। তাহা হইলে পুনরায় তুমি সর্ব্বাত্মকই হইয়া গেলে। তাহা হইলে তুমি একদেশমাত্রই কিরূপে হইবে ? অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে কোন ও দৃশ্য

আকাশ উহার জ্ঞাতার (যে জানে তার) অর্থাৎ তোমার স্বরূপ নহে কারণ উহা প্রত্যেক সঙ্কল্পের সহিত পরিবর্ত্তিত হয়। ফলতঃ তুমি কেবল দৃঙ্‌মাত্র রূপ হও। এই স্বরূপভূত দৃক্ দেবতা কখনও দৃশ্যরূপ হন না। ইহা স্বয়ং-প্রকাশ হন। যদ্যপি ইহা শরীর আর দেশ-কালের ভেদাত্মক চিত্রে শোভিত তথাপি উহাতে দৃশ্যভাবের লেশমাত্রও নাই। সারাংশ, তুমি নিশ্চয়রূপে বুঝিয়া লও যে সঙ্কল্পকে ছাড়িয়া দিলেই যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ শেষে থাকিয়া যান উঁহাই আত্মা হন।” উঁহার একবার দর্শন হইয়া যাইলেই অজ্ঞানের নাশ হইয়া যায়। ইহারই নাম মোক্ষ হয়। মোক্ষ ভূতলে নাই, পাতালে নাই, আর আকাশেও নাই। সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার পর যে শুদ্ধ-স্বরূপের অনুভব হয় উহাই মোক্ষ। উঁহা জীবের স্বরূপ হয়। অতএব উঁহা সব জায়গায়ই প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কেবল মোহের নিরসন করা চাই। অন্যপ্রকারে মোক্ষ হইতে পারে না কারণ যাহা কর্ম্মের দ্বারা হয় তাহা নাশবান বা নশ্বর হয়। স্বরূপের অতিরিক্ত যদি কোন মোক্ষ হয় ত, উহাকে অসৎ বলিয়া জানিবে। স্বস্বরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হন; ইহা হইতে ভিন্ন অন্য মোক্ষের সম্ভব কি করিয়া হইতে পারে? যদি ইহা মানিয়াও লও যে মোক্ষ হওয়া সেই স্বরূপের ভিতরেই সম্ভব হয় তাহা হইলে দর্পণের প্রতিবিম্বের মত উঁহা তদ্রুপই হইবে। ব্যবহারেও লোক বন্ধনের নাশ হইবার পর মোক্ষ হয় বলিয়া মানে। নাশ অভাবাত্মক হয় অতএব সত্যরূপ—ভাবরূপ হইতে পারে না। যদি উহাকে ভাবাভাবাত্মক বলা যায় তাহা হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এখন যদি কেউ এইরূপ বলে যে “স্বপ্নের পদার্থ

এইরূপ উভয়বিধ অর্থাৎ ভাবাভাবাত্মক হয় কারণ অনুভবে আসে বলিয়া উহা সত্য হয় আর জাগৃতিতে উহার বাধ হয় বলিয়া সুতরাং অভাবাত্মকও হয়" তাহা হইলে ইহার উত্তর ইহা হয় যে পদার্থের অনুভব না হওয়া আর উহার অভাবের অনুভব হওয়ার নাম বাধ হয়। যাহার এইরূপ বাধ হয় উহা অসত্য হয় আর যাহার বাধ হয় না উহা সত্য হয়। স্বপ্নাদি দৃশ্যের অনুভব নষ্ট হইয়া যায় আর উহার বাধ হইয়া যায় অতএব স্বপ্নের সদৃশ ভাব-অভাবত্মক পদার্থকে অসত্য বলিয়া জানিবে। যাহাতে অভাবের স্পর্শও হয় না সেই চিৎতত্ত্ব সর্ব্বথা সত্য হন। এই স্বরূপ হইতে অন্যত্র যদি মোক্ষ হয় তবে তাহা অসত্য হইবে। স্বরূপের স্ফুরণকে মোক্ষ কহে। চেত্য পদার্থকে দূর করিবার পর চৈতন্য স্বয়ং পরিপূর্ণই থাকেন। চেত্যের আভাস চিতির সঙ্কোচন হয় অর্থাৎ চেত্যের আভাস চিতির পরিচ্ছিন্নতা। উহার অভাবে অর্থাৎ চেত্যের আভাসের অভাবে চিৎস্বরূপ সর্ব্বপরিচ্ছেদ শূন্য ও পরিপূর্ণ থাকেন। এই স্বরূপে জড় চেতন কোনও কালাদির মর্য্যাদা হয় না অর্থাৎ এই স্বরূপ কালাদিদ্বারা সীমাবদ্ধ হন না। চিতিতে জড় আপনার মর্য্যাদা অর্থাৎ সসীমতা বা জড়ত্ব মিলাইতে পারে না। যদি চেতনপক্ষ লওয়া যায় ত এই চিৎস্বরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন—ইহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। ব্যবহারেও যে ভাব কালাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে সেই ভাবও সেই কালাদির সসীমতা তখনই হইতে থাকে যখনই চেতনের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। উহার প্রতি চৈতন্যের ব্যাপ্তি না হইলে ইহা সিদ্ধ হয় না যে মর্য্যাদা বা পরিচ্ছেদ আছে কারণ উহাকে কেহ জানিবেই না। যদি

চৈতন্য হইতে ভিন্ন কোনও চেত্য থাকিত তাহা হইলে কদাচিৎ উহার দ্বারা চৈতন্যের পরিচ্ছেদ হইত। কিন্তু চৈতন্য হইতে ভিন্ন চেত্যের সিদ্ধ হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব হয়। চৈতন্যের অর্থ জ্ঞান হয়। তাহা হইলে যে জ্ঞানের বাহিরে থাকে তাহার অস্তিত্ব কোথায়? এখন যদি ইহা মানা যায় যে চিদ্রূপে কালাদির যত অংশে সম্বন্ধ হয় তত অংশ পর্য্যন্ত চিদ্রূপের মর্য্যাদক অর্থাৎ সসীমতা হইতে পারে তবে ইহাও সম্ভব নহে কারণ কিছু অংশে চৈতন্যের সম্বন্ধ হয় মানিলে চৈতন্যের সম্বন্ধ থাকে না যে অন্য অংশ তাহার সিদ্ধি হয় না। উহা চৈতন্য বিনা ভাসমান কি করিয়া হইবে? তাৎপর্য্য ইহা হয় যে বাহ্য পদার্থও চিৎসমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। এইরূপ সবই চেত্যজাত অর্থাৎ চিত্ত হইতে উৎপন্ন চিতির বিষয় চৈতন্যের গর্ভে থাকে। ফের সেই চিত্তজাত বিষয় চৈতন্যের পরিচ্ছেদক কি করিয়া হইতে পারে? পরশুরাম, চিত্তের স্বরূপ মিথ্যা হয়। যাহা চৈতন্যের ভিতর ভাসিত হইতে থাকে সে সব প্রতিবিম্বের স্বরূপই হয়। ব্যবহারেও দেখা যায় যে এক পদার্থে অন্য পদার্থ থাকিতে পারে না। এইরূপ হইলে সর্ব্বত্র সাংকার্য্য দোষ উৎপন্ন হইবে। ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়া গিয়াছে যে বাহ্যভাস সব ভ্রমমূলক হয়। অতএব চৈতন্যের আশ্রয়ে ভাসিত হয় সে সব ভিন্ন ভিন্ন ভাব স্বয়ং সত্য হইতে পারে না। চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নিজ স্বাতন্ত্রশক্তি দ্বারা পদার্থের আকারের রূপে ভাসিত হইতেছেন।

দত্তাত্রয়ের এই কথা শুনিয়া পরশুরাম অধিক শঙ্কাগ্রস্থ হইয়া গেল। সে কিছু তাৎপর্য্যই বুঝিতে পারিল না। উহার মনে

অনেক সন্দেহ উৎপন্ন হইল। সে কহিতে লাগিল:—"ভগবান্, আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে আপনি যাহা কিছু বলিলেন সে সব অসম্ভব হয়। (১) একই শুদ্ধ সংবিতের ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভাসিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সকলের অনুভব হয় যে সংবিদ আর বেদ্য দুই বস্তু হয়। ইহাতে আপনার কথানুযায়ী যদি স্বয়ং চিতি প্রকাশরূপ হন ত ইহা হইতে পারে, কিন্তু চৈতন্যের সহায়তাতে প্রকাশিত হয় যে চেত্য বা বেদ্য তাহা চৈতন্য হইতে ভিন্ন অবশ্য হয়। ব্যবহারে দেখা যায় যে কোনও প্রকাশের সহায়তায় প্রকাশিত হয় যে বস্তু তাহা সেই প্রকাশ হইতে ভিন্ন হয়। এইরূপে চৈতন্যের সহায়তায় ভাসিত হয় যে চেত্য বস্তু উহা হইতে অর্থাৎ চৈতন্য হইতে ভিন্ন হওয়া সর্ব্বথা সম্ভব হয়। আপনার কথানুযায়ী চেত্যের চৈতন্যাত্মক হওয়া অনুভবেও আসে না। (২) রাজা জনক প্রথমে বলিয়াছিলেন যে সঙ্কল্পকে ছাড়িলে মন নির্ব্বিকল্প হয় আর সেই নির্ব্বিকল্পজ্ঞানে সংসারের নাশ হয়। নির্ব্বিকল্পজ্ঞান আত্মস্বরূপ হয়। এই কথা সত্য হয় কিন্তু এই কথা অর্থাৎ চেত্য চৈতন্যই হয়—তাহা কি করিয়া হইতে পারে? জ্ঞান হইবার জন্য অথবা কর্ম্ম করিবার জন্য আত্মার নিকট মনই সাধন হয়। যদি মন আত্মার নিকট না থাকে ত আত্মা জড় হইতে ভিন্ন কি করিয়া সিদ্ধ হইবে? আত্মার নিকট মন আছে উহাতে জড়ের অপেক্ষা বিশেষতা আছে; ভগবান্, এইরূপ আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ মনের দ্বারাই হয়। সঙ্কল্পযুক্ত মন বন্ধন আর নিঃসঙ্কল্প মনই মোক্ষ হয়। তাহা হইলে মনই আত্মা কি করিয়া হইতে পারে? মন সাধন হয়। বলিবার

তাৎপর্য্য ইহা হয় যে নির্ব্বিকল্প অবস্থার সিদ্ধি হইলেও মনের যোগে ফের দ্বৈত থাকিয়া যায়। (৩) ইহা ব্যতীত, ইহাও দেখা যায় যে, যে বিষয় সম্বন্ধে ভ্রান্তি হইয়া যায় আর সেই বিষয় মিথ্যা হয় তাহা হইলে উহার ভ্রান্তিও মিথ্যা হয় না—উহা যথার্থ বা সত্য হয়। ইহাতে ইহা কি করিয়া সিদ্ধ হয় যে দ্বৈত সম্পূর্ণই নাই। আর যে বস্তু নাই উহার ব্যবহারও আজ পর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু সংসারের সব পদার্থ স্থির হয় আর প্রত্যক্ষ কার্য্য করিতেছে; তাহা হইলে উহাকে ফের অসত্য কি করিয়া বলি। হাঁ, যদি এই সংসার অসত্য হইত তাহা হইলে আপনার কথানুসারে অদ্বৈত সিদ্ধ হইয়া যাইবে। যখন সকলই ভ্রান্তিময় হয় তখন ভ্রান্তি আর অভ্রান্তির ভেদ কি করিয়া জানা যাইতে পারে? আর সব লোকের একই রূপ ভ্রান্তি কেন হয়? মহারাজ, আমার হৃদয়ের এই শঙ্কাগুলিকে দূর করিয়া দিন।”

এই কথা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ দত্তাত্রেয় বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন:—“পরশুরাম, উহার উত্তর পূর্ব্বে অনেককিছু বলিয়াছি। তাহা হইলেও তোমায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করা যোগ্য হইয়াছে। যতক্ষণ মনের সমাধান না হয় বা মনের সন্দেহ না মিটে, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রশ্নই না করা হয় তবে সদ্‌গুরু মনের ভাব কি করিয়া জানিবেন। প্রত্যেক জীবের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন হয় আর প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন তর্ক থাকে আপনার অভিপ্রায়কে প্রকাশ না করিলে সংশয় হইতে কেউও মুক্ত হইতে পারিবে না। দৃঢ়জ্ঞান প্রশ্ন-

কারীর হয়। প্রশ্নই নিরুপণের বীজ হয়। যে নিজের শঙ্কা প্রকাশ করে না উহার বিদ্যালাভ হয় না। এইজন্য প্রশ্ন করিয়া গুরুর নিকট হইতে সব মর্ম্ম (তাৎপর্য্য) পুরাপুরি বুঝিয়া লওয়া চাই। আচ্ছা, এখন তুমি নিজ প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর।—

(১) একই দর্পন অনেক প্রতিবিম্বের কারণ অনেকরূপ ধারণ করে। এইরূপ একই শুদ্ধচৈতন্যের অনেক বিচিত্র আকারে ভাসিত হওয়া সম্ভব হয়। স্বপ্নাদি বিকল্পে মন কেবল একই থাকে কিন্তু উহা (মন) দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্যাদি বিচিত্র ভেদে অনুভবে আসে। যদি শুদ্ধ চৈতন্য এইরূপ নিজেরই স্বরূপে অনেক বিচিত্র আকার ভাসিত করেন তাহা হইলে উহাতে আশ্চর্য্য বা কি আছে। স্বপ্নেও চিতি আর চেত্যের দুই ভেদ হয়। যদি উহা মিথ্যা হয় ত উহা জাগ্রতেও মিথ্যা কহিতে কোন ক্ষতি নাই। ব্যবহারে প্রকাশ ও প্রকাশিত পদার্থ অর্থাৎ প্রকাশ্য অবশ্য উভয়ে ভিন্ন থাকে কিন্তু তথায় ইহা বলা যায় না যে সেই পদার্থ কেবল সেই প্রকাশেই ভাসিত হয়—উহার অনুভব অন্য সাধনেও হইতে পারে। অন্ধের ঐ প্রকাশবিনা পদার্থের অনুভব ত্বচাদি দ্বারা কি হয় না? অতএব প্রকাশিত পদার্থকে বা প্রকাশ্যকে প্রকাশ হইতে ভিন্ন মানিতে হয়। যদি প্রকাশ্য কেবল প্রকাশেরই দ্বারা ভাসিত হইত ত ইহা জানা যাইত যে প্রকাশ্য প্রকাশ হইতে ভিন্ন নহে। তোমার এই কথাও ব্যর্থ হইবে যে "রূপের ভাসিত হওয়া প্রকাশের উপরই সর্ব্বথা অবলম্বিত হয়। তাহা হইলেও যখন প্রকাশ আর রূপ দুই মানা

হয় তখন এইরূপ চিৎপ্রকাশের সম্বন্ধে ও দ্বৈত হইবে।" কারণ, ইহা হয় যে রূপ প্রকাশ বিনা কেবল স্মৃতির সহায়তায় ভাসমান হয়। কল্পনার সময় মনের উপর রূপের বহুতর দৃশ্য দেখা যায়। বিনা প্রকাশে যখন রূপের এই অনেক ভাব অনুভাবে আসে তখন এই দৃষ্টান্তকে চৈতন্যে লাগান বিসংঙ্গত অর্থাৎ অসঙ্গত নহে। চৈতন্যের প্রকাশ অন্য প্রকাশের সমান এক দেশীয় নহে কারণ উহার (চৈতন্যের বা প্রকাশের) ভান বিনা কোথাও কিছুও ভাসিত হয় না। যেমন দর্পনবিনা প্রতিবিম্ব ভাসিত হয় না আর প্রতিবিম্ব দর্পন হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে না। সেইরূপই চৈতন্য হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। অতএব চেত্য পদাথ চৈতন্য হইতে পৃথক্ সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ এই হয় যে এক অদ্বিতীয় চৈতন্যই আছেন—দ্বৈত নাই।

(২) তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন মনের সম্বন্ধে হয়। পরশুরাম, মন ও চিতি হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন নহে, যেমন স্বপ্নে মন স্বপ্নভাস হইতে ভিন্ন হয় না সেইরূপ জাগ্রত সময়ে মনও ভিন্ন পদার্থ হয় না। কারণ এই যে, সিদ্ধির জন্য মন কেবল এক সাধন মানা গিয়াছে। স্বপ্নে বৃক্ষকে কাটিবার জন্য যেমন কল্পিত কুঠার লইতে হয় সেইরূপই মন কেবল কল্পিত হয়, যেমন ক্রিয়া হয় সেইরূপই উহার সাধন হয়, এই কার্য্য প্রথমে কোথায় যথার্থ থাকে? আর মানুষ্যের যখন শিং হয় না তখন নরশৃঙ্গের দ্বারা কাহাকে আঘাত কখন হইতে পারে? অতএব যখন কার্য্য—চেত্যই নাই তখন কার্য্যের সাধন মন ও নাই। স্বপ্নে স্বপ্ন-

ক্রিয়ার কারণ বুঝিয়া দৃক্শক্তিকে মন কহে; এইরূপই জাগ্রত অবস্থায় ও উহাকেই (দৃক্শক্তিকেই) মন বলা হয়। দৃক্শক্তিকে—চৈতন্যকে—ছাড়িয়া ক্রিয়ার কর্ত্তা অন্য মনই নাই। আপনার পূর্ণ স্বাতন্ত্রশক্তির সামর্থে মন ইত্যাদির কল্পনা করিয়া দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্যাদি ভেদের ব্যবহার এই চিদাত্মাই করেন। কখন কখন সেই চিদাত্মা কেবল নির্ব্বিকল্প অবস্থায় ও থাকেন। পরশুরাম, পরিপূর্ণ হইলেও সেই চিৎতত্ত্ব চেতনধর্ম্মের জন্য স্বপ্রকাশক হন, এই স্বপ্রকাশকত্বের জন্য জড় আকাশের সহিত চিৎতত্ত্বের তুলনা করা যাইতে পারে না। তা না হইলে জড় আকাশ আর চিদাত্মার অন্য কিছু ভেদ নাই। আকাশের মত আত্মাও পূর্ণ, সূক্ষ্ম, মনরহিত, অজ, অনন্ত হন আর সেইরূপ নিরকার, সর্ব্বাধার আর সঙ্গরহিত তথা সব চরাচরের ভিতর বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। এক চৈতন্যেরই অধিকতা হয়; এই গুণ আকাশে নাই। চৈতন্যপূর্ণ আকাশকেই যথার্থ আত্মা বলা হয়, আত্মা ও আকাশে ইহার অধিক কিছুও ভেদ নাই, এইজন্য অজ্ঞানী লোক জড় আকাশকে ঐরূপেই আত্মা বলিয়া বুঝে যেরূপে পেঁচা নিজ চক্ষের দোষে সূর্য্যের প্রকাশকে অন্ধকার বলিয়া বুঝে। যে জ্ঞাতা সে এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া লয় যে আত্মচৈতন্য আকাশের সদৃশ। আপনার অমর্য্যাদিত অর্থাৎ অসীম স্বাতন্ত্র বলে এই পরম চৈতন্য আপনি আপনাকে কয়েক প্রকারে মর্য্যাদিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নের মত করিয়া ভাসিত করেন। উহা সেইরূপই হয় যেমন স্বপ্ন অনেক আকারে দেখা

যায়। এইরূপ দেখাও সসীম দৃষ্টিতে হয়। স্বয়ং চৈতন্যের দৃষ্টিতে উহা পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ হন। ইন্দ্রিয়জালবিদ্যার খেলুয়াড় (যাদুকর) দর্শকগণকে যাদুর অনেক বিভিন্ন খেলা দেখায় আর স্বয়ং উহার যথার্থ অনুভব একলা, নিজেই করে। সেইরূপ এই পরম শুদ্ধ সংবিত একলাই আছেন। উহার স্বরূপ অখণ্ড আর একরস হয় কিন্তু মায়ার দ্বারা স্বরূপের সঙ্কোচ করিয়া উঁহা অনেক সসীম বা পরিচ্ছিন্ন রূপে ভাসিত হন। মায়ার এই আবরণ ও লোকের সসীম দৃষ্টির কারণ হয়। কারণ ঐন্দ্রজালিকের মায়া ও অন্যের দৃষ্টিতে ভাসিত হয় স্বয়ং উহার জন্য উহা শূন্যই থাকে স্বয়ং মায়ামোহিত হয় না। এই মায়ারই জন্য চৈতন্যের অনন্ত সামর্থ থাকে। ব্যবহারে আমি প্রত্যক্ষ দেখি যে আপনার সসীম বলের দ্বারা কেউ মান্ত্রিক অথবা যোগী অনেক অসম্ভব বিষয় দেখায়। তাহা হইলে চৈতন্য আত্মার অসম্ভব কি আছে? পরিচ্ছিন্ন পদার্থে অহং এর অভিমান রাখা চৈতন্যের মর্য্যাদা বা পরিচ্ছেদ হয়। এই ভাবনায় পূর্ণতা নাই অতএব উহাকে অবিদ্যা কহে। পরশুরাম, সারাংশ এই হয় যে চৈতন্য আপন সামর্থে স্বয়ং অনেক রূপ হইয়া ভাসিত হন। আমি তোমাকে এইকথা বার বার বলিতেছি; তুমি ভুলিও না। বৃথা শঙ্কাও করিও না। এই বিষয়ে বড় বড় তার্কিক বিদ্বানও মূঢ় হইয়া যায়—বহির্মূখের কারণ সে আপনার স্বরূপকে দেখেই না। সদ্‌গুরু বাক্য সত্য কি মিথ্যা—এই কথার মীমাংসাও হইতে পারে। তখন অন্তর্মুখ হইয়া উহাকে পরীক্ষা করিতে হয়। কেবল

শব্দজ্ঞানে কিছু ফল হয় না। এইজন্য আমি তোমাকে সূক্ষ্মদৃষ্টিরদ্বারা অন্তঃকরণে অনুসন্ধানের জন্য বলিতেছি। সব পদার্থের-ভাণের সময় পদার্থের বিশিষ্ট আকারকে ছাড়িয়া সামান্যরূপে ভাসমান হন যে চিৎশক্তি তাহা জড় হইতে ভিন্ন আর প্রকাশরূপ হন। ফলতঃ উহাতে অহংএর স্ফুরণ হয়। ইহাকে আত্মবিশ্রান্তি কহে। জড়পদার্থ চৈতন্যের জন্য ভাসিত হয়—স্বয়ং হয় না। অতএব সেই জড় পদার্থে স্বরূপ-বিশ্রান্তিরূপ অহংএর স্ফুর্ত্তি হয় না। চৈতন্য অন্যের সহায়তা বিনা স্বয়ং ভাসিত হইতেছেন। অতএব উঁহাতে স্বাত্মবিশ্রান্তিরূপ অহং এর হওয়া যোগ্য ও আবশ্যক হয়। এখানে কোন প্রকারের ভেদ ভাবনা ও মর্য্যাদা নাই। ভেদ ও মর্য্যাদা হইবার জন্য কোন যোগ্য নিমিত্তও নাই। এইজন্য পূর্ণস্বরূপ চৈতন্যের পূর্ণতার যে স্ফুর্তি উহাই আত্মবিশ্রান্তি আর উহাই পূর্ণ অহংতা হয়। পরশুরাম, এইরূপে এই সব যথার্থ অখণ্ড একরস চিন্মাত্র হয়। নিরুপনের সময় বহুনামে ইহার সামর্থ্য ভাসমান হয়। সামর্থ্যও (শক্তিও) তদ্রুপ অর্থাৎ চৈতন্যরূপ হয়—ইহা হইতে ভিন্ন নহে। একই অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণতা উভয়ই থাকে। সেইরূপ স্বাতন্ত্রের বল আর অহংএর স্ফুর্ত্তি দুইভাব থাকিলেও চিতি একরসাত্মকই থাকেন। অঘটনঘটনাপটীয়সী যে মায়া নামক শক্তি তাহার স্বরূপ ইহাই হয় যে চিদেকরস স্বরূপে অনেক বিচিত্র ভান ভাসিত করে। এই ভাস ভাসিত হইলেও চিতি নির্জস্বরূপ হইতে চ্যুত হন না। সসীম ভাসই অনাত্ম ভাস, অবিদ্যা, জড়শক্তি অথবা প্রকৃতি হয় ; সেই সসীম প্রাথমিক ভাসকে মহাশূণ্য, অত্যন্তাভাব, আকাশ,

তম আর প্রথম স্বর্গ (সৃষ্টি) নামেও বলা হয়। পরিপূর্ণ আত্ম-স্বরূপের যে অহং স্ফূর্ত্তি উহা ভ্রান্তিবশে একদেশীয় হইয়া যখন জড়রূপে ভাসিত হয় উহাকে আকাশ কহে অর্থাৎ "অহং আত্মা" এই ভাবকে ছাড়িয়া যে আত্মপ্রদেশ শেষ থাকে উহা আকাশ হয়। উহাই জগতের মূল হয়। অজ্ঞানী লোকের উহাতে ভেদ ভাসের অনুভব হইতেছে। তুমি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার কর। যাহাকে তুমি আকাশ বলিয়া বুঝিতেছ উহা উহাতে (আকাশে) থাকে যে জীবের আত্মা তাহাই চৈতন্য হয়। অন্যের শরীরে যে আকাশ তুমি দেখিতেছ সেই উহার চিদানন্দঘন আত্মা হন আর উহা তোমারও আত্মা হন। এইরূপে আমার কল্পিত আকাশে যে চৈতন্য ব্যাপ্ত হইতেছে উহাকে মন বলা হয় অর্থাৎ উহা আত্মাই হন—অন্য কিছু নহে। আবরণ কারক জড় তত্ত্ব দৃষ্টিতে উহাকে মন বলা হয় যার আবৃত হয় যে চিদাংশের দৃষ্টিতে প্রমাতা তাহাকে জীব বলা হয়। এইরূপে চৈতন্যের অংশের আকাশরূপী জড়তত্ত্বের দ্বারা আবৃত হইবার পর ঐ আকাশের কোমল, বিরল, মৃদু আর নির্ম্মল ভাবের উপর কঠিন, ঘন, কঠোর আর মলিন ভাবের কল্পনা করা হয় যাহার জন্য এক আকাশ আর এই চার ভাবনা হইতে পঞ্চভূত প্রকটিত হয়। স্বয়ং চিতের অংশের দ্বারা নিম্মিত শরীরের সহিত সঙ্গ করিয়া দোহাত্মা হইয়া যায়। পুনরায় গুপ্ত দীপের মত থাকিয়া সেই দেহান্তর্গত চিদাংশ দেহের ভিতর হইতে সেই রূপেই প্রকাশিত করিতেছেন যেমন কলসীর ভিৎরেস্থিত দীপ কলসীর সব অন্তর্ভাগকে প্রকাশিত করে। আর

দীপের প্রকাশ কলসীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যেমন বাহিরে আসে সেইরূপই এই চিদ্দীপও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরে প্রকাশ করিতেছে। অক্রিয় আর পূর্ণচিদ্রূপে বস্তুতঃ বাহির ভিতর হওয়া সম্ভব নাই। কিন্তু চৈতন্যের জ্ঞানশক্তি, যাহাকে আবৃত করে যে জড় আকাশ তাহাকে যখন দূর করিতে থাকে তখন উহা বাহিরে আসিতেছে এইরূপে ভাসিত হয়। জ্ঞানশক্তিদ্বারা আবরণ দূর করাই মনের ব্যাপার। অতএব আত্মাই মন হয়। চঞ্চল চিতি মন আর নিশ্চল চিতি আত্মা হন। আবরণ দূর করাই চিৎশক্তির গতি। ইহাকেই (আবরণ দূর করাকেই) বিকল্প বলে আর বিকল্পই মনের স্বরূপ। এই বিকল্পের নিরসন করিবার পর শেষ যে পূর্ণনির্বিকল্প আত্মস্বরূপ জ্ঞান থাকে উহা মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হয়। পরশুরাম, তুমি এখানে এইরূপ সন্দেহ করিও না যে "বিকল্পের নিরসন করিবার পরেও আবরণ দোষ পুনরায় থাকিয়া যাইবে।" প্রথমে আবরণ কোথায় আছে ? উহা কল্পিত হয় অতএব বস্তুতঃ নাই। যদি কল্পনায় কোন শত্রু আমার প্রতি আক্রমণ করে, আমায় বাধে, আর মারিয়া ফেলে ত সঙ্কল্প বন্ধ হইলে সেই বন্ধনাদি সব লয় হইয়া যায়—শেষ কিছু থাকে না। সেইরূপ এখানেও হয়। অনাদিকাল হইতে এখানে কাহারও বন্ধন নাই। কিছু বন্ধন অবশ্য আছে—এই ভাবনাই মহাবন্ধন হয়। ইহা বৃথা হাওয়ায় ভীত হওয়ার ন্যায় ঘাতক হয়। যতক্ষণ না বন্ধনের অস্তিত্বের ভ্রান্তি নষ্ট না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ উদ্যোগ করিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষও সংসার হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে না এই বন্ধন আছে কোথায় ? আকাশের সমান নির্ম্মল

চিদাত্মাকে উহা (বন্ধন) কি করিয়া হইতে পারে? যদি স্বাত্মস্বরূপ দর্পণে ভাসিত হয় যে প্রতিবিম্বাত্মক দৃশ্যপদার্থে আত্মার বন্ধন হইত তাহা হইলে দর্পণে দেখা যায় যে অগ্নির প্রতিবিম্ব তাহার দ্বারাও কোন পদার্থ জ্বালিয়া যাওয়া উচিত। "যথার্থ বন্ধন বলিয়া কোন বস্তু আছে" আর "মন বলিয়াও কোন বস্তু আছে"—এই ভাবনা বিনা বস্তুতঃ কোন বন্ধন নাই। সযুক্তিক বিচারের দ্বারা যদি এইসব মন ধোয়া না যায় ত সংসারকে নাশ করিতে আমিই বা কে, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশও সমর্থ হইতে পারেন না। পরশুরাম, এইজন্য বলিতেছি যে তুমি এই দুই ভাবনা অর্থাৎ বন্ধন আছে আর মন আছে—ত্যাগ কর। তাৎপর্য্য ইহা হয় যে নির্বিবকল্প অবস্থায় মন শেষ থাকে কিন্তু উহা আত্মমাত্র থাকে অর্থাৎ দ্বৈত থাকে না। "ইহা অমুক হয়" এইরূপে ভাসিত হওয়া বিনা মন আর কিছু নহে। অতএব "ইহা অমুক হয়" ইত্যাদি বিকল্পকে ত্যাগ করিবার পর কেবল ভাবরূপ আত্মাই শেষ থাকিয়া যায়।

(৩) রজ্জুতে সর্পের আভাসকারক ব্যবহারের ভ্রান্তি সত্য বস্তুতে হয়। অতএব যেখানে সর্পের বাধ হইয়া যায় কিন্তু রজ্জুর বাধ হয় না, এইজন্য ভ্রান্তি সত্য থাকিয়া যায়। যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম স্বপ্নে হয় ত তথায় রজ্জুও স্বপ্নোত্তরকালে অন্য সব পদার্থের মত বাধিত হইয়া যায়। অতএব ঐ ভ্রান্তিকেও সত্য বলা যাইতে পারে না। কারণ সেই ভ্রান্তির জ্ঞান কাহার আশ্রয়ে থাকিবে? ইহাতে বুঝা যায় যে দৃশ্যের পরিমার্জ্জন হইবার পর উহার জ্ঞান কেবল দৃক্স্বরূপ থাকে—চিৎতত্ত্ব হইতে ভিন্ন থাকে না। তাহা

হইলে ফের উহার দ্বারা দ্বৈত কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? প্রত্যক্ষ জাগ্রত ব্যবহারে যেরূপ হয় ঠিক সেইরূপই স্বপ্নেও হয়। স্বপ্নের ব্যবহারও সেই সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ স্বপ্নকালে স্থিরই হয়। তাহা হইলে স্বপ্নকে মিথ্যা আর জাগৃতিকে সত্য বলিবার কি কারণ আছে ? কিছুই নাই। স্বপ্ন আর আর জাগৃতিতে কেবল এই ভেদ হয় যে জাগৃতিতে স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায় আর স্বপ্নে জাগৃতিকে মিথ্যা হওয়ার নিশ্চয় হয় না। কিন্তু এই সামান্যভেদে জাগৃতির ব্যবহারের সত্যতা সিদ্ধ হয় না। জাগৃতির বস্তু যেমন স্থির আর কার্য্যকারী বলিয়া বোধ হয় সেইরূপই কি এই স্বপ্নে বোধ হয় না ? জাগৃতির ভাব স্বপ্নে আর স্বপ্নের ভাব জাগৃতিতে আসে না ; কিন্তু আপন আপন সময়ে উভয়ে একরূপ স্থির ও কার্যকারী অবশ্য হয়। ভাল, তুমি সূক্ষ দৃষ্টিতে এই বিষয়ে বিচার কর যে জাগৃতির পূর্ব্বভূত অর্থাৎ অতীত বিষয়ে আর স্বপ্নে কি ভেদ আছে। সব অতীত বিষয় স্বপ্নের সমান বোধ হইতেছে। জাগৃতির সদৃশ্য স্থিরতা আর কার্য্যক্ষমতা আপন সময়ে অর্থাৎ ইন্দ্রজাল দেখাইবার সময়ে ইন্দ্রজাল বিদ্যাও রাখে। তবে কি উহাকে ইহার জন্য সত্য বলিতে হইবে ? সাধারণ লোক উহার রহস্য বুঝিতে পারে না এইজন্য ভ্রান্ত হইয়া সংসারকে সত্য বলে। কিন্তু যাহাকে কখনও অভাব স্পর্শ করিতে পারে না উহাই সত্য হয়। ব্যবহারেও যাহাকে অসত্য বল উহার স্বরূপ কিরূপ হয় ? উহা এক্ষণে ভাসিত হইতে থাকে আর পরক্ষণে যেমন ছিল তেমন থাকে না। তাহা হইলে এই সংসার ত তোমার

ব্যাখ্যানুসারে অসত্য সিদ্ধ হইয়া যায়। সময়ে, যেমন সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে, সারা সংসারের অভাব হইয়া যায়। যখন উহার ভাব থাকে না তখন উহাকে অভাব বলে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে চৈতন্যের অভাব কখনও হয় না। কিন্তু সারা জগৎ পদার্থ এইরূপ হয় যে উহাকে একভাসিত হইতে না হইতে অন্য ভাসিত হইতে থাকে কারণ তাহারা অনেক হয় বলিয়া ক্রমে ক্রমে ঐসবের অভাব হয়। এইরূপ অভাব চিতির কখনও আর কোথাও হয় না। যখন চিদ্রূপ ভাসিত না হয় তখন সেই সময়ে উহা (চিতের অভাব) ভাসিত কি করিয়া হইবে। "ভাসিত হইবে না" এই কথার অনুভব চৈতন্যের অতিরিক্ত আর কে করিতে সক্ষম হইবে? কিন্তু ইহা "সেই সময়" এর সূচিত কাল আর 'ভাসিত হয় না' এই অবস্থায়, এই দুইএরও অজ্ঞান হইয়া থাকিলেও চৈতন্য ভাসিতেই থাকেন। অতএব কেবল ঐ চিৎরূপই এক সত্য হয়। পরশুরাম, তোমায় সত্য আর অসত্যের ভেদ অল্পে বলিতেছি। এই ব্যাখ্যা নির্দ্দোষ হয় যে "অন্যের সাহয়তায় বিনা যে কেবল স্বয়ং ভাসিত হইতে থাকে উহা সত্য হয় আর যে এইরূপ ভাসমান হয় না উহা অসত্য হয়।" এই ব্যাখ্যাযোগ্য নহে যে "যে বাধিত হয় তাহা অসত্য হয় আর যে হয় না সে সত্য হয়।" কারণ ইহার অপবাদ পাওয়া যায়। উদাহরণার্থ রজ্জুতে ভাসিত সর্পকে বাধিত করিবার জ্ঞান যদি ভ্রমসময়ে উৎপন্ন না হয় ত ভাসিত সর্প তোমার ব্যখ্যায় সত্যতা প্রাপ্ত হইবে। বাধ হওয়ার অর্থ হয় পদার্থের

না হওয়ার (থাকার) জ্ঞান হওয়া। কিন্তু পদার্থ থাকিলেও কখন কখন ভ্রমে এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ পদার্থ নাই এইরূপ জ্ঞান হয়। এইরূপ পদার্থ না থাকিলেও কখন কখন উহার অস্তিত্বের অনুভব হয়। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যায় এইরূপ আক্ষেপ করা যায় যায় না। চৈতন্য নাই ত কিছুই নাই। শুধু ইহাই নহে কিন্তু "কিছুই নাই" ইহাও নাই। অতএব যদি কোন তার্কিক মূর্খ বলে যে চৈতন্যই নাই তাহা হইলে অর্থ এই হইবে যে সে "আমি নাই বলিতেছে।" সুতরাং সে যদি শাস্ত্রকারও হয় তাহাতে বা কি ? যাহার আত্মার ভাসমানে আর অস্তিত্বে সন্দেহ হয় সে উত্তম তর্ক করিয়াও অন্যের মোহ কখনও নস্ট করিতে পারে না। সত্যের মতন ক্রিয়া হইতে দেখিলেও উহাতে কেবল ইহতেই অর্থাৎ ক্রিয়া দেখিয়াই সত্যতা হয় না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে এইসব জানিবার পদ্ধতি ভ্রান্তিরূপ হয় আর সেই ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া বুঝা পুনরায় অন্য মহাভ্রান্তি হয়। আমি এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে বার বার বুঝাইতেছি। সদাই পদার্থের অসত্যতা থাকা পর্য্যন্ত এইরূপ ভ্রান্তি হয়। চৈতন্যের জ্ঞান হইতেই এই সব জ্ঞান ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বুঝা যায়। আকাশে সব লোকের নীলতার ভ্রম সমান হয়। এইরূপ সব লোকের নিজ নিজ দোষ সাম্যের কারণ এই জগৎ ভ্রম একরকমেই ভাসিত হয়। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। চিদাত্মরূপে থাকে যে কেবল শুদ্ধ জ্ঞানই অভ্রান্ত অর্থাৎ সত্য স্থিতি হয়।

পরশুরাম, এখন পর্য্যন্ত আমি তোমার প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিলাম। এখন তুমি সব সন্দেহ ত্যাগ করিয়া যাহা বলিলাম তাহাতে পূর্ণ নিশ্চয় কর। এখন তোমার আমি ইহার পর বলিব যে মুক্ত

হইবার পর ব্যবহার করা সম্ভব কি করিয়া হয়? সাবধান হইয়া শুন। মুক্তজ্ঞানী পুরুষ তিনপ্রকারের—উত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ঠ—হয়।

(১) যিনি স্বরূপকে জানেন কিন্তু প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত সুখদুঃখ হইতে প্রতিক্ষণ দুঃখ প্রাপ্ত হন তিনি মন্দজ্ঞানী হন। (২) কেউ প্রারব্ধজনিত সুখদুঃখ ভোগ করেন কিন্তু উহাতে (সুখদুঃখে) সেইরূপ মনোযোগ দেন না যেমন নিদ্রায় মশার কামড়ে মশার প্রতি মনেযোগ দেয় না; ইহারা মধ্যজ্ঞানী। (৩) আর কোটি প্রারব্ধ কর্ম্মে বিচিত্র ফল পাইলেও যিনি চঞ্চল হন না, সঙ্কট পরম্পরায় উদ্বিগ্ন হন না, আশ্চর্য্যে বিস্মিত হন না, যথা সুখ পাইলেও সুখী হন না, ভিতরে (অন্তঃকরণে) শান্ত থাকেন, বাহে অন্য লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকেন তিনি উহাদের অপেক্ষা সর্ব্বোত্তম জ্ঞানী হন। এইরূপে বুদ্ধির ভেদের কারণ জ্ঞানের পরিপক্কতা ন্যূনাধিকের কারণ আর প্রারব্ধের বিচিত্রতার কারণ জ্ঞানীদের ব্যবহারে ভিন্নতা হয়। কিন্তু জ্ঞানীদের ব্যবহার হইতে পারে—ইহা সত্য নহে যে জ্ঞানীর ব্যবহার হয় না।

উনবিংশ প্রকরণ

—০—
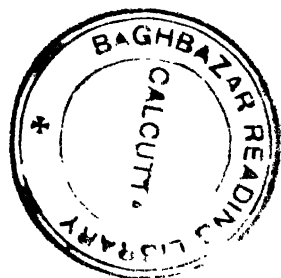
অদ্ভূত জ্ঞানী

—০—

অত্র বুদ্ধিবিভেদেন বাসনাতারতম্যতঃ ॥
সাধনানাং হি বৈচিত্র্যাদ্বিচিত্রা জ্ঞানিনাং স্থিতিঃ ॥ ৬৪ ॥

দত্তাত্রয়ের নিকট হইতে আপনার শঙ্কার উত্তর শুনিয়া পরশুরাম মুক্তলোকের ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন ঃ—"ভগবন্ আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক বুঝান যে বুদ্ধিভেদের জ্ঞানের পরিপক্কতার ন্যূনাধিক কি করিয়া হয়। মোক্ষ একরূপ হয়; সকলে উহাকে (মোক্ষকে) সম্পাদন করিতেছে। তাহা হইলে বুদ্ধি-ভেদে জ্ঞানের পরিপক্কতার অন্তর অর্থাৎ ভিন্নতা কেন হওয়া উচিত? জ্ঞানের সাধনে কি ভেদ আছে?"

দত্তাত্রয় কহিতে লাগিলেন ঃ—"পরশুরাম, শুন। আমি তোমাকে সকল রহস্য বুঝাইয়া দিতেছি। কাহারও সাধনে ভেদ নাই। এই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সাধন নাই। কিন্তু সাধনের ন্যূনাধিকতার কারণ ফলের প্রাপ্তি ভিন্ন হইয়া যায়; ভিন্নতার কারণে নহে। সাধনের পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছাইলে জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইয়া যায়। জ্ঞান অপূর্ণ থাকিলে উহার পূর্ণতা প্রাপ্ত করিবার জন্য অধিকাধিক প্রয়াস করিতে হয়। যথার্থ দেখিলে জ্ঞানের প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাধনের কিছুও উপযোগ নাই। জ্ঞান কখনও সাধ্য হয় না উহা স্বভাবতঃ সিদ্ধই।

থাকে। চৈতন্যই জ্ঞান হয়, উহা সদাই স্বপ্রকাশ হয়। যাঁহার নিত্য ভাণ হইতেছে উঁহার জন্য উপায়ের কি আবশ্যক? কিন্তু উহা হাজার বাসনার কর্দ্দমে ডুবিয়া যাইবার কারণ কেউ জানিতে পারিতেছে না। মনের নিরোধ করাই জলের সমান হয় সেইজন্য বাসনার মলকে ধুইয়া ফেলিবার জন্য "সাধন" করিতে হয়। চিত্তরূপী সিন্ধুক বহুদিবস বন্ধ হইয়াছিল; প্রযত্ন করিয়া বিচাররূপী তীক্ষ্ণযন্ত্রের সাহায্যে উহাকে (চিত্তকে) খুলিতে হয়। খুলিলে নিত্য ভাসিত এমন যে চৈতন্য, ঐ সিন্ধুকের রত্নের মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য চিত্তের বাসনাগুলির নিরসন সাধনের আবশ্যক হয়। বাসনার ন্যূনাধিকতার কারণ বুদ্ধির শুদ্ধতা ন্যূনাধিক হইয়া যায়। বাসনার মলে যার বুদ্ধি যে অংশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হয় উহার সেই পরিমাণ সাধনার আবশ্যক হয়। বাসনা কয়েকপ্রকারের হয়। মুখ্য এই হয়ঃ—প্রথম অপরাধবাসনা, দ্বিতীয় কর্ম্মবাসনা আর তৃতীয় কাম-বাসনা। বেদাদিতে অশ্রদ্ধা হওয়া মুখ্য অপরাধ হয় আর আত্ম-বিনাশী হয়। বিপরীত গ্রহ হওয়া অন্য অপরাধ হয়। অনেক কলাকুশল পুরুষ এই অপরাধের জন্য (বিপরীত গ্রহের জন্য) বহু সন্তের সমাগম অর্থাৎ বহু সৎসঙ্গ আর শাস্ত্রের জ্ঞান হইলেও সেই পরমশ্রেষ্ঠপদকে পান না। উহার ধারণা হয় যে পরমতত্ত্বই নাই, অথবা উহার থাকার সম্ভবই নাই। যদি উহা থাকেত কেহই কখনও উঁহাকে জানিতে পারিবে না।" যদি সেই তত্ত্বকে জানিয়াও লয় তাহা হইলে ফের সন্দেহ করিতে থাকে যে "এই পরমতত্ত্ব নাই; ইহাকে জানিলেও মোক্ষ কি করিয়া হইবে? এই যে অশ্রদ্ধানামক

অপরাধ ইহা মুখ্যবাধাকারী বাসনা হয়। ইহার জন্য শতসহস্র শাস্ত্রকুশল মনুষ্য জন্মমরণ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বকালের দুষ্কর্ম্ম জন্য সংস্কারের কারণ কাহার কাহার বুদ্ধি মলিন হইয়া যায় অতএব উহা তত্ত্বোপদেশের সময় ক্ষতি করে। সদ্‌গুরু কত না যুক্তিদ্বারা বুঝান কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারে না। মনের নিরোধ করিলেও এই কর্ম্মবাসনাকে জয় করা কঠিন হয়। ইহার পরে কাম আছে। কাম অর্থাৎ কর্ত্তব্য শেষ থাকিবার দৃঢ়ভাবনা, যেমন "আমার কর্ত্তব্য আছে।" আমার ইহা কর্ত্তব্য, ইহার বহু শাখা আর অনন্ত বিস্তার আছে। যেমন পৃথিবীর কণাকে অথবা আকাশের তারাকে গননা করা যায় না সেইরূপ কামের সংখ্যা বলা যায় না। ইহা কামবাসনা হয়। ইহা আকাশ অপেক্ষা অধিক বিস্তীর্ণ আর পর্ব্বত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়। এই কামবাসনাকে আশা পিশাচী কহে। ইহার জন্য ভ্রমিত হইয়া সবলোক দুঃখে জ্বলিতেছে। এইরূপ মহাত্মা অল্পই আছেন যিনি বৈরাগ্যবলরূপী মহামন্ত্রের দ্বারা এই পিশাচী হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও ধন্য হইয়া গিয়াছেন। পরশুরাম, এই তিন বাসনায় মন ভরা আছে যাহার জন্য চিৎতত্ত্ব ভাসমান হইতেছে না। সব সাধনের ফল বাসননাশই হয়। বিচারপূর্ব্বক নিশ্চয় করিলে অপরাধবাসনা পরিত্যক্ত হয়। কর্ম্মবাসনা ঈশ্বরের কৃপা হইলে একজন্মে অথবা অনেক জন্মে দূর হয়; অন্য শত উপায় ব্যর্থ হইয়া যায়। কামবাসনা বৈরাগ্যাদি সাধনার নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে দোষদৃষ্টি না রাখিলে বৈরাগ্য হয় না। বাসনা যেমন যেমন অল্প অথবা অধিক হয় সেইরূপ অল্প অথবা অধিক দোষদৃষ্টি রাখিতে হয়।

কিন্তু এই সবের জন্য মুখ্য কারণ মুমুক্ষতা হয়। ইহা না থাকিলে শ্রবণ মননে যথার্থ লাভ হয় না—কেবল বক্তৃত্বাদির কলাশক্তি লাভ হয়। এই বক্তৃত্বাত্মক জ্ঞানের দ্বারা পরমপদ মিলে না। যথার্থ মুমুক্ষতার অভাবে যে বহুবিচার আর শ্রবণ মনন করা হয় উহা সব প্রেতের অলঙ্কারের সমান ব্যর্থ হয়। এইরূপ মন্দ মুমুক্ষতাও ব্যর্থ হয়। আমার হাতে পুণ্য আছে কেবল এই ইচ্ছা কোন উপযোগের নহে। কোন পুণ্যের লালসায় কর্ম্ম করিলে মোক্ষফল মিলে না। সুখের ইচ্ছা কোন জীবের নাই? সকলের আছে। ফের এইরূপ মুমুক্ষার কি উপযোগ হয়? মুমুক্ষতা তীব্র হওয়া চাই। তবেই মোক্ষফল শীঘ্র প্রাপ্ত হইবে। এই তীব্র মুমুক্ষতা সব সাধন সমুদয় হইতে একলাই শ্রেষ্ঠ কারণ এই মুমুক্ষতাই মনুষ্যগণকে সাধনে প্রবৃত্ত করে। এই প্রবৃত্তিকেই তৎপরতা কহে। সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে এমন মনুষ্যের শীতলতা ভিন্ন অন্য কিছুই চায় না। এইরূপ সংসার হইতে মুক্ত হওয়া ব্যতীত অন্য সবকথা ভুলিয়া যায়। তখন এই উৎকট মুমুক্ষতাফল দিতে সমর্থ হয়। মোক্ষ ভিন্ন অন্য সব প্রাপ্ত বস্তুকে দোষদৃষ্টি রাখিলে এই স্থিতি আসে। তীব্র বৈরাগ্যাদির দ্বারা মোক্ষের এই ইচ্ছা ধীরে ধীরে তীব্র হইতে থাকে। বিষয়ের প্রতি যে প্রীতি অর্থাৎ বিষয়াসক্তি তাহা নষ্ট করে যে বৈরাগ্য তাহা—দোষদৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়; বৈরাগ্য হইতে অত্যন্ত তৎপরকারী তীব্র মুমুক্ষতা উৎপন্ন হয়। সাধনায় অত্যন্ত তীব্রভাবে লাগিয়া যাওয়াই তৎপরতা হয়। পরশুরাম, এইরূপ তীব্র প্রবৃত্তিতে বড় অদ্ভুত ফল ফলে।"

এই কথা শুনিয়া পরশুরামের মনে ফের কিছু সন্দেহ উৎপন্ন হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল:—"ভগবন, আপনি প্রথম বলিয়াছিলেন যে মোক্ষের মুখ্য সাধন সৎসঙ্গ হয়, এখন বলিতেছেন যে ঈশ্বরের কৃপা চাই। পুনরায় আপনি দোষদৃষ্টি রাখিতেও বলিতেছেন। এই তিন আদি কারণের মধ্যে মুখ্য কারণ কোনটি হয়? আর উহা কি করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহা নিশ্চিত হয় যে আপনা আপনি কিছুই হয় না। অতএব আপনি সবিস্তার বর্ণনা করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিন্।"

এই কথা শুনিয়া দয়ালু দত্তাত্রয় কহিতে লাগিলেন:—"পরশুরাম, শুন। আমি মোক্ষের মুখ্য সাধন বলিতেছি। পরম চিৎ দেবতা নিজ সামর্থ্যে আপনার স্বরূপে দর্পন প্রতিবিম্বের মত জগদ্রুপী চিত্রকে ভাসিত করিতেছেন। অনাদি অবিত্তার দ্বারা মলিন জীবের কল্যাণের জন্য হিরণ্যগর্ভ নামক শরীর ধারণ করিয়া সেই পরম দেবতা সর্ব্ব মনোরথপূর্ণকারী বেদরূপী জ্ঞান-সাগর প্রকট করিয়াছেন। জীবের স্বভাবতঃই বিচিত্র ইচ্ছা আর বাসনা থাকে। জীবের হিত কিসে হয় ইহার উত্তম বিচার করিয়া তিনি বহু ভিন্ন ভিন্ন ফলদায়ক কাম্যকর্ম্ম নির্ম্মিত করিয়াছেন। প্রত্যেক জীব ভাল ও মন্দ কিছু কর্ম্ম স্বভাবতঃ করিতেই থাকে। কিছু কর্ম্মফলের জন্য অনেক যোনীতে ভ্রমণ করিয়া এই মনুষ্যজন্ম পায়। ফের বাসনার বশে সে কাম্যকর্ম্মের দিকে ঝোঁকে। এই কামনাকে পূর্ণ করিবার জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধী শাস্ত্রাব-লোকন করে। কর্ম্ম করিতে করিতে কোনও সূক্ষ্ম দোষের জন্য

সে ফল পায় না। এইরূপ আঘাত পাইবার পর সে আপনার কর্ত্তব্য জানিবার জন্য কোন সৎপুরুষের সঙ্গ করে। সে প্রসঙ্গ বশে পরমেশ্বরের মহিমা শুনিতে পায় আর প্রাচীন পুণ্য উদয় হইয়া উহার প্রতি পরমেশ্বরের কৃপা হয়। তখন উহার প্রবৃত্তি মোক্ষ পাইবার দিকে যায়। সারাংশ এই হয় যে পূর্ব্বপুণ্য বলে সৎসঙ্গতি করিয়া মনুষ্য অত্যন্ত দুর্লভ মোক্ষকে পায়। এইজন্য সৎসঙ্গ মোক্ষ প্রাপ্তির মূল বলা হয়। কখন কখন উত্তম পুণ্যবলে অথবা উৎকট তপস্যা করিয়া আকাশ হইতে ফল পড়ার মত অকস্মাৎ জ্ঞানের প্রাপ্তি হইয়া যায়।

পরশুরাম, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কারণোৎপন্ন জ্ঞান প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্নই থাকে। এইরূপ অল্প অথবা অধিক বুদ্ধি, ন্যূন অথবা অধিক বাসনা আর অল্প অথবা মহান সাধনার কারণেও জ্ঞানীদের স্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। যাঁহার বুদ্ধিতে স্বভাবতঃই বাসনার সংস্কার অল্প হয় উহার অল্প সাধনারই পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। যাহার বাসনা স্বভাবতঃ এইরূপ শুদ্ধ না হয় তাহার পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য বহু সময় পর্য্যন্ত সাধন করিতে হয়। আর যাহার বাসনা অত্যন্ত ঘন হয় অর্থাৎ দৃঢ় হয়, উহার জ্ঞান হইলেও কোন লাভ হয় না। যদি সে আপনার সাধনায় স্থির থাকিতে পারে তাহা হইলে উহার জ্ঞান পরিপক্ক হইতে পারে। এই কারণে জ্ঞানীর স্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। পরশুরাম, চিত্তের পরিপক্ক অবস্থার ভেদ হওয়ার কারণ স্থিতিতেও ভেদ হইয়া যায়। বুদ্ধিতে যে যে বাসনার অল্প অথবা অধিক আবরণ থাকে সেই সেই

জ্ঞান ভিন্ন হইবার কারণ স্থিতিও ভিন্ন হইয়া যায়। জ্ঞানীদের স্থিতিতে অন্তর কি করিয়া হয় তাহা দেখ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহাদেব জন্ম হইতেই জ্ঞানী হন। কিন্তু আপন আপন স্বভাব জনিত গুণে উহাদের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু ইহা বলা যায় না উহাদের জ্ঞানে অল্পও মলিনতা আছে। প্রকৃতির গুণের স্বরূপই ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন জ্ঞানীর শরীর কাল হইতে সাদা হয় না সেইরূপই উহার চিত্তের ধর্ম্মও বদলায় না। পরশুরাম, আমাকেই দেখ। অত্রি ঋষির আমরা তিন পুত্র হই, কিন্তু দুর্ব্বাসা একরকমের হন, চন্দ্র অন্য প্রকারের হন, আমি তৃতীয় প্রকারের হই। প্রথম দুর্ব্বাসা সদাই ক্রোধী, দ্বিতীয় চন্দ্র সদাই বিলাসে মগ্ন অর্থাৎ ভোগী আর তৃতীয় আমি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগী হই। আর দেখ বশিষ্ঠ অত্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠ, সনকাদি সন্ন্যাসী আর নারদ ভক্তিপ্রেমে মগ্ন, শুক্রাচার্য্য কবি আর রাক্ষসের রক্ষাচিন্তাকারী, গুরু বৃহস্পতি দেবপক্ষের হন, ব্যাসদেব বেদে কুশল আর আজীবন শাস্ত্র রচনায় চতুর। জনক রাজ্য করিতে থাকেন, আর জড়ভরত নেংটি পরিয়া আছেন। এইজন্য সব জ্ঞানীই স্বভাববশে ভিন্ন ভিন্ন স্থিতে থাকেন। 'আমি তোমাকে ইহার গুঢ় রহস্য বলিতেছি। প্রথমে তিন প্রকারের বাসনা বলা হইয়াছে। উহার মধ্যে দ্বিতীয় কর্ম্ম বাসনা আর যাহার লক্ষণ বুদ্ধিমন্দতা উহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান হয়। ইহা অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা যাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারে না তিনি যথার্থই বুদ্ধিমান। এইরূপ হইলে উহার অপরাধ—বাসনাও সহজে নষ্ট

হইয়া যায়। এইরূপ লোকের কাম-বাসনা অভ্যাসে যদি নষ্ট না করা যায় ত উহা তাহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না। ফলতঃ উহার বৈরাগ্যাদির অধিক আবশ্যকতা হয় না। উহার মনন ধ্যান আর সমাধিরও অধিক আবশ্যক হয় না। তিনি যখনই একবার তত্ত্বের শ্রবণ করেন তখনই দ্রুত উহার মনন, নিদিধ্যাসন হইয়া যায় আর উহার পরমপদ জ্ঞাত হইয়া সব সন্দেহ নষ্ট হইয়া যায়। ফের তিনি জনকাদির মত জীবন্মুক্ত থাকেন। সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল বুদ্ধি হইবার কারণ কামাদি বাসনা-গুলিকে নাশ করিবার জন্য উঁহার ইহার বিপরীত অভ্যাস করিতে হয় না। সেই বাসনা উঁহার জ্ঞানে বাধা দিতে পারে না। অতএব সে বাসনাকে পুরাপুরি ত্যাগ করিবার চিন্তা করে না। ফল এই হয় যে পরমপদকে জানিয়া লইলেও প্রথমে বিদ্যমান বাসনার নিরন্তর প্রবৃত হইতে থাকেন। কিন্তু ইহা দ্বারা উহার বুদ্ধি অল্প ও মলিন অথবা লিপ্ত হয় না। এইরূপ জ্ঞানীপুরুষের নাম "বহুমানস" হয়। কিন্তু যাহার চিত্ত কর্ম্ম-বাসনাতে অত্যন্ত মূঢ় হইয়া গিয়াছে উহার মহাদেবের উপদেশেও পরমপদের জ্ঞান হয় না। এইরূপ দৃঢ় অপরাধ বাসনায়ও জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাহার অপরাধ বাসনা আর কর্ম্মবাসনা হওয়া কম থাকে কামাদি বাসনা অধিক থাকে উহার কয়েক-বার শ্রবণ করিবার পর, কয়েকবার মনন করিবার পর, কয়েক বার সমাধি অভ্যাস করিবার পর আর বহু কষ্ট সহ্য করিবার পর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ লোকের অভ্যাস অধিক কাল

পর্য্যন্ত করিতে হয়, অতএব উহার ব্যবহার খুব অল্প হয়। উহার মন বাসনা ক্ষয়ের কারণ নষ্টের মতন থাকে। এই মধ্যম প্রকারের জ্ঞানী আর উহাকে "নষ্ট মানস" বলে। ইহাদের মধ্যে কেউ কেউ এইরূপ হন যাঁহার অভ্যাস কম পরিপক্ক থাকে উহার বাসনার অংশ থাকিবার জন্য উহার মন নষ্ট না হইয়া থাকে। ইহারা মন্দ জ্ঞানী হন আর ইহাদের "সমনস্ক" বলে। ইনি কেবল জ্ঞানী আর প্রথমের দুইজনেই জ্ঞানী আর জীবন্মুক্ত হন। যিনি কেবল জ্ঞানী তিনি প্রাপ্ত দুঃখকে ভোগ করেন আর নিত্য প্রারব্ধের অধীন থাকেন। উঁহার মরণের পর মোক্ষ হয়। নষ্ট-মানস-জ্ঞানী প্রারব্ধকে জয় করিয়া থাকেন। পরশুরাম, জীবের মনরূপ ভূমিতে প্রারব্দের বীজ ভোগরূপী অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। কিন্তু নষ্ট মানস জ্ঞানীর মন ভূমিই নাই অতএব তথায় প্রারব্ধের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। এখন বাকী থাকে বহু মানসজ্ঞানী। এই জ্ঞানীর অবস্থা সেইরূপই হয় যেইরূপ অতি বুদ্ধিমানের হয় যে একসঙ্গে পাচদশ কর্ম্ম সফলতা পূর্ব্বক করিতে পারে। আমি সাধারণ পুরুষকেও দেখি যে একদিকে রাস্তায় চলে, আর মুখে কিছু কথাবার্ত্তাও কহে আর হাতে কিছু কাজও করে। মন এক হইলেও যেমন এই তিন ক্রিয়া হয় তেমনি উত্তম জ্ঞানী স্বরূপের অনুসন্ধান হইতে বিচলিত না হইয়াও নির্ভয়তায় ব্যবহার করিতে থাকেন। পরশুরাম, তুমি নিজে যে শত্রু সহস্রার্জ্জুনকে বধ করিয়াছ উহার হাজার হাত ছিল। উহার হাতে অনেক অস্ত্র ছিল, কিন্তু অল্পও ভুল না

করিয়া উহার সহিত তুমি কি করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলে এইকথা তুমি স্বয়ংই জান—এইরূপ ব্যবহারী পুরুষের মনও বহুবিধ হইয়া ক্রমে আসে এইরূপ অনেক কার্য্য যেরূপে করে সেইরূপ স্থিতি উত্তম জ্ঞানীরও হয়। উঁহার মন আত্মাকার হয় অতএব বাহ্য বিষয়ের আকারের পরিণামে উহার স্বস্থিতির কিছুও বিরোধ হয় না। এইজন্য ইহাকে বহুমানস জ্ঞানী কহা হয়। যদি উহার মনভূমিতে প্রারব্ধের অঙ্কুর অঙ্কুরিত হইতে থাকে ত উহা জ্ঞানাগ্নির দ্বারা শীঘ্র জ্বালিয়া যায়। যদি পুনরায় অঙ্কুরিত হয় ত পুনরায় জ্বলিয়া যায়। প্রারব্ধরূপী বীজের অঙ্কুরই সুখদুঃখের সমাগম উহার সম্বন্ধে বিচার জারী হওয়াই উহার ফল। কিন্তু অঙ্কুর ভস্ম হইয়া যাইবার পর ফল কোথা হইতে আসিতে পারে? অতএব এইরূপ জ্ঞানীর যে ব্যবহার তাহা দৃঢ় পরিচত (অনুভূত) আত্মানুসন্ধান আর সংস্কারের প্রবলতার বলেই করেন। কোনও শিশুর সহিত খেলিতে খেলিতে কোন প্রৌঢ় মনুষ্য কখন ক্ষুদ্র নিমিত্তিতে যেরূপ সুখী আর কোন নগণ্য কারণে অতিশয় দুঃখী হইয়া যায় সেই ব্যবহার করিবার সময় বহু মানসজ্ঞানীও আনন্দ ও খেদ করিতে থাকেন। কোন অন্য লোকের কার্য্য করিবার সময় আমাদের যেমন সুখদুঃখ বাহিরে হয়—অন্তঃকরণে হয় না সেইরূই ব্যবহার করিবার সময় এই বহু মানসজ্ঞানীর অবস্থা হয়, উঁহার হৃদয়ে সদাই স্বস্থতা থাকে। সেই বুদ্ধিমান জ্ঞানী পুরুষ বাসনার নাশ করিবার জন্য তদ্বিরুদ্ধ বাসনার অভ্যাস আর মনের নিরোধ অধিক করে না।

ফলতঃ উঁহার বাসন জ্ঞানোত্তর কালেও প্রকট হইতে থাকে সেইজন্য কেউ কর্ম্মনিষ্ট, কেউ জ্ঞানী কেউ ক্রোধী আদি অনেক প্রকারের আচরণকারী উত্তম জ্ঞানী হন। ইহার মধ্যে যে সমনস্ক মন্দজ্ঞানীর বিষয় বলা হইয়াছে উহারও এই নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে যে "অখিল দৃশ্য অসত্য হয়" আর সমাধি তথা স্বরূপের অনুসন্ধানের সময় উহার নিকট অন্য কিছুই ভাসিত হয় না, কিন্তু সমাধি হইতে উত্থান হইবার পর উহার (আত্মার) অনুসন্ধান ভঙ্গ হইয়া যায়। সত্য কথা বলিতে স্বরূপের অখণ্ড অনুসন্ধান হওয়া অর্থাৎ ব্যবহারে উহার অর্থাৎ স্বরূপের অখণ্ড অনুসন্ধান খণ্ডিত না হ'ওয়াই আসল বা সত্য সমাধি হয়। কারণ যে মূল নির্ব্বিকল্পস্বরূপ হন উঁহা সবেরই আধার হন আর সবে সদাই উঁহার স্ফুর্ত্তি হইতেছে। উহা ভিন্ন কিছুই নাই। আর পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে যে ব্যবহারের অনেক অবস্থায় নির্ব্বিকল্পতার অনুভব ও উহার হইতে থাকে। কিন্তু ইহাতেই সকলের সমাধি মোক্ষ ফলদায়ক সমাধি বলা যায় না। যাঁহার স্বরূপের অখণ্ড অনুসন্ধান হইতে থাকে তাঁহারই সমাধিকে যথার্থ সমাধি বলা উচিত। উত্তম জ্ঞানীর সদাই এই অনুভব হইতে থাকে যে শুদ্ধ চিদ্রূপ ব্যবহারের সময় বেদ্য পদার্থ বিবর্জ্জিত অর্থাৎ উহার দ্বারা (বেদ্য পদার্থের দ্বারা) উহার স্পর্শ হয় না। এই জ্ঞান হইবার পরেও —যে অকাশের নীল বর্ণ যথার্থ আকাশে নাই —উহার নীল বর্ণ চক্ষে দেখা যায়। কিন্তু উহার অসত্যতাকে জানিয়া লইবার কারণ হৃদয়ের অনুভব বদলাইয়া যায়। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইবার পূর্ব্বের

ভাসে (অনুভবে) আর পরের ভাসে অন্তরঙ্গ ভাবের ভেদ থাকে অর্থাৎ দুই ভাব বিভিন্ন হয়। যখন সব বেদ্য পদার্থ অসত্য বলিয়া বোধ হইয়া যায় তখন বেদনাতে শুদ্ধ চিদ্রূপে, উহার সম্বন্ধ কোথায় হইতে পারে ? ইহাতে সিদ্ধ হয় যে ব্যবহারের সময়েও উত্তম জ্ঞানী পুরুষের সংবিৎ —চিৎকলার-বেদ্য সম্বন্ধ রহিতই হয়। নষ্টমানস জ্ঞানী সদাই উন্মনী অবস্থায় থাকেন। মনের নিঃসঙ্কল্প হওয়াই উন্মনী অবস্থা হয়। বেদ্য পদার্থকে সত্যরূপে গ্রহণ করাই মনের চলন অথবা সঙ্কল্প বলে। উত্তম জ্ঞানীর দুই অবস্থা অর্থাৎ উন্মনী অবস্থা আর সংকল্প অবস্থা একই সময় থাকে। অতএব সে সদাই বাহ্যতঃ বুত্থানকালে অর্থাৎ ব্যবহার করিবার সময়ে আর অন্তঃস্থ সমাধিমগ্ন অবস্থায় থাকেন। এইজন্য উহার স্থিতি সদাই সঙ্গ রহিত হয় অর্থাৎ অসঙ্গ হয়।

বিংশ প্রকরণ

—০—

দেবীর অবতার।

—০—

এবং সর্বৈরভিধ্যাতা ত্রিপুরা চিচ্ছরীরিণীঃ ॥
আবিরাসীচ্চিদাকাশ,—রূপা শব্দাত্মিকা পরা ॥ ১৯ ॥

দত্তাত্রয় আবার কহিতে লাগিলেনঃ—"পরশুরাম, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। এখন এই সম্বন্ধে তোমাকে

পূর্ব্বকারের এক ইতিহাস বলিতেছি। কোন সময়ে সত্য লোকে ব্রহ্মার সভায় একবার এই জ্ঞান বিষয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বিচার হইতেছিল। ব্রহ্মার এই জ্ঞান মণ্ডলে ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, নারদ, চ্যবন, বামদেব, বিশ্বামিত্র, গৌতম, শুক্র, পরাশর, কণ্ব, কাশ্যপ, দক্ষ, সুমন্ত, শংখ, লিখিত, দেবল আর অনেক ব্রহ্মর্ষি তথা অন্য বড় বড় রাজর্ষি একত্রিত ছিলেন। তথায় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বিষয় উপস্থিত করিয়া উঁহারা বড় ভারি মীমাংসা করেন। এই সময়ে ঋষিরা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন যে "ভগবন্, আপনি সব লোকের জ্ঞানী ও পরাতত্ত্বের জ্ঞাতা হন। কিন্তু আমাদের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হইবার কারণ আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই সমাধিস্থ থাকেন, অনেকে মীমাংসায় লাগিয়া থাকেন, কেউ ভক্তিপ্রেমে নিমগ্ন থাকেন, কেউ কেউ উৎসাহ পূর্ব্বক কর্ম্মমার্গে চলিতেছেন। কেউ বা কোন বহির্মুখ পুরুষের মত ব্যবহার করিতে থাকেন। আপনি বলুন ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে হন। এখনত আমরা সকলে আপনা আপনি বুঝি যে নিজ নিজ পক্ষই শ্রেষ্ঠ"।

ঋষির প্রশ্ন শুনিয়া ব্রহ্মা আপন মনে বিচার করিলেন যে ইহাদের নিজের প্রতি যেমন প্রতীতি সেইরূপ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি নাই। অতএব তিনি কহিতে লাগিলেনঃ—"হে মুনিগণ, আমিও ঠিক ঠিক জানি না। সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব এই বিষয় সম্পূর্ণ জানিবেন। যদি ইচ্ছা হয় ত চলুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা ঋষিমণ্ডলীর সহিত সেই দেবর্ষিদেবের নিকট গেলেন। প্রশ্ন শুনিয়া আর ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া মহাদেবও জানিলেন যে এইসব ঋষিরা শ্রদ্ধাবান নহেন। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার কথা ইহারা সত্য বলিয়া বুঝিবে না। ইহারা এই বুঝিবে যে "আমাদের মতন এই মত কেবল এক মহাদেবের আছে।" অতএব মহাদেব কহিতে লাগিলেনঃ—"হে মুনিগণ, আমিও এই বিষয়কে ঠিক ঠিক বুঝি না। আমরা ভগবতী শ্রীবিদ্যাদেবীর ধ্যান করি, উঁহার কৃপায় আমাদের গুঢ়ার্থ বোধগম্য হইবে।"

মহাদেবের কথা শুনিয়া সব ঋষি তথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি দেবগণ মহেশ্বরী চিৎশরীরিণী বিদ্যাদেবীর ধ্যান আরম্ভ করিলেন। সেই সময় সব লোক ধ্যানস্থ হইলে অকাশমণ্ডলে মেঘগর্জ্জন সদৃশ এক গম্ভীর ধ্বনি হইল আর সেই দেবী গগনে শব্দরূপে প্রকট হইলেন। "মুনিগণ আপনারা আমার ধ্যান কেন করিয়াছেন? আপনাদের মনোরথ ব্যক্ত করুণ। আমার ভক্তের কোনও ইচ্ছা কখনও বিফল হয় না। অকাশ-বাণী শুনিয়া মুনিমণ্ডলে সেই বিদ্যাদেবীকে নমস্কার করিলেন। ফের সেই সেই দেবতাগণ ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে উঁহাকে স্তুতি করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর ঋষিরা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা কহিতে লাগিলেনঃ—"হে দেবী শ্রীবিদ্যে, আপনাকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিতেছি। আপনি সকলকে উৎপন্ন করেন, পোষণ করেন আর বিলীন করেন। আপনাকে নমস্কার। আপনার জন্ম

নাই—আপনি সদাই পুরাতন ; আপনার জরা নাই অতএব আপনি সদাই নূতন হন। আপনিই সব কিছু হন, সবের সার হন, সর্ব্বজ্ঞ আর সদা সর্ব্বানন্দরূপে হন। আবার আপনি পুনরায় সর্ব্বশূন্য, কোথাও থাকেন না, সাররহিত কিছুই জানেন না আর সর্ব্বানন্দ বর্জ্জিত। দেবী, আপনাকে বার বার প্রণাম। সম্মুখে, পিছনে নীচে, উপরে, পাশে আর সকল দিকে আপনাকে আমাদের প্রণাম। দেবী এখন আমাদের ইহা বুঝাইবার কৃপা করুণ যে (১) আপনার পর (২) আর অপররূপ কিরূপ হয়? এইরূপে ক্রমশঃ আমাদের ইহাও বুঝাইয়া দিন যে (৩) আপনার ঐশ্বর্য্য (৪) আপনার জ্ঞান (৫) জ্ঞানের ফল আর (৬) জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার সাধন কি, (৭) মুখ্য সাধক কে হয়, (৮) সিদ্ধির পূর্ণ অবস্থা কি করিয়া হয় ; আর (৯) সিদ্ধ পুরুষ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে হন? আপনাকে পুনরায় ও আমাদের অসংখ্য প্রণাম।" .

প্রশ্ন শুনিয়া ঋষিমণ্ডলীর সম্বন্ধে দেবীর স্নেহদৃষ্টি উৎপন্ন হইল। উনি আপনার অনন্দিগ্ধ আর উৎকৃষ্ট ভাষণ আরম্ভ করিলেন। উনি কহিতে লাগিলেন :—ঋষিগণ শুন। তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর ক্রমশঃ বলিতেছি। আজ বেদ সাগর মন্থন করিয়া তোমাদের জন্য অমৃতকে বাহির করিতেছি।

(১) প্রথম আমার পররূপের কথা শুন। এইসব জগৎ দর্পন প্রতিবিম্বের মত যাঁহাতে উৎপন্ন হইতেছে, থাকিতেছে আর আর লীন হইতেছে, আত্মজ্ঞান রহিত পুরুষের যাহা জগৎ আকারে

ভাসিত হইতেছে, যোগ্য লোকের যাঁহা নির্ব্বিকল্প বোধ হইতেছে. যাঁহা যথার্থ শান্ত, গম্ভীর আর নিশ্চল হন, কোন প্রকারের বাসনা না রাখিয়া একানিষ্ঠ ভক্ত প্রেমপূর্ব্বক যাঁহার নিত্য সেবা করিতেছেন, অদ্বৈতপদের জ্ঞান হইয়া যাইবার পরেও ভক্ত লোক যাঁহার জন্য দেবতা ও ভক্তের ভেদ ভাব উৎপন্ন করেন ; যাঁহা ইন্দ্রিয়, মন আর প্রাণের অন্তঃসূত্রে হয়, যাঁহার অভাব হইলে কিছুই শেষ থাকে না আর যাহা শাস্ত্রের আধারে সামান্য রীতিতে জানা যায় উহা আমার পররূপের শ্রেষ্ঠ—মূর্ত্তি।

(২) সারা ব্রহ্মাণ্ডের আগে অমৃত সমুদ্রে সে রত্নের দ্বীপ আছে উহার এক কদম্ববনে চিন্তামণির নির্ম্মিত এক মনোহর মন্দির আছে। উহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আর ঈশ্বর এই চতুস্পাদ সদা শিবাত্মক যে মঞ্চ আছে উহার উপর অনাদি মিথুনাত্মক ত্রিপুর সুন্দর মূর্ত্তি বিরাজমান আছে উহা আমার অপররূপ। এইরূপ সদাশিব, ঈশান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, গণপতি, ষড়ানন, ইন্দ্রিয়াদি দিক্‌পাল, লক্ষ্মীআদি শক্তি, বসুরুদ্র আদিগণ, রাক্ষস, দেব, নাগ, যক্ষ, কিন্নরাদি যে যে পূজ্য হন ইহারা সব আমার অপররূপ হয়। আমি সর্ব্বত্র থাকি কিন্তু মায়ায় মোহিত পুরুষ আমায় চিনে না। কিন্তু সে আমারই সেবা করিতেছে আর উহার অভিষ্ট ফল আমিই দিই। আমি ব্যতীত অন্য কেহ পূজ্য নাই আর অন্য কেহ ফলদাতাও নাই। যে আমার সেবা যেরূপে করে উহাকে আমি সেইরূপই ফল দিই।

(৩) আমার ঐশ্বর্য্য অসীম। কাহারও সাহায্য না লইয়া আপনার চিৎস্বরূপে আমি একলাই অনন্ত জগতের আকারে ভাসমান

হইতেছি। আর ভাসমান হইয়াও আমি নিজ স্বরূপ হইতে বিচলিত হই না। এইরূপ অসম্ভব কার্য্য করাই আমার মহৎ ঐশ্বর্য্য। ঋষিগণ, আমার মহান্ ঐশ্বর্য্যের আরো সূক্ষ্ম বর্ণনা শুনুন। সকলের আশ্রয় আর সকলের অন্তর্যামী হইয়াও আমি সঙ্গরহিত হই। নিত্য মুক্ত হইয়াও পুনরায় বার বার মুক্ত হইতেছি। সদ্গুরুর নিকট যাইয়া আর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া পুনঃ আত্মস্বরূপকে জানিতেছি। পুনরায় আত্মস্বরূপকে ভুলিয়া বহু সময় পর্য্যন্ত সংসারে মগ্ন থাকিতেছি। এই সংসারকে কোন সাধনসামগ্রী বিনা নির্ম্মাণ করিতেছি। এইরূপ আমার অনেকপ্রকারের ঐশ্বর্য্য আছে। সহস্র-মুখীও উহার গণনা করিতে পারে না। সংক্ষেপে ইহা বলা যায় যে আমার ঐশ্বর্য্যের এক লেশমাত্র হইতে এই অদ্ভুত সংসার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

(৪) আমার জ্ঞান দ্বৈত, অদ্বৈত আদি অনেকপ্রকারের হয়। উহার ফলও শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠের ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। দ্বৈতজ্ঞান অনেকপ্রকারের হয় কারণ উহা ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যমূর্ত্তির উপর অবলম্বিত হয়। উহাকে ধ্যান আর উপাসনা কহা হয়। কিন্তু ইহা স্বপ্ন অথবা কল্পনার মত ক্ষণিক অনুভবের হয়। আপন মানে অর্থাৎ তদকালীন ও তদবস্থায় বা আপনস্বরূপে ইহা সফলও হয়। ইহার অনেক ভেদ আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার অপর মূর্ত্তির ধ্যান মুখ্য হয় কারণ উহা ক্রমে ক্রমে মুখ্য ফল অর্থাৎ মোক্ষ দেয়। অদ্বৈতজ্ঞানেরই মুখ্যনাম জ্ঞান হয়। আমার—পরম শ্রীবিদ্যা দেবীর —আরাধনা করা ব্যতীত অদ্বৈত মহাবিদ্যা প্রাপ্ত কিরূপে হইতে

পারে ? কেবল পরম চৈতন্যই অদ্বৈত জ্ঞান হয়। উঁহারই শুদ্ধ অবস্থার জ্ঞান হইলেই দ্বৈতভাবনার নিবৃত্তি হয়। এই জ্ঞানের অনুভব চিত্তের কেবল আত্মাভিমুখ হইলেই হয়। ঋষিগণ, বেদ-বাক্যের সহায়তায় তথা যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা কেবল আত্মার ভাসিত হওয়াকে, আর "আমি শরীরই হই" ইত্যাদি ভাবনার নাশ হওয়াকেই জ্ঞান বলা হয়। যে জ্ঞানের দ্বারা ভাসিত হইতেছে যে দৃশ্য, তাহা কোথাও কিছুই নাই এর মতন অর্থাৎ মিথ্যা এইরূপ বোধ হইতে থাকে ; যে জ্ঞান হইয়া যাইবার পর কোথাও কিছুই জানিতে বাকী থাকে না ; সবই বিষয়সুখের অনুভব যথায় আত্মরূপ হইয়া যায় উহাই আসল অদ্বৈত জ্ঞান হয়। সে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে চিরকালের দৃঢ় সন্দেহ নষ্ট হইয়া যায় আর কামাদি বাসনাগুলি সম্মুখে আসিতে পারে না—দন্তহীন সর্পের মত ব্যর্থ হইয়া যায় ; উহাই পরম জ্ঞান হয়।

(৫) জ্ঞানের ফল সব দুঃখের নাশ হওয়া হয় অর্থাৎ নাশক হয়। অত্যন্ত নির্ভয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই আসল ফল হয়। "এখানে কেউ অন্য আছে" এই ভাবনা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু সূর্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার দূর হইয়া যায় সেইরূপ অদ্বৈত-তত্ত্বকে পুরাপুরি অর্থাৎ সম্পূর্ণ জানিয়া লইবার পর এই দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। অতএব দ্বৈতভাবনা নষ্ট হইয়া যাইবার পর কোথাও ভয় থাকিতে পারে না। যেখানে স্বস্বরূপ হইতে ভিন্ন ফল মিলে উহা সদাই ভয়কারক হইবে কারণ আত্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য সব নাশবান্ হয়। নাশবান্ বস্তুতে ভয় থাকার কারণ উহাতে

নির্ভয়তা কোথা হইতে আসিবে? সব সংযোগের অন্তে বিয়োগ হইয়া থাকে অতএব ফলের যোগেরও নষ্ট হওয়া নিশ্চিত হয়। ফলতঃ যতক্ষণ না ফল আত্মরূপ না হইয়া অন্যরূপ হয় ততক্ষণ ভয় থাকে। যাহা আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন না হয় উহা নির্ভয় ফল হয়; উহাকে মোক্ষ বলা হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান একরূপ হইয়া যাইবার পর সর্ব্বভয়রহিত মোক্ষনামক সর্ব্বোত্তম ফল মিলে। জ্ঞাতার সঙ্কল্প বিকল্পশূন্য আর মূঢ়তা রহিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপই জ্ঞান হয়। সেই স্বরূপ প্রথমে জানা যায় না; গুরু আর শাস্ত্র উহাকে চিনাইয়া দেন। উহা জ্ঞেয় তত্ত্ব হয়। যতক্ষণ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সব ব্যর্থ হয়। যখন এই তিনের পরস্পর ভেদ নষ্ট হইয়া যায় তখনই উহা জ্ঞাতা হন; তখনই উহা জ্ঞেয় হন আর তখনই উহা জ্ঞান হন। ইহাই জ্ঞানের ফল। যথার্থ বা আসল কথায় জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় আর ফলে ভেদই নাই। ব্যবহারের সফলতার জন্য এই ভেদের কল্পনা করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য ইহা হয় যে এখানে কিছু নূতন ফল মিলে না। যতক্ষণ এই আত্মা মায়ার কারণ জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান আর উহার ফলাদিরূপে ভাসিত হইতে থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সংসার পর্ব্বতের সমান কঠিন হইয়া থাকে। কিন্তু যখন প্রসঙ্গ-বশে কোন কারণে ভেদশূন্যস্বরূপ ভাসমান হয় তখন জলে চিনির মত সারা সংসার বিলীন হইয়া যায়।

(৬) এইরূপ যথার্থ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য মুখ্যসাধন উহার সম্বন্ধে তৎপরতা। তীব্র তৎপরতা হইবার পর অন্য সাধনের কিছুও

আবশ্যকতা নাই। বিশেষ তৎপরতা না হইলে অন্য হাজার উত্তম সাধনে কি হইতে পারে? তৎপরতা হওয়াই মোক্ষের মুখ্য সাধন হয়। "সব কিছু করিব কিন্তু এই কার্য্যকে অবশ্য সিদ্ধ করিব" এইরূপ নিরন্তর বুঝাই অর্থাৎ মনে রাখাই তৎপরতা হয়। যাঁহার এইরূপ অবস্থা তিনি সর্ব্বথা মুক্ত কারণ তিনি কিছু দিনে, কিছু মাসে, বৎসরে অথবা অন্য জন্মে মুক্তি পাইবেন, তিনি মুক্তিপথে লাগিয়া থাকেন। দেরী এইটুকু থাকে যে নির্ম্মল বুদ্ধিমান্ শীঘ্র আর মন্দবুদ্ধিমান্ বিলম্বে যাত্রা সমাপ্ত করিবে। সব উদ্যোগের নাশক এই বুদ্ধি-সম্বন্ধী দোষ কয়েক প্রকারের হয়। উহার কারণ লোক সংসারাগ্নিতে জ্বলিতে থাকে। উহার প্রথম দোষ অনাশ্বাস, দ্বিতীয় দোষ কামবাসনা আর তৃতীয় দোষ জাড্যতা হয়। অনাশ্বাস— সংশয় আর বিপর্য্যয়—এইরূপ দুই প্রকারের হয়। উপযুক্ত তৎপরতার জন্য এই দুই সংশয় ও বিপর্য্যয় মুখ্য বাধা হয়। বিপরীত নিশ্চয় করিতে থাকিলে এই দুই ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাকে নাশ করিবার মুখ্য উপায় ইহার মূলকেই বিনাশ করা। অনাশ্বাসের মূল শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের খোজ করা। উহা অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্ককে ত্যাগ করিয়া সতর্ক বা সুতর্ক অর্থাৎ শাস্ত্রানুযায়ী বিচার করিবার জন্য উহার বিরোধী তর্কের বিরুদ্ধ নিশ্চয় করিতে হইবে। এইরূপ করিলে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইবে আর অনাশ্বাস নষ্ট হইবে। বুদ্ধিতে কামাদি বাসনার সংস্কার থাকিলে শ্রবণে বাধা হয়। এইরূপ বুদ্ধি প্রায় জ্ঞান বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত হয় না। ব্যবহারেও দেখা যায় যে কামীপুরুষ আপনার প্রিয় বিষয়ে

এত লীন হইয়া যায় যে উহার সম্মুখে কিছুও দেখিতে পায় না আর কিছু শুনিতেও পায় না। এইরূপে ইহার শ্রবণ করা না করার সমান হইয়া যায়। এই কামবাসনাকে বৈরাগ্য বলে বশ করা চাই। এই কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ইত্যাদি হাজার আছে। সবের মূল কাম হয়। ইহার নষ্ট হইয়া যাইবার পর অন্য কিছু থাকে না। ইহা বৈরাগ্যদ্বারা নষ্ট হয়। "আমার ইহা মেলা, পাওয়া চাই" এইরূপ যে আশা উহাই কাম হয়। উহা প্রাপ্য পদার্থের সম্বন্ধে স্থূল আর অপ্রাপ্য পদার্থের সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে থাকে। উহাকে দৃঢ় বৈরাগ্যে দূর করা চাই। বৈরাগ্যের মূল প্রতিক্ষণ কাম্য বিষয়ের দোষের বিচার করা আর সেই বিষয়ের সম্বন্ধকে ত্যাগ করা হয়। এইরূপে বিষয় বাসনা নষ্ট হয়। বুদ্ধির তৃতীয় দোষ, জড়তাকে অভ্যাসদ্বারাও জয় করা কঠিন হয়। এই দোষ থাকিলে বড় তৎপরতায় শ্রবণ করিলেও বুদ্ধিতে কিছু প্রবেশ হয় না। ইহা (জড়তা) পুরুষার্থনাশক বড় দোষ। উহার জন্য পরমেশ্বরের সেবা করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। উহার সেবার পরিণামেই বুদ্ধির জড়তা দূর হয়। এই জড়তার ন্যূনাধিকতার অনুসারে সেই অথবা অন্যজন্মে ফল প্রাপ্ত হয়। ঋষিগণ, যে কোন পুরুষের সারা সাধন সামগ্রী আমার কৃপায় প্রাপ্ত হয়। যে পুরুষ আমার উপাসনা নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভক্তিপূর্ব্বক আর নিত্য করিতে থাকেন উনিই সাধনের কঠিনতাকে দূর করিয়া শীঘ্রই কৃতার্থ হইয়া যান। যে অবিচ্ছেদে অনেক সাধনের অনুসারে কার্য্য করিতে থাকিয়া সব বুদ্ধিকে বিকশিতকারিণী পরমেশ্বরীর আর আমার দিকে লক্ষ্য করে না

উহার বুদ্ধিমন্দতা দূর হয় না আর উহা পদে পদে ঠক্কর খাইতে থাকে। উহার কখনও ফল মিলে না। সারাংশ, তৎপরতাই জ্ঞানের মুখ্যসাধন।

(৭) যাঁহার এইরূপ তৎপরতা আছে তিনিই মুখ্য সাধক। ফের যদি উহার আমার প্রতি ভক্তিও হয় তাহা হইলে উহা সর্ব্বমান্যই হন।

(৮) আমি শরীর নহি—আত্মা—এইরূপ নিশ্চয় হওয়া সিদ্ধি হয়। দেহাদিতে ভাসিত হয় যে আত্মত্ব অর্থাৎ দেহাদিই আত্মা এইরূপ জ্ঞান তাহা নষ্ট হইয়া যাইলে বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া যায় তখন সিদ্ধি আপনা আপনি হইয়া যায়। আত্মা সম্বন্ধে সকলেরই নিশ্চয়তা আছে অর্থাৎ সকলেই ইহা জানে যে সে আছে। কিন্তু এই নিশ্চয় কেবল রূপে না হইয়া অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পরূপে না হইয়া শরীরাদিরূপে হয়। ইহার জন্য বড় ভারি অনর্থ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। অতএব "দেহাদিকে ভাসিত করে যে অর্থাৎ দেহাদির ভাসক কেবল চৈতন্য উহাই আত্মা হন"। এইরূপ অর্থাৎ দেহাদির ভাসক আত্মা হন এই নিশ্চয় করিয়া সব সংশয়ের নষ্ট হওয়াকেই জ্ঞানসিদ্ধি কহে। খেচরত্ব আর অনিমাদি সিদ্ধিগুলি এই জ্ঞানসিদ্ধির ষোল অংশের এক অংশের সমানও নহে। এই সকল সিদ্ধি বিশিষ্ট দেশকালে সীমাবদ্ধ থাকে। ইহার সামর্থের অনুভব অমুকস্থানে আর অমুক সময়েই হইতে পারে। কিন্তু এই শিব স্বরূপ আত্মসিদ্ধি অসীম হন। আত্মজ্ঞানের সাধন করিতে করিতে অনিমাদি ক্ষুদ্র সিদ্ধি-

গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তিতে ইহারা বিঘ্ন কারক হয়। ইন্দ্রজালের মত এই সিদ্ধিগুলি হইতে স্বহিত অর্থাৎ নিজের মঙ্গল কি হইতে পারে? আত্মজ্ঞান হইয়া যাইবার পর ব্রহ্মার অধিকার স্থানও অর্থাৎ ব্রহ্মলোকও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, উহার জন্য সিদ্ধিগুলি কি আর হয় অর্থাৎ কিছুই নহে। অতএব আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য সিদ্ধিই নাই। ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে যাহার দ্বারা দুঃখের নাশ চিরকালের জন্য হইয়া যায়, আনন্দে হৃদয় গদগদ হইয়া যায় আর মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় উহাই যথার্থ সিদ্ধি হয়। এই জ্ঞান সিদ্ধি বিবিধ অভ্যাসের ভেদের জন্য বুদ্ধির নির্ম্মলতার ন্যূনাধিকতার কারণ আর জ্ঞানের পরিপক্কতার তারতম্যের কারণ উত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ট তিনপ্রকারের হয়। ব্যবহার করিবার সময় যে সিদ্ধির দ্বারা তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হয় না—যাহা স্বভাবতঃই উহা (তত্ত্বানুসন্ধান) হইতে থাকে—উহা উত্তম জ্ঞান সিদ্ধি হয়; যেখানে অনুসন্ধান করিতে হয় উহা মধ্যম সিদ্ধি, আর যথায় ব্যবহার অল্পও হয় না—অবিচ্ছেদে স্বরূপের অনুসন্ধানই করিতে হয়—উহা কনিষ্ট সিদ্ধি হয়। বস্তুতঃ ইহাদের স্বরূপতঃ কিছুই ভেদ নাই। উত্তম সিদ্ধিকে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা বলে, যাহা স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যথার্থ হয় আর যাহার অনুভব বিচার করিতেই হইতে থাকে সেই স্বরূপসিদ্ধি সব হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। পূর্ব্বসংস্কার বশে যখন সব ব্যবহার আপনা আপনি কোন হেতু বিনা প্রবৃত্তি হইতে থাকে তখন তাহাকে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা বুঝা উচিত। যখন

প্রযত্নবিনা সংবিৎ আত্মার অখণ্ড স্থিতি হইতে থাকে তখন বুঝা উচিত যে সিদ্ধির সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়াছে। ব্যবহার করিবার পর আর পদার্থের অনুভব করিতে থাকিলেও যখন দ্বৈত ভাসিত হয় না তখন পূর্ণ অবস্থার সিদ্ধি হইতে থাকে। জাগ্রত ব্যবহার করিবার সময়ে নিদ্রার মত অন্তঃকরণে স্বস্থতা হওয়া জ্ঞান সিদ্ধির পূর্ণতার লক্ষণ হয়।

(৯) যাঁহার এইরূপ স্থিতি হয় তিনি উত্তম সিদ্ধ। ব্যবহার করিবার সময়ও যে বুদ্ধিমানের সমাধি কখনও ভঙ্গ হয় না উনি উত্তম সিদ্ধ হন। উত্তম সিদ্ধ তিনিই হন যিনি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানীগণের ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিকে আপনার অনুভবে বুঝিয়া লন। যিনি সন্দেহ আর ইচ্ছা রহিত তিনি সর্বোত্তম সিদ্ধ হন, যিনি ব্যবহারে সম্পূর্ণ নির্ভয় আর যিনি সব দুঃখ, সুখ তথা সংসারের অনেক ব্যবহারকে আপনার উপর অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ আত্মার উপর ভাসিত বলিয়া বুঝিতেছেন তিনি পূর্ণ সিদ্ধ হন। যিনি অত্যন্ত বদ্ধ আর পূর্ণ মুক্ত সকলকেই আপনার স্বরূপ বুঝেন তিনি সর্ব্বাত্মা উৎকৃষ্ট সিদ্ধ হন। যিনি আপনার উপর ফলিত, আগত বন্ধনজালকে ছাড়াইবার চেষ্টা অন্য লোকের ন্যায় করেন না— কারণ উহার উহাতে (বন্ধনে) পীড়াই হইতে পারে না—তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ হন। অধিক আর কি বলিব, সেই উত্তম সিদ্ধ আমিই (শ্রীবিদ্যা দেবী) হই। তোমাদের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলাম। এই রহস্যকে ঠিক ঠিক বুঝিয়া লইলে কাহারও কখনও পুনরায় মোহ হইবে না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই বিদ্যাদেবী আপনার বক্তব্য শেষ করিলেন। ইহা শুনিয়া সব ঋষি আপনার সন্দেহ ছাড়িয়া দিলেন। সকলে দেবীকে প্রণাম করিলেন; ফের তাহারা স্বস্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

পরশুরাম, আমি তোমাকে এই বিদ্যগীতা শুনাইলাম। ইহা শুনিলে সমূহ পাপ নষ্ট হইয়া যায় আর উত্তম বিচার করিলে উহা স্বানন্দ সাম্রাজ্যকে দান করেন। সাক্ষাৎ বিদ্যা দ্বারা প্রকটিত বলিয়া ইহা অত্যন্ত মহত্ব পূর্ণ। ইহাকে নিত্য পাঠ করিলে বিদ্যা দেবী সন্তুষ্ট হইয়া আত্মস্বরূপের জ্ঞান করিয়া দেন। পরশুরাম, সংসার সাগরে নিমগ্ন লোকের জন্য ইহ' এক উৎকৃষ্ট নৌকা।

একবিংশ প্রকরণ

ব্রহ্ম রাক্ষসের সাক্ষাৎ।

তদ্ধ্রদস্য পরে পারে ন্যগ্রোধে ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥
নির্জিতান্ ভক্ষয়ন্নাস্তে চিরকালাদ্ধি ভার্গব ॥ ৬২ ॥

মুনি দত্তাত্রয়ের এই পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধক বাক্য শুনিয়া পরশুরাম অবিদ্যার ভ্রমজাল হইতে অনেক খানি মুক্ত হইলেন। কিন্তু

পুনরায় ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া সে দত্তাত্রয়কে বলিতে লাগিল :— "ভগবন, আপনি সার নিঙ্ড়াইয়া বলুন যে জ্ঞানের অত্যন্ত নিশ্চিত আর সুলভ সাধন কি হয়। অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। আমাকে জ্ঞানীকে চিনিবার কিছু লক্ষণ বুঝাইয়া দিন। অর্থাৎ শরীর থাকিলেও শরীরের ভাণ থাকিবে না এইরূপ জ্ঞানী কিরূপ স্থিতিতে থাকেন আর ব্যবহার করিতে থাকিলেও উহার মন কি করিয়া অনাসক্ত থাকে।"

প্রশ্ন শুনিয়া দয়ালু দত্তাত্রয় সন্তোষ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন :— "পরশুরাম, তোমাকে সম্পূর্ণ সার বুঝাইতেছি, শুন! পরমেশ্বরের কৃপা জ্ঞানের মুখ্য সাধন হয়; যিনি অনন্যভাবে পরমাত্মার শরণে আসেন উহার অতন্ত সুলভ রীতিতে নিশ্চয় পূর্ব্বক জ্ঞান হয়। এই সাধন সর্ব্বোত্তম হয়। ইহা ভিন্ন অন্য সাধন সম্পূর্ণ ফল দিতে পারে না। এইরূপ হওয়া সহজ। পদার্থকে ভাসমান করে অর্থাৎ পদার্থের ভাসক যে জ্ঞানরূপ চিতির উপর অবিদ্যা নামে এক কল্পিত আবরণ আছে উহা যখন বিচারে নষ্ট হইয়া যায় তখন উহার স্বরূপের জ্ঞান হইতে পারে। অর্থাৎ চিতি ভিন্ন অন্য বাহ্য পদার্থের প্রতি আসক্তবান মানুষের এই জ্ঞান হওয়া দুর্লভ। ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান বাহ্য পদার্থে থাকে না আর সে নিত্য মনন তৎপর থাকে সেইজন্য সে তাহার স্বরূপের জ্ঞান অনায়াসে ও শীঘ্র হইয়া যায়। ঈশ্বর ভক্তিতৎপর মানুষের অন্য বহু সাধন না থাকিলেও স্বস্বরূপের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা প্রথমে অন্য ভক্ত উহার স্বস্বরূপ নিরুপণ করিতে থাকে। নিরুপণ

করিতে করিতে উহার চিত্ত তদাকার হইয়া যায়। এই তন্ময়তা দৃঢ় হইলে উহার চিত্ত অখণ্ড উপাস্যের আকারে আকারিত হইয়া যায়। পুনরায় তাঁহার হর্ষ শোক হয় না। উঁহার যাহার যাহার সহিত সম্বন্ধ হয় উহা উহার সহিত উপাসক আপন উপাস্যের রূপে মিলাইয়া দেয়। এই ক্রমে উহার চিত্ত শুদ্ধি হয়। অন্তে উহার উত্তম জ্ঞান প্রাপ্তি হয় আর সে জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। অতএব উৎকট ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণে ভক্তের সামনে ঈশ্বর স্বরূপের নিরুপণ করই উৎকৃষ্ট সাধন। প্রেমের দ্বারা পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন করা ভিন্ন অন্য ভাল সাধন নাই।

পরশুরাম, এখন তোমাকে জ্ঞানীর লক্ষণ বুঝাইতে হইবে, এই লক্ষণকে চেনা অত্যন্ত কঠিন হয় কারণ জ্ঞানীগণের স্বরূপ সকলের সম্পূর্ণ ভিতর আর বাহিরে হয়। ইহা অর্থাৎ জ্ঞানীরস্বরূপ নেত্র, বাণী আদির দ্বারা জানা যায় না। অতএব উহাকে জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে, না ত বলিতে পারে অথবা স্বয়ং চিনিতে পারে। যেমন কেহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে তাহা হইলে উহার কাপড়ে অথবা শরীর হইতে জানা যায় না সেইরূপ ইহাও জানা যায় না। আমি যে মিঠাই খাই উহার মিষ্টতা আমিই জানি সেইরূপ জ্ঞান স্বয়ং বেদ্য—নিজে নিজেকেই জানে অর্থাৎ আপনি আপনার জ্ঞাতা। স্বয়ং বেদ্য হইলে ও চতুর আর বিদ্বান পুরুষের ভাবণাদি উপদেশের দ্বারা বুঝা যায়। জ্ঞানীর স্থূল লক্ষন অনেক আছে, সূক্ষ্ম ও অনেক আছে। কিন্তু জ্ঞানী ভিন্ন অন্য সাধারণ লোকের ইহা জানা কঠিন হয়। কারণ দেখা যায়

যে জ্ঞানী পুরুষের মতন নিরুপণ করা, বলা, আচরণ করা আর সাধনে প্রবৃত্ত থাকা ইতর লোকেরও (অজ্ঞানীতেও) দেখা যায়। তাহা হইলেও উহার কিছু চিহ্ন বলিতেছি। আরম্ভে যাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল থাকে না সে জ্ঞানের জন্য কিছু সাধনের অভ্যাস করে। জ্ঞান হইলে অভ্যাসের প্রবলতার কারণ কখন কখন প্রযত্ন করা বিনাও সেই সাধন স্থির হইয়া যায়। ইহাতে মানাপমান, লাভহানি আর জয়পরাজয় যাহার স্বরূপের অল্পও বদলাইতে পাবে না তিনি উত্তম জ্ঞানী হন। আত্মানুভবের সম্বন্ধের গূঢ় প্রশ্নের অসন্দিগ্ধ আর তৎক্ষণাৎ উত্তর যিনি দেন তিনি উত্তম জ্ঞানী হন। জ্ঞানের বিষয়ে চর্চ্চা করিবার জন্য যাহার অতিশয় উৎসাহ আছে আর নিরুপন করিতে যিনি সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ তিনিই যথার্থ জ্ঞানী হন। স্বভাবত যাঁহার জীবব্যবহার উপিয়া গিয়াছে, যাঁহার সন্তোষ বৃত্তি, খোলা মন আর বড় সঙ্কটেও শান্ত থাকেন তিনি সকল হইতে উত্তম জ্ঞানী হন। সাধক আপনাকে স্বয়ংই পরীক্ষা করিতে পারেন এইজন্য জ্ঞানীর এই লক্ষণ বলা গেল। সাধকের নিত্য আত্ম পরীক্ষা করা উচিত। মনুষ্য পরের দোষ বাহির করিতে বড় নিপুণ থাকে। যদি সে সেইরূপ নিজ দোষ খোঁজে ত উহার জ্ঞান কেন হইবে না। যদি অন্যের পরীক্ষা করা ছাড়িয়া মনুষ্য আপনার গুণ দোষের বিচার করিতে লাগে তাহা হইলে সব সাধন প্রাপ্ত হইয়া উনি সিদ্ধ পুরুষ হইয়া যাইবেন। পরশুরাম, এইজন্য জ্ঞানীগণের লক্ষণ নিজের পরীক্ষা করায় উপযোগী—অন্যের পরীক্ষায় নহে। ইহাদ্বারা অন্যের পরীক্ষাও হইতে পারে না কারণ

যাঁহার বুদ্ধি জন্ম হইতে অত্যন্ত শুদ্ধ হয় উঁহার সাধনে আরম্ভেই জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এইসব লোক অধিক সময় পর্য্যন্ত অভ্যাস করেন না। অতএব পূর্ব্ব বাসনানুরধে তিনি কার্য্য করিতে থাকেন। তাহা হইলে এইরূপ সর্ব্বসাধারণ ব্যবহারে রত জ্ঞানীকে তুমি উপরোক্ত লক্ষণে কি করিয়া চিনিতে পারিবে? উহার পরীক্ষা তিনিই করিতে পারিবেন, যিনি স্বয়ং জ্ঞানী হন। মন্দ-জ্ঞানীর দেহস্থিতি মূঢ়ের মত হয়। ইহারা সহজ সমাধি প্রাপ্ত হন না। যখন ইনি স্বরূপানুসন্ধান করিতে থাকেন তখন তিনি পূর্ণ হইয়া যান। কিন্তু স্বরূপ অনুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া শরীরে আসিলে অর্থাৎ শরীরের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে তিনি সুখদুঃখের সম্পূর্ণ, পুরাপুরি অনুভব লন—সম্পূর্ণ পশুর মতন থাকেন। তিনি পূর্ণদশায় ধীরে ধারে পৌঁছান কিন্তু স্বরূপসুখের অনুভব করিতে থাকেন বলিয়া উহার অনুসন্ধান রহিত পশুদশা জ্বলিয়া গিয়াছে রজ্জুর মত উঁহার বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। কাপড়ের দুই প্রান্তে একবার লাক্ষারসে রং দিবার পর উহার দ্বারা সমস্ত কাপড় ব্যাপ্ত হইয়া যায় আর মধ্যভাগও রংএ পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ স্বরূপানুসন্ধান রহিত হইলেও মন্দজ্ঞানীর ব্যবহার পূর্ব্বোত্তর কালীন স্বরূপ অনুসন্ধানের কারণ বন্ধনকারক হয় না। মধ্যম জ্ঞানীর দেহের সহিত সম্বন্ধই হয় না। এখানে দেহের সম্বন্ধের অর্থ "দেহই আত্মা হয়" এইরূপ বুঝা উচিত। অতিশয় অভ্যাসের কারণ উহার মন সদাই লীন থাকে আর উহার দেহসংযোগের অনুভব হয় না। তিনি সদা সমাধীতে থাকেন অতএব ব্যবহারের সহিত

উহার সম্বন্ধই থাকে না। উহার শরীর যাত্রাও নিদ্রিতাবস্থার সদৃশ হয়। যেমন কোন লোক বাসনার বশে কিছু বলিয়া উঠে কিন্তু উহাতে উহার যথার্থ ভাণ থাকে না অথবা মদ্যপায়ী লোক যা কিছু বলে তাহা সে বুঝে না সেইরূপ সর্ব্বলোক ব্যবহারের বাহ্যস্থিত যে মহাযোগী তিনি কখনও কিছুও করিয়া ফেলিলেও তিনি নিজে কিছুই জানেন না; উহার দেহনির্ব্বাহ প্রারব্ধের বলে সংস্কার হইতে হয়। উত্তম জ্ঞানীরও দেহভাব থাকে না; তিনি রথের সারথির মত ব্যবহার করেন। রথের সারথি রথের সহিত কিছু ব্যবহার করে কিন্তু স্বয়ং রথ হইয়া যায় না, সেইরূপ দেহ স্বম্বন্ধে ব্যবহার করিতে থাকিলেও সেই উত্তমজ্ঞানী স্বয়ং দেহী অথবা কর্ম্মকর্ত্তা হন না—শুদ্ধ সংবেদনস্বরূপই থাকেন; ভিতরে অত্যন্ত নির্ম্মল ও স্বস্থ থাকিয়া বাহিরে ব্যবহার করিতে থাকেন। নাটকের নটীর ভিতর আর বাহির দুই ভিন্ন রূপই হয়। অথবা শিশুর সহিত ক্রীড়াশীল প্রৌঢ় পুরুষকে যেমন ক্রীড়ার সুখ-দুঃখের জড়িত দেখা যায় আর যথার্থে সুখদুঃখ রহিত হয় সেই-রূপ সেই জগতক্রীড়া তৎপর উত্তমজ্ঞানী পুরুষ ব্যবহারের সময় অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ নির্ম্মল হন। মধ্যম জ্ঞানী সমাধির দৃঢ় অভ্যাসের কারণ স্বস্থ থাকেন আর তত্ত্বিচারের বলে শান্ত থাকেন। উত্তম আর মধ্যমের ভেদ বুদ্ধির পরিপক্কতার কারণ হয়। পরশু-রাম, এই বিষয়ে পুরাকালে দুইজনের সংবাদ হইয়াছিল—উহা তোমাকে বলিতেছি।

পার্ব্বত্য দেশে রত্নাগদ্ নামক এক রাজা ছিল। সে বিপাশা

নদীর তীরে অমৃত নামক নগরে বাস করিতেছিল। উহার দুই পুত্র ছিল, হেমাঙ্গদ্ আর রুক্মাঙ্গদ্। তাহারা বড় বুদ্ধিমান ও উদার স্বভাবের ছিল। রাজার এই দুইজন বড় প্রিয় ছিল। রুক্মাঙ্গদ্ সকল শাস্ত্রে নিপুণ ছিল আর হেমাঙ্গদ্ উত্তম জ্ঞানী—স্বরূপের জ্ঞাতা ছিলেন। সেই দুইজন একবার শিকারে গিয়াছিল আর সেনা সহিত বসন্তারণ্যের এক সঘনবনে প্রবেশ করিল। অনেক জন্তু মারিয়া বিশ্রান্তির জন্য এক সরোবরের তীরে বসিল। সরোবরের অন্য দিকে এক বট বৃক্ষোপর সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এক ব্রহ্মরাক্ষস ছিল। সে পণ্ডিতের সহিত বিবাদ করিত আর উহাদের জিতিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত। রুক্মাঙ্গদ্ নিজ অনুচরের নিকট এই কথা শুনিয়া ছিল। উহার বিবাদে বড় রুচি ছিল, অতএব সে নিজ ভাইয়ের সহিত তথায় গেল আর উহার সহিত বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে জিতিয়া লইল। জিতিয়া সে উহাকে নিজ মুখে গিলিতে গেল। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া হেমাঙ্গদ সম্মুখে আসিয়া কহিতে লাগিল:—"রাক্ষস, কিছুক্ষণের জন্য থাম। একলা উহাকে ভক্ষণ কর না। আমি উহার ভাই হই। আমাকে জিতিয়া দুইজনকে খাইও।" ব্রহ্ম রাক্ষস বলিল:—"আমার এই আহার বহুদিন পরে মিলিয়াছে। আমার ক্ষুধাও খুব হইয়াছে। প্রথমে আমি ইহাকে খাইয়া পারণ করি, ফের তোমার সহিত বিবাদ করিব। ফের তোমাকে জিতিয়া ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইবার ইচ্ছা আছে। মহাত্মা বশিষ্ট বহুদিনে ভক্ষণ করিবার বর

দিয়াছিলেন। উঁহার দেবরাত নামক শিষ্য এইদিকে আপনি আসিয়াছিল ; আমি উহাকে ভক্ষণ করিয়াছিলাম সুতরাং তিনি আমায় শাপ দিয়াছিলেন যে, "আজ হইতে যদি তুই মনুষ্য ভক্ষণ করবি তবে তোর মুখ জ্বলিয়া যাইবে।" তখন আমি সেই মুনিকে বড় প্রার্থনা করিয়াছিলাম সেইজন্য তিনি আমাকে এই উপযোগী বর দিয়াছিলেন যে "এখানে আগত লোককে বিবাদে জিতিয়া তুই খাইতে পারিস্।" সেই অবধি আমি এইরূপই করিয়া আসিতেছি। ইহা সব হইতে বড় আহার আজ আমায় বহুদিন পরে মিলিয়াছে। অতএব প্রথমে আমি ইহাকে খাইব ফের যদি ইচ্ছা হয় ত তোমাকেও জিতিয়া লইব।" এই বলিয়া উহাকে খাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন হেমাঙ্গদ্ পুনরায় কহিতে লাগিল :—"ব্রহ্ম-রাক্ষস, কৃপাপূর্ব্বক আমায় ক্ষুদ্র নিবেদন শুন। তুমি ইহার বদলে আমার নিকট কিছু লইয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পার যেহেতু আমি আমার ভাইকে ছাড়াইতে চাইতেছি।"

তখন রাক্ষস রাজাকে বলিতে লাগিল :—"রাজা, আমি ইহাকে কাহারও বদলে ছাড়িতে পারি না। সময়ে মিলিয়াছে যে প্রাণপ্রিয় আহারকে কে ছাড়িতে পারে ? কিন্তু আমার একপণ আছে। আমার মনে অনেক প্রশ্ন আছে যদি তুমি উহাদের উত্তর দিতে পার ত আমি তোমার ভাইকে ছাড়িয়া দিব।" ইহা শুনিয়া হেমাঙ্গদ্ বলিল :—"প্রশ্ন কর, আমি তোমায় উত্তর দিতেছি।"

রাজা এইরূপ কহিলে সেই ব্রহ্মরাক্ষস অনেক গূঢ় প্রশ্ন করিল। পরশুরাম, তুমি সেই প্রশ্নগুলি শুন।

প্রঃ।—রাজপুত্র, এই বল যে আকাশ হইতেও বিস্তৃত আর পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম কি আছে, উহার স্বরূপ কি? আর উহা কোথায় আছে?"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! চিতি আকাশ হইতেও বিস্তৃত আর পরমাণু হইতেও অধিক সূক্ষ্ম হন। উহার স্বরূপ স্ফুরণ হয় আর উহার স্থান আত্মা হন।"

প্রঃ—"রাজপুত্র, একই চিতি অতি বিস্তৃত হইয়া পুনরায় অতি সূক্ষ্ম কি করিয়া হন? স্ফুরণ কি হয়, আর আত্মাই বা কি হয়?"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন। সকলের কারণ হইবার কারণ চিতি বিস্তৃত হন আর তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে কঠিনতার জন্য সূক্ষ্ম হন। চিতিই স্ফুরণ আর চিতিই আত্মা হন।"

প্রঃ—"রাজপুত্র, ইহা (চিতি) কোথায় মিলে? কি করিয়া মিলে? উহার মিলনে অর্থাৎ উহাকে জানিলে কি ফল মিলে?

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! উঁহার মিলনের স্থান বুদ্ধি। উহা একাগ্রতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উঁহার মিলন হইলে অর্থাৎ উঁহাকে জানিলে পুনরায় জন্ম হয় না।"

প্রঃ—"রাজপুত্র, বুদ্ধি কাহাকে বলে? একাগ্রতা কি হয়? জন্ম কি করিয়া হয়?"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! অবিদ্যার আবরণ সংযুক্ত চিতিকে

বুদ্ধি কহে। আত্মার দিকে অভিমুখ হওয়াই একগ্রতা হয় অর্থাৎ আত্মাই ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান হওয়াই একগ্রতা হয়। দেহেই আত্মভাবনা অর্থাৎ দেহই আত্মা এই ভাবনা হওয়াই জন্ম।"

প্রঃ—"রাজপুত্র, চিতি কি কারণে প্রাপ্ত হইতেছেন না? উঁহা কোন সাধনে প্রাপ্ত হন্? জন্ম কি কারণে হয়?"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! অবিবেকের কারণ চিতি উপলব্ধ হন না। উঁহা স্বয়ং উপলব্ধ হন কোন সাধনের দ্বারা নহে। কর্ত্তৃত্বের অভিমান হওয়ার কারণ জন্ম হয়।"

প্রঃ—"রাজপুত্র, এই অবিবেক কি হয়? আমি কি বস্তু হই? কর্ত্তৃত্বের অভিমান কি করিয়া হয়?"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! দেহাদি হইতে আত্মাকে ভিন্ন না বুঝাই অবিবেক হয় অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য জ্ঞান না থাকাকেই অবিরেক কহে। কি বস্তু হও, ইহার বিচার তুমি স্বয়ং কর। "আমি কর্ত্তা হই' এই ভবনাই কর্ত্তৃত্বের অভিমান হয়।"

প্রঃ—"রাজপুত্র, অবিবেক কি করিয়া নষ্ট হয়? উহার মূল কি? উহার কি কিছু আর অন্য কারণ আছে?"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! বিচারে অবিবেক নষ্ট হয়। বিচারের মূল বৈরাগ্য হয়। দোষদৃষ্টি বৈরাগ্যের কারণ হয়।"

প্রঃ—"রাজপুত্র, বিচার কি? বৈরাগ্য কাহাকে বলে? দোষাদৃষ্টি কি বস্তু হয়?"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! দ্রষ্টা আর দৃশ্যের পরীক্ষা করা

বিচার হয়। দৃশ্যের প্রতি আসক্তি না হওয়াই বৈরাগ্য হয়। দৃশ্যকে দু:খদায়ক বলিয়া বুঝিতে থাকাই দোষ দৃষ্টি হয়।”

প্রঃ—“রাজপুত্র, এই সব সাধ্য কি করিয়া হইবে? আর কি করিয়া মিলিবে? ইহারও মূল কারণ কি হয়?”

উঃ—“ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! এই সব ঈশ্বরের কৃপায় সাধ্য হয়। সেই কৃপা ভক্তি করিলে হয়। ভক্তির মূল কারণ সৎসঙ্গ হয়।”

প্রঃ—“রাজপুত্র, ঈশ্বর কাহাকে বলে? ভক্তি কাহাকে বলে? সন্ত কি করিয়া হয়?”

উঃ—“ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! সংসারকে যিনি ধারণ করেন তিনি পরমেশ্বর হন। উঁাহাতে (পরমেশ্বরে) মন লাগন ভক্তি হয়। সন্ত শান্ত ও দয়ালু হন।”

প্রঃ—“রাজপুত্র, সংসারে সদাই ভয় পায় কে অর্থাৎ ভীরু কে? সদাই দুঃখী কে হয়? সদাই দীন কে হয়?

উঃ—“ব্রহ্মরাক্ষস, শুন,! অত্যন্ত ধনবান সদা ভয়ভীত হইয়া থাকে। যাহার কুটুম্ব অধিক সে সদা দুঃখে থাকে। আশাগ্রস্ত মনুষ্য সদাই দীন হয়।”

প্রঃ—“রাজপুত্র, সংসারে নির্ভয় কে? দুঃখরহিত কে হয়? এমন কে আছে যাহার দীনতা নাই?”

উঃ—ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! যাহার কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই তিনিই নির্ভয় হন। মনকে যিনি জয় করিয়াছেন তিনি দুঃখরহিত হন। আত্মজ্ঞানীর দীনতা নাই।”

প্রঃ—"রাজপুত্র, উঁহা কে হয় যাহার লক্ষণ বলা যায় না? শরীর রহিত কে হয়? নিষ্ক্রিয়ের ক্রিয়া কি হয়?"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, শুন! জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলা যায় না। জীবমুক্ত দেহী হইয়াও দেহমুক্ত হন। আর উহার কর্ম্মকেই নিষ্ক্রিয় পুরুষের কর্ম্ম বলা হয়।"

প্রঃ—"রাজপুত্র, ইহা কোন বস্তু যাহা সংসারে আছে ও বটে আর নাই ও বটে? অত্যন্ত অসম্ভব কি হয়? বেশ, এই পর্য্যন্তই বল তাহা হইলেই তোমার ভাইকে ছাড়িয়া দিয়।"

উঃ—"ব্রহ্মরাক্ষস, যিনি আছেন ও নাই সেই বস্তু দৃক্ হন। দৃশ্য ব্যবহারের সত্যতা অত্যন্ত অসম্ভব হয়। আমি উত্তর দিলাম এখন আমার ভাইকে ছাড়িয়া দাও।"

এই অভ্রান্ত উত্তরে ব্রহ্মরাক্ষস সন্তুষ্ট হইয়া গেল। সে শেষে রুক্মঙ্গদকে ছাড়িয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণরূপ হইয়া গেল। উহাকে তেজস্বী ঋষিসদৃশ সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজপুত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন সে কি ছিল। তখন সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আপনার বৃত্তান্ত উহাকে কহিল। সে বলিতে লাগিল:—"প্রথমে আমি মগধদেশে বসুমান নামক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি সবশাস্ত্রে নিপুণ আর বড় বিখ্যাত ছিলাম। আমি আমার বিদ্যার বলে কয়েকবার শত বিদ্বানকে জিতিয়াছিলাম। ইহাতে আমার বড় গর্ব্ব হইয়াছিল। ইহার পরে একবার মগধরাজার সভায় যাইয়া আত্মবিদ্যার সম্বন্ধে আমি অষ্টক মুনির সহিত বিবাদ করিতে লাগি। সেই মুনি পুর্ণ আত্মস্বরূপের জ্ঞাতা বা অনুভবকারী

আর অত্যন্ত শান্ত ছিলেন। আমি শুষ্ক তর্ক করিতে বড় নিপুণ ছিলাম। অতএব বেদের সুরস অর্থে ভরা উহার সুন্দর ভাষণকেও আপনার তর্ককুশলতায় আমি দোষপূর্ণ প্রমাণ করিলাম আর ছলে উহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। তথাপি সেই মহাত্মা সেই রাজসভায় সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বস্থ হইয়া রহিলেন। কিন্তু উহার শিষ্য কাশ্যপ এই সব সহ্য করিল না। ক্রোধান্বিত হইয়া মুনি আমাকে শাপ দিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেনঃ--"দুষ্ট, তুই আমার গুরুকে অপমানিত করিয়াছিস্। তোর এইরূপ অধিকার নাই! ওরে অধম! তুই দীর্ঘকালের জন্য ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া যাইবি।" শাপে অত্যন্ত ভয় ভীত হইয়া অষ্টক মুনির শরণে পড়িয়া আমি কাঁপিতে কাঁপিতে প্রণাম করিলাম। সেই শান্ত মহাত্মা আমার বিরোধকে ভুলিয়া আমার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি শাপ হইতে মুক্ত করিবার উপায় বলিলেন। সেই মুনি কহিতে লাগিলেন—"ওরে, ব্রাহ্মণ, এই সভায় তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে উহার আমি যথাযোগ্য উত্তর দিয়াছিলাম। তথাপি কেবল তর্কবাদের বলে তুমি আমার উত্তরকে খণ্ডিতের ন্যায় করিয়া আপনার প্রশ্নকে স্থাপিত করিয়াছ। অতএব যখন কোনও বিদ্বান্ আসিয়া তোমার প্রশ্নের উচিত উত্তর তোমাকে দিবে তখন তুমি এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে।"

রাজপুত্র, সারাংশ এই হয় যে তোমার সঙ্গ লাভ করিয়া আজ আমি বহুদিনের শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। এইজন্য আমি বুঝিতেছি যে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম আত্মজ্ঞানী মহাত্মা হন।"

রাক্ষসের এই বৃত্তান্ত শুনিয়া হেমাঙ্গদ্ বড় আশ্চর্য্য হইলেন।

পুনরায় সেই বসুমান ব্রাহ্মণ রাজাকে বহু প্রশ্ন করিল। রাজাও উত্তম রীতিতে বুঝাইলেন। উহার সব সন্দেহ নষ্ট হইয়া গেল।

দত্তাত্রেয় কহিলেন ঃ—"পরশুরাম, ফের রাজা হেমাঙ্গদ্ বসুমানকে প্রণাম করিয়া আপনার ভাই আর সেনার সহিত নিজনগরে ফিরিয়া আনিলেন।"

দ্বাবিংশ প্রকরণ

সারাংশ কি হয় ?

আদর্শনগরং যদ্বদস্ত্যাদর্শস্বভাতঃ ॥
এবং জগচ্চিদাত্মৈকরূপং সত্যমুদীরিতম্ ॥ ১০২ ॥

রাক্ষসের কথা শুনিয়া পরশুরাম দত্তাত্রয়কে পুনরায় নম্রতাপূর্ব্বক বাক্যে কহিতে লাগিলেন ঃ—"মহরাজ, সেই শাপমুক্ত ব্রাহ্মণে পুনরায় কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন ? আর হেমাঙ্গদ উহাকে কি তত্ত্ব বোধ করাইয়াছিলেন ? কৃপা করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিন।"

ইহা শুনিয়া দত্তাত্রেয় কহিতে লাগিলেন ঃ—"পরশুরাম, সেই সম্ভাষণে বড় গহন অর্থভরা ছিল। শুন, হেমাঙ্গদকে বসুমান কহিতে লাগিলেন ঃ—"রাজপুত্র, আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন আমি এই পরমপদকে যোগীশ্বর অষ্টকের নিকট জানিয়াছিলাম। আপনার

কথায় আমার উহা পুনরায় উত্তম রীতিতে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু শঙ্কা ইহা হইতেছে যে তত্ত্বজ্ঞানী হইলেও আপনার এইরূপ স্থিতি কি করিয়া হয়? আত্মতত্ত্বজ্ঞ আপনি ব্যবহার কিরূপে করিতেছেন? প্রকাশ আর অন্ধকর এক হওয়া কি করিয়া সম্ভব হয়? আমাকে সব কথা বুঝাইয়া দিন।"

তখন হেমাঙ্গদ উহাকে কহিতে লাগিলেন:—"হে ব্রাহ্মণ, তোমার ভ্রম এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই; ওরে, আত্মস্বরূপজ্ঞ জ্ঞানীর সাংসারিক ব্যবহারে কি বাধা হইতে পারে? যদি এই ব্যবহারে জ্ঞানের বাধা হইত তবে ইহাই বলিতে হইবে যে জ্ঞানীর সদাই সমাধিতেই থাকা উচিত। কিন্তু সমাধি কেবল স্বপ্নতুল্যের ন্যায় হইত অর্থাৎ উত্থানকালে নষ্ট হওয়া রূপ অবস্থায় পুরুষার্থের কি উপযোগ হইতে পারে? যখন সব ব্যবহার জ্ঞানের সাহায্যে হইতেছে তাহা হইলে সেই ব্যবহার জ্ঞানের বাধা কি করিয়া দিতে পারে? যে স্বরূপে জগৎ ভাসমান হইতেছে উহাই জ্ঞান হয়। উহার উপর সঙ্কল্প অনুসারে ব্যবহার ভাসমান হইতেছে। ইহা নিশ্চয় হয় যে নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় বুদ্ধির সেই পরমরূপের পরিচয় একবার হইয়া যাইবার পর পুরুষ বন্ধনমুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া যান। বসুমান, এই জন্য তোমার সংশয় বুদ্ধিমান পুরুষের মান্য নহে।"

ইহা শুনিয়া বসুমান রাজপুত্রকে কহিতে লাগিলেন:—"রাজপুত্র, ইহা সব সত্য হয়। আমারও এইরূপ নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ববিকল্পরহিত সংবেদনই আত্মস্বরূপ হন। কিন্তু ইহা বলুন যে নিঃসঙ্কল্প অবস্থা ত্যাগ করিয়া সবিকল্প অবস্থায় আসিবার সময় প্রথমে

নিবারণ করা হইয়াছে যে ভ্রম তাহা পুনরায় কেন না হইবে? যেমন রজ্জুতে সর্পের সেইরূপ নির্ব্বিকল্পস্বরূপে বিকল্পের ভাসিত হওয়াকে ভ্রম বলা হয়। ইহা জ্ঞানীকে বদ্ধ কেন না করিবে?"

হেমাঙ্গদ কহিতে লাগিল:—"ব্রাহ্মণ, তুমি ইহা জান না যে ভ্রম কাহাকে বলে আর অভ্রম কাহাকে বলে? শুন! যে ইহা জানে যে আকাশ কি হয় অর্থাৎ আকাশের যথার্থ স্বরূপজ্ঞ, তিনিও আকাশ নীল দেখেন আর সেই নীল আকাশ দেখিয়া বা মনে করে ব্যবহারও করেন কিন্তু ইহাতেই ইহা বলা যায় না যে আকাশের সম্বন্ধে উহার যে জ্ঞান হইয়াছে উহা ভ্রান্তি হয়। ইহা মূঢ় লোকের সম্বন্ধে ভ্রান্তি আর তত্ত্বজ্ঞানীর সম্বন্ধে "প্রমা" বলা হয়।

মূল মর্ম্মকে জানিয়া লইবার পর যে দৃশ্য, ভয় আর হর্ষ উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া যায় উহাকে 'প্রমা' বলা হয়। যাহা হইতে সত্যরূপী জান বা প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই জ্ঞান, মৃত সর্পের মত সম্পুর্ণ নিরুপদ্রব হইয়া যায়। জ্ঞানীর ব্যবহার দর্পণে প্রতিবিম্বের মত হয়। জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর ইহাই ভেদ হয়। জ্ঞানীর এই ব্যবহারাত্মক জ্ঞান উঁহার স্বয়ং সঙ্কল্প অথবা "প্রমা" হয়, কিন্তু উহাই অজ্ঞানীর ভ্রম হয়। জ্ঞানীর সব ব্যবহার জ্ঞানরূপ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানীর ভ্রান্তি হওয়া কখন সম্ভব হয়? যদি তুমি মনে কর যে জ্ঞান হইলে সব দৃশ্যের লোপ হইয়া যায় তাহা হইলে সত্যকথা ইহা হয় যে জ্ঞানে কেবল উহার নিবৃত্তি হয়, যাহা অজ্ঞান জন্য হয়; কিন্তু যদি ভিন্ন দোষে কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকেত জ্ঞান হইলেও উহার নাশ কি করিয়া হইতে পারে? তিমির

রোগাক্রান্ত মনুষ্য জানে যে, পদার্থ এক হয় কিন্তু একই পদার্থ দুই বলিয়া দেখিতেছে। এককে দুই দেখা অজ্ঞানের পরিণম না হইয়া এক নেত্রদোষ হয়। তাহা হইলে তাহা পুনরায় জ্ঞান হইলে কি করিয়া দূর হইবে? এইরূপ এই জগদাভাস জীবের কর্ম্মরূপ প্রারব্ধদোষের জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব কর্ম্মনাশ না হওরা পর্য্যন্ত ব্যবহার বন্ধ হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মের লয় হইলেই এই অদ্বৈত চৈতন্য শেষ থাকিয়া যান। সারাংশ এই হয় যে সাংসারিক ব্যবহারের কারণ জ্ঞানীর ভ্রান্তি হইতে পারে না।"

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ রাজপুত্রকে পুনরায় কহিতে লাগিল:—"হে রাজকুমার; ইহা কি করিয়া হয়? জ্ঞানীর কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে না। জ্ঞানাগ্নির স্পর্শ হইয়া যাইলে কর্ম্মরূপী কাপাস কি করিয়া থাকিতে পারে?"

রাজপুত্র হেমাঙ্গদ কহিতে লাগিলেন:—'শুন, বলিতেছি! সব জ্ঞানীর কর্ম্ম তিন প্রকারের হয়। অপক্ক, পক্ক আর হতোদিত। জ্ঞান হইলে পক্ক কর্ম্ম ভিন্ন বাকী দুই কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। নিয়তির যোজনায় কালকর্ম্মকে পক্ক করায়। কালে যাহার পরিপক্কতায় অর্থাৎ ফলস্বরূপে পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহা পক্ককর্ম্ম। যাহা পরিপক্ক হয় নাই অর্থাৎ ফলের স্বরূপ মিলে নাই তাহা অপক্ক কর্ম্ম। আর জ্ঞানের উৎপত্তি হইবার পর যে কর্ম্ম করা যায় তাহা হতোদিত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম উদিত হইলেই জ্ঞানাগ্নিরদ্বারা হত অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়। পক্ক কর্ম্মকে প্রারব্ধও কহে। ধনুক হইতে ছুটিয়াছে যে বাণের মত সে আপন ফল—সুখদুঃখ আদি

পরিণাম—দিবার জন্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ থাকে। এই জগৎভাস উহার দ্বারা অর্থাৎ প্রারব্ধের দ্বারা নির্ম্মাণ হইয়াছে। ইহা ভ্রান্তিরূপ হয়। এখন আরো শুন; জ্ঞানে তরতমের ভাব থাকে অতএব এই প্রারব্ধ-কর্ম্মজনিত জগত্তাভাস জ্ঞানীকে সুখদুঃখাত্মক ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয়। কিন্তু ভ্রান্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। সেই ভিন্ন ভিন্ন ফল কি হয় তাহা শুন; মন্দ জ্ঞানীর এই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল তৎকালে অনুভবে আসে। মধ্যম জ্ঞানীর ইহার ফলে সাধারণ "ভাস" হয়। আর উত্তম জ্ঞানীর ইহার স্পষ্ট ভাস হইলেও ইহার ফল—সুখদুঃখাদি পরিণামের অনুভব হয় না কারণ তিনিই ইহাকে (জগৎভাসকে) নিশ্চয়পূর্ব্ব অসত্য বলিয়া জানেন ও মানেন। কর্ম্মে সুখদুঃখাদি ফলের প্রতি অজ্ঞানী লোকের অবিচ্ছেদে ধ্যান থাকে। অতএব উহার কর্ম্মফল অনুভবে আসে অর্থাৎ পুষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানীর ধ্যান নিত্য আত্মানুসন্ধানে থাকে অতএব এই বাহ্য কর্ম্মফলের প্রতি জ্ঞানীর মন থাকে না। ফলতঃ মন্দজ্ঞানীরও কর্ম্মফল অজ্ঞানীর মত বিশেষ পুষ্ট হয় না আর স্পষ্ট অনুভব দিতে সমর্থ হয় না। এই প্রারব্ধভাসিত ফল মধ্যম জ্ঞানীর সেইরূপ সূক্ষ্ম পীড়া দেয় যেমন নিদ্রায় মশাকাদি দেয় আর উত্তম জ্ঞানীর পীড়া দিতে পোড়া রজ্জুর মত অসমর্থ হয়। উত্তম জ্ঞানীর স্থিতি ফলপ্রাপ্তির সময় আর ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্বসময় সমানই থাকে। রঙ্গভূমির অভিনয় করিবার সময় যেমন কেহ অন্যের রূপে আনন্দ আর শোক করে কিন্তু ভিতরে (মনে) আনন্দিত অথবা দুঃখিত হয় না সেইরূপ জ্ঞানী সুখদুঃখাদি ব্যাপ্ত হইলেও ভিতরে (স্বরূপে)

বিকৃত হন না। আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ না জানিবার কারণ অজ্ঞানী লোক শরীরকেই আত্মা বলিয়া বুঝে আর উহার ধারণা অনুসারে দৃশ্য সত্য হয়। মন্দ জ্ঞানী জানেন যে আত্মা শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আর সংসার অসত্য হয়। কিন্তু মন্দজ্ঞানীর অভ্যাস (আত্মা চিৎস্বরূপ আর সংসার মিথ্যা ইহার অভ্যাস) অপূর্ণ থাকে সেইজন্য উহার পূর্ব্ববাসনা উহার জ্ঞানের বিরোধীতা করে। ফল এই হয় যে কখন কখন উঁহার দেহে আত্মত্ব আর সংসারে সত্যত্ব বোধ হয়। পুনরায় তিনি জ্ঞানবিচারে এই ভ্রমাত্ম দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া অর্থাৎ শুধরাইয়া লন। উহার সত্য ও মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক মিথ্যা এই দুই ভাবনা একত্র থাকে অতএব উহার ফলের স্পষ্ট অনুভব হয়। কিন্তু উহার এই দুই ভাবনা সমান শক্তির হয় না। সৎপদার্থ—আত্মস্বরূপ—এর ভাবনায় অসৎপদার্থ—সংসার—এর ভাবনা পরাজিত হইয়া যায়। উহার লব্ধ জ্ঞানে অসৎ জগৎ-ভাবনার বাধা হয় না। অসৎ ভাবনার সংসর্গে যেই আত্মস্বরূপের বিস্মরণ হইয়া যায় তখনই উহাকে ব্যর্থ ভ্রমাত্মক বুঝিয়া মন্দজ্ঞানী বিচার আর নিশ্চয়ে সত্য ভাবনাকেই অবলম্বন করে। মধ্যম জ্ঞানীর না স্বরূপবিস্মৃতি হয় আর না জগতের ভাস হয়। প্রযত্ন করিয়া সে কখন কখন স্বরূপানুসন্ধান ছাড়িয়া দেহভাণের প্রতি আসে। ইহা উঁহার সিদ্ধাবস্থার কথা। কিন্তু যখন সে সাধক অবস্থায় থাকে তখন সে যেমন যেমন আপন অভ্যাসকে ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকে তেমন তেমন উঁহার স্বরূপবিস্মৃতি কম হইয়া যায়। আর পূর্ণ অবস্থায় তিনি প্রযত্ন

করিয়াও দেহে আসেন না। উত্তম জ্ঞানীর সমাধি ও ব্যবহার-দশায় অল্পও ভেদ থাকে না। উহার আত্মানুসন্ধান অখণ্ড থাকে। নিত্য সমাধিতে স্থিত মধ্যমজ্ঞানীর আত্মানুসন্ধান সাংসারিক ব্যবহারের সময় কিছু মলিন হইয়া যায়। কিন্তু উত্তম জ্ঞানী প্রারব্ধবশে অথবা স্বেচ্ছায় সমাধি ছাড়িয়া ব্যবহার করিতে লাগেন তখন তিনি আত্মানুসন্ধান হইতে একটুও চ্যুত হন না। বসুমন্ত, বস্তুতঃ দেখিলে তোমার কথা অনুসারে উত্তম ও মধ্যম জ্ঞানীগণের অন্তঃকরণে অনুভবের দৃষ্টিতে কর্ম্ম সত্য সত্যই থাকে না। কারণ তাঁহারা পূর্ণতা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। তিনি সংবিদ্ আত্মস্বরূপকে ছাড়িয়া কিছুও দেখেন না। ফের উহার কর্ম্ম কি করিয়া থাকিতে পারে? উহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়। যাদুকরের খেলার মত উহা কেবল যাদুকর ভিন্ন অন্যে দেখে। ইহার রহস্য তোমায় সংক্ষেপে আমি শুনাইতেছি। যাহা শিবের দৃষ্টি হয় তাহাই এই জ্ঞানীর দৃষ্টি হয়। প্রভেদ অল্পও নাই এইজন্য জ্ঞানীর কিছুও কর্ম্ম ভাসিত হয় না। তিনি কর্ম্ম করেন অথবা না করেন ইহা লোক দৃষ্টির বিচার হয়। তোমাকে ইহার রহস্য প্রথমে বুঝাইয়া আসিয়াছি।”

হেমাঙ্গদের এই নিরুপণ শুনিয়া সেই বসুমান ব্রাহ্মণের সব সন্দেহ মিটিয়া গেল আর উহার অন্তঃকরণ জ্ঞানতেজে সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইয়া গেল। সে রাজপুত্রের সৎকার পাইয়া নিজগৃহে চলিয়া গেল। দুই রাজপুত্র ও নিজনগরে চলিয়া গেল।

এই সংবাদ শুনিয়া পরশুরাম দত্তাত্রয়কে কহিতে লাগিলেন :—

"গুরুবর, আমি আপনার শ্রীমুখ হইতে এই জ্ঞান শুনিলাম। আমার সন্দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি সেই আত্মস্বরূপ বুঝিয়াছি। মালার সূতার মত সবে লাগিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপ্ত সংবেদনই আত্মা হন। ইহাও সত্য হয় যে তিনিই সর্ব্বত্র ভাসিত হইয়া রহিয়াছেন। এখন আপনি আরম্ভ হইতে সববিষয়ের সার বলুন তাহা হইলে আমি উহা সদাই ধ্যানে রাখিব।"

তখন দত্তাত্রেয় পুনরায় কহিতে লাগিলেন :—"পরশুরাম, শুন! এখন অন্তে তোমাকে সবের সার বাহির করিয়া বলিতেছি। যিনি পরম সামর্থ আর পূর্ণ অহংতা ধারণকারিণী দেবীচিতি তিনি স্বেচ্ছায় অথবা স্বতন্ত্রতা নামক আপন মায়াশক্তির অদ্ভুত প্রভাবে দর্পণে প্রতিবিম্বের মত আপনার আত্মস্বরূপে জগতকে ভাসিত করিতেছেন। প্রথমে সেই পূর্ণ পরমচিতি পূর্ণ অহংতার কারণ বিস্তৃত ছিলেন; পুনরায় স্বেচ্ছায় বা স্বতন্ত্রতায় উনি দুইরূপে নিজেকে প্রকট করিলেন। উহার একাংশে যখন অপূর্ণ অহং ভাব প্রকট হইল তখন সেই অহংভাব হইতে বাহির হইয়া উঁহার প্রতিযোগী অন্যভাগ অহংস্ফুর্ত্তিরহিত—অচেতন—হইয়া সেই প্রথম অংশের দৃষ্টি হইতে বাহ্য আর অব্যক্ত হইয়া থাকিতে লাগিল। পরশুরাম, এই সম্পূর্ণ অহং ভাবাত্মক প্রথমাংশের নাম "সদাশিব" হয়। এই অব্যক্ত আর সৎতত্ত্বকে নিজ হইতে ভিন্ন দেখিয়া ও সেই সদাশিব "ইহা আমিই হই এইরূপ একতার অভ্যাস নিরন্তর করিতে লাগিল। পরে উঁহার জগত উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা হইল। তখন অব্যক্ততত্ত্বের দেহে "ইহা আমার দেহ হয় না, ইহা আমিই